বিবর্তনের কথা

অলোক মুখোপাধ্যায়

বিবর্তনের কথা

অলোক মুখোপাধ্যায়

সুবর্ণরেখা ॥ কলিকাতা
১৯৮৪

BIBARTANER KATHA (*Story of Evolution*)
by Aloke Mukhopadhyay

প্রকাশক : ইন্দ্রনাথ মজুমদার
সুবর্ণরেখা, ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড
কলিকাতা-৯

মুদ্রক : রামপ্রসাদ চক্রবর্তী
চক্রবর্তী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪৪/২এ সিমলা রোড
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন

মূল্য : ২৫ টাকা

বিবর্ত্তনের কথা

এই লেখকের :

বিশ্বশিল্পের রূপরেখা

সূচিপত্র

উৎসর্গ

আমার মাস্টারমশাই
শ্রীষড়ানন মজুমদার
শ্রদ্ধাস্পদেষু

পূর্বভাষণ

আত্মানং বিদ্ধি—know thyself। নিজেকে জানো। নিজেকে চিনে নাও আত্ম আবিষ্কারের আলোয়। মানুষ জানতে চাইল নিজেকে। যাচাই করে নিতে চাইল নিজের অস্তিত্বকে। কোথা থেকে সে এসেছে ? এই অন্বেষণ প্রাচীনকাল থেকেই শুরু হলেও প্রথম বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা পাওয়া গেল উনিশ শতকে।

এই বিষয়ে অনেকের ধারণা আজও অস্পষ্ট। ছোট ছেলেমেয়েরা যখন বড়দের প্রশ্ন করে, তাঁরা কোনো না কোনো উপায়ে এড়িয়ে যেতে চান। কেউ এদের উপহাস করেন, কেউবা বলেন শিক্ষকের কাছে যেতে। যাঁরা একেবারে এড়িয়ে যান, অথবা উপহাসের দমকা হাওয়ায় শিশুদের বিনি সুতোয় গাঁথা কৌতুহলের মালা উড়িয়ে দেন, ছড়িয়ে দেন অবহেলায়, তাঁরা বোঝেন না এজন্যে এদের কত ক্ষতি হলো।

মনে পড়ে, ছেলেবেলায় ছাদে বেড়াতে বেড়াতে একজন বয়োজ্যোষ্ঠ ব্যক্তিকে কৌতূহলবশতঃ জিজ্ঞাসা করেছিলাম—'সব কাকের এক রকম মুখ, কিন্তু সব মানুষের মুখ এক নয় কেন ?' তিনি উত্তর দিলেন—'পাগলের মতো কথা বোলো না।' আবার কখনো জীবসৃষ্টির প্রশ্ন শুনে বয়স্ক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি, 'এসব ঈশ্বরের লীলা ; এর কোনো উত্তর নেই।'

এজন্যে ব্যক্তিবিশেষকে দায়ী করতে পারি না। দায়ী সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা। আমাদের দেশের পশুশালায় উপযুক্ত গাইড-এর ব্যবস্থা দেখি না। কোনো কোনো যাদুঘরে ব্যবস্থা থাকলেও গাইড-এর ব্যাখ্যা কিন্তু সাধারণ দর্শকচিত্তে আগ্রহ জাগাতে অক্ষম। আবার কখনো কখনো দর্শকের মনে কিছুটা আগ্রহ জাগলেও তা স্থায়ী হয় না। জনসাধারণের জন্যে এ বিষয়ে আরো বেশি বই থাকা প্রয়োজন।

প্রাণসৃষ্টি ও জীববিবর্তনের বিষয়ে আমাদের মনে যে বিচিত্র প্রশ্ন আছে, তার মধ্যে বিশেষ কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়াসে বইটির রচনা। বইটির বিষয়বস্তুকে প্রধানত জীবজন্তুর সৃষ্টি ও বিবর্তনের আলোচনার মধ্যে সীমিত রাখা হয়েছে। পাঠকের কাছে নিবেদন—যেসব তথ্য ও মতবাদ এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে, সেগুলি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত কিছু ফসিল ও তার অনুশীলনের ওপরে প্রতিষ্ঠিত, এবং ফসিলের ব্যাখ্যাতেও বহুক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা ঐক্যমতে উপনীত হতে পারেন নি। এছাড়া, নিত্য নতুন নিদর্শন আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হচ্ছে। আজ যে মতই গ্রাহ্য হোক না কেন; কাল তা বাতিল হয়ে যেতে পারে। খোলা মনে নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে হবে। স্বাভাবিকভাবে এই গ্রন্থের লেখক কোনো একটি বিশেষ মতবাদকে তুলে ধরেন নি ; সম্পূর্ণ বিপরীত হলেও পাশাপাশি একাধিক বিশ্লেষণকে সমমর্যাদায় পাঠকের

দৃষ্টিগোচর করা হয়েছে। দেশের মানুষের মনে আগ্রহ জাগাতে বইটি যদি সাহায্য করে এবং এ থেকে যদি কিশোর-কিশোরীদের কৌতূহলের প্রদীপখানি জ্বলে ওঠে, তবেই এই প্রয়াস সার্থকতা খুঁজে পাবে।

রচনাটি ইতিপূর্বে ধারাবাহিক প্রবন্ধের আকারে 'চিত্রাঙ্গদা' পত্রিকায় 'কথা কও অনাদি অতীত' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে এর সঙ্গে আরো কতকগুলি প্রবন্ধ সংযোজন করে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। প্রবন্ধ পুনঃ প্রকাশের অনুমতি দানের জন্যে 'চিত্রাঙ্গদা'-র সম্পাদক শ্রীঅজিতমোহন গুপ্তকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

প্রবন্ধগুলি পাঠ ও আলোচনা করে কিছু কিছু অংশে পরিবর্তন করতে আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন কলকাতার জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া-র বিজ্ঞানী শ্রীপ্রবীরকুমার বসু এবং অ্যান্‌থ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া-র বিজ্ঞানী ডঃ প্রতাপচন্দ্র দত্ত (হেড অফ দি ডিভিশন অফ ফিজিক্যাল অ্যানথ্রোপলজি) এবং ডঃ অনাদি পাল। কতকগুলি তথ্যের ওপরে সেইমতো সংশোধন করে প্রবন্ধে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। এইসব উপদেশের জন্যে তাঁদের কাছে আমি গভীর-ভাবে কৃতজ্ঞ। জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া-র শ্রীসুধাংশু বিশ্বাস এবং অ্যান্‌থ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া-র ডঃ প্রণব গাঙ্গুলী (ডেপুটি ডিরেকটার), ডঃ (শ্রীমতী) জ্যোতি সেন ও ডঃ (শ্রীমতী) ভারতী দেবী আমার এই প্রয়াসে যে সাহায্য করেছেন তা ভুলব না।

রেখাচিত্র রচনায় শিল্পী শ্রীঅমলেন্দু হালদার ও শ্রীকৃষ্ণ দাশের কাছে আমি সবিশেষ ঋণী। শব্দসূচি ও গ্রন্থপঞ্জি বিন্যাসে সাহায্য করেছেন শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ।

গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে শ্রীপ্রদীপ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসূর্য্য বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে যে উপদেশ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন তার জন্য অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাই তাঁদের।

অ. মু.

রথযাত্রা,
১৫ই আষাঢ় ১৩৯১

১

সৃষ্টি ও বিবর্তন

অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে আমাদের চোখে পড়ে নদীর মতো দীর্ঘ এক বহমান স্রোত, যার রং তারার আলোর মতো নীলচে শাদা। নদীর মতো দেখতে বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে আকাশগঙ্গা; অন্য নাম ছায়াপথ। কতকটা দুধের মতো রং বলে ইংরেজি ভাষায় milky way বলা হয়। এর আসল চেহারা কিন্তু নদী বা পথের মতো নয়, – তা হলো একটা বিরাট চাকার মতো। এই চাকার বিশালতা কল্পনাতীত। আলোর গতি সেকেণ্ড সময়ে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল হলে তার প্রায় ১ লক্ষ বছর লাগে এই চাকার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে (ব্যাস) যেতে। চাকায় আছে অজস্র তারা আর গ্যাস ও ধুলোর মেঘ। গ্যাস ও ধুলোর মেঘ থেকে তারাদের জন্ম হয়েছে এবং আজও নতুন নতুন তারার সৃষ্টি হচ্ছে।

সূর্য এবং তার পরিবারভুক্ত নবগ্রহ ছায়াপথের মধ্যে অতি সামান্য জায়গা নিয়ে আছে। পণ্ডিতরা বলেন যে, সূর্য ও তার পরিবারের জন্ম আজ থেকে প্রায় ৪৬০ কোটি বছর আগে। মহাকাশের ঐ গ্যাস ও ধুলোর মেঘ এদের জন্মদাতা। আদিম মেঘের মধ্যে গ্যাস ঘুরত আবর্তের মতো। অণু-পরমাণুদের পারস্পরিক আকর্ষণে ঐ পাতলা মেঘ ক্রমে ঘন হতে থাকে। ধীরে ধীরে ঘনীভূত হওয়ার ফলে মেঘের মাঝে তৈরি হলো বড় পিণ্ড এবং তাকে ঘিরে কতকগুলি ছোট পিণ্ড। মাঝের পিণ্ড বড় বলে সে চারপাশ থেকে অন্য উপাদানকে আকর্ষণ করে আরো বড় হতে থাকে। এইভাবে সে এত বড় হয়ে ওঠে যে, চারপাশ থেকে আসা উপাদানগুলির ভারে ও চাপে মাঝখানের উপাদানের পরমাণুগুলি পিষে ভাঙতে শুরু করে। পরমাণু ভাঙার ফলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ আরম্ভ হয়। লক্ষ-লক্ষ পারমাণবিক বোমার মতো বিস্ফোরণ চলতেই থাকে। এইভাবে জন্ম নেয় সূর্য, যার তাপশক্তির উৎস হলো এই পারমাণবিক বিস্ফোরণ। চারপাশের পিণ্ডগুলি ঘনীভূত হয়ে ক্রমে ক্রমে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের রূপ নেয়।

কিন্তু পৃথিবী তখন সূর্যের মতো জলন্ত গ্যাসের একটি গোলক। কোটি-কোটি বছর ধরে গ্যাসের এই গোলা ঠাণ্ডা হতে থাকে। যে ধাতু বা পাথর আগে বাষ্পীয় অবস্থায় ছিল তা ক্রমে তরলে রূপান্তরিত হয়। তরল পদার্থগুলি প্রায় ৪৫০ থেকে ৪০০ কোটি বছরের মধ্যে আরো ঠাণ্ডা হয়ে জমে পৃথিবীর উপরিপৃষ্ঠে একটা আবরণ সৃষ্টি করে।

ধীরে ধীরে পৃথিবী ঠাণ্ডা হওয়ার সঙ্গে এই আবরণ যেমন পুরু হয়েছে তেমন তার গা কুঁচকে গিয়ে তৈরি হয়েছে অনেক ভাঁজ ও ফাটল – ভূপৃষ্ঠে পাহাড়-পর্বত সৃষ্টির এটা অন্যতম কারণ । কিন্তু পৃথিবীর অভ্যন্তরে ধাতু ও পাথর তখন বাষ্পীয় বা তরল আকারে অত্যন্ত গরম থাকায় তার চাপে বহু স্থানে আবরণ ভেদ করে আগুনের শিখা বেরিয়ে আসত, আর সেই সঙ্গে ফুটত তপ্ত তরল ম্যাগমা । পৃথিবী যখন ঠাণ্ডা হতে থাকে তখন তরল ম্যাগমার ওপরে আরো হালকা দু'ধরনের জিনিস দানা বেঁধে ভেসে ওঠে – ব্যাসল্ট ও গ্রানাইট । গ্রানাইট হালকা বলে ভাসতে থাকে একেবারে ওপরে । আদি যুগে গ্রানাইটের ওপরে মহাপ্লাবনের জলপ্রবাহের চাপে ব্যাসল্ট ডুবে যায় সমুদ্রের নিচে, আর গ্রানাইট শিলায় মহাদেশ গড়ে উঠতে থাকে ।

এই মহাপ্লাবন হয়েছিল বায়ুমণ্ডলে জমে ওঠা পুরু মেঘ থেকে অবিরাম বর্ষণের ফলে । উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠের সব ফাটল থেকে জলীয় বাষ্প বেরিয়ে বায়ুমণ্ডলে মেঘরূপে জমা হচ্ছিল । ক্রমে ঐ মেঘ মাইলের পর মাইল পুরু ও জলভারাতুর হয়ে ওঠে এবং তা থেকে শুরু হয় বৃষ্টি । কিন্তু পৃথিবীর তপ্ত গাত্রে পড়া মাত্র সেই জলের ফোঁটা আবার বাষ্প হয়ে ওপরে উঠে যায় । এদিকে পৃথিবী ঠাণ্ডা হতে হতে এমন সময় এলো যখন বৃষ্টির ফোঁটা মাটিতে পড়ে আর বাষ্প হয়ে উঠে গেল না । সেই সময় থেকে শত-শত বছর মুষলধারায় বৃষ্টির জল প্রাকৃতিক কারণে তৈরি গর্তগুলিতে জমা হয়ে সৃষ্টি করে সমুদ্র ও হ্রদ । আর সেই দুর্বার প্লাবনের দুরন্ত স্রোতে ভাঙ্গা পাথরের টুকরোর আঘাতে আঘাতে আপন পথ করে নিল নদী । এই হলো নদীপথের জন্মরহস্য ।

পৃথিবীর প্রথম বায়ুমণ্ডলে সম্ভবত অনেক বেশি হাইড্রোজেন ও তার সঙ্গে হিলিয়াম গ্যাস ছিল । তাছাড়া আর্গন, নিয়ন ইত্যাদি আরো কিছু হালকা গ্যাসও তখন ছিল । কিন্তু নবগঠিত পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বেশি না থাকায় ঐ হালকা গ্যাসগুলিকে ধরে রাখা গেল না । দ্বিতীয়ত – হিলিয়াম, আর্গন ও নিয়ন গ্যাস সাধারণ অবস্থায় অন্য পদার্থের সঙ্গে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় না বলে এদের আর ধরে রাখা যায়নি । বায়ুমণ্ডল ছেড়ে এই গ্যাসগুলির প্রায় সর্বাংশ চলে গেল মহাশূন্যে । তবে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাস রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় বলে পৃথিবীতে থেকে গেল । এসব গ্যাস ছাড়া তখন কার্বনও ছিল । কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেনের মধ্যে নানারকম রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে তৈরি হলো মিথেন, অ্যামোনিয়া ও জলীয় বাষ্প ।

কিন্তু আদি যুগের বায়ুমণ্ডলে নিঃশ্বাস নেওয়ার মতো মুক্ত অক্সিজেন নেই । তখন ছিল প্রধানত হাইড্রোজেন, জলীয় বাষ্প, অ্যামোনিয়া ও মিথেন । আদি সমুদ্রের জলেও তারা মিশে ছিল ।

পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি হাইড্রোজেন, মিথেন, অ্যামোনিয়া, জলীয় বাষ্প এবং

নানারকম পদার্থের জটিল রাসায়নিক মিশ্রণে হয়েছিল বলে অনেক বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন ।

প্রাণের বিকাশ

কেমন করে আমাদের এই গ্রহে প্রাণের জন্ম হয়েছিল, তা আলোচনার আগে প্রাণের মূল উপাদান কী, সেটা বলা দরকার ।

প্রাণের মূল উপাদান প্রোটোপ্লাজ্‌ম । ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা দিয়ে প্রোটোপ্লাজ্‌ম তৈরি । খাদ্য গ্রহণ করে প্রোটোপ্লাজ্‌ম শক্তি লাভ করে – রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খাবারকে 'পুড়িয়ে' এই শক্তির জোগান হয় । শুধু তাই নয়, প্রোটোপ্লাজমের স্পর্শশক্তি (sensitivity) আছে এবং খাদ্যের সঙ্গে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নতুন প্রোটোপ্লাজ্‌মও সৃষ্টি করে । কার্বন, অক্‌সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ক্লোরিন, গন্ধক, ফসফরাস, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা ইত্যাদি নানা মৌলিক উপাদান (element) আছে এর মধ্যে । প্রাণীর প্রোটোপ্লাজমে জলও থাকে । নাইট্রোজেন, কার্বন, হাইড্রোজেন, অকসিজেন ইত্যাদি দিয়ে প্রোটোপ্লাজমের জটিল যৌগিক উপাদান (compound) প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং ফ্যাট (চর্বি জাতীয় জিনিস) তৈরি হয়েছে ।

বাড়ি যেমন ইট দিয়ে তৈরি, সব প্রাণীর শরীর তেমন অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ দিয়ে তৈরি । বহুকোষ যুক্ত প্রাণীর বিভিন্ন কোষ বিভিন্ন কাজের উপযোগী (অর্থাৎ কোষ-গুলির মধ্যে কর্মবিভাজন আছে) । যে কোষগুলি বিশেষভাবে আলোক-সচেতন বা আলোক-স্পর্শকাতর তা দিয়ে চোখ তৈরি হয়েছে । লম্বা ও সরু আকারের যেসব কোষ বিভিন্ন তড়িৎ-রাসায়নিক 'ঘাত'-কে (electro-chemical impulse) বহন করে নিয়ে যেতে পারে, তা থেকে স্নায়ুর সৃষ্টি হয়েছে । চাকার মতো একরকম কোষ আছে যারা অকসিজেন বহন করতে পারে ও সেগুলি রক্তের কোষ । অনেক কোষ নানা রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পটু ও তা দিয়ে পাকস্থলি গঠিত । আবার,এমন অনেক কোষ আছে যারা রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন করতে পারে – তা দিয়ে বিভিন্ন লালাগ্রন্থি (gland) তৈরি । তবে, কর্মবিভাজন বা specialization থাকলেও সব কোষের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে ।

কোষের প্রোটোপ্লাজমে থাকে তিনটি প্রধান অংশ—ঝিল্লি, সাইটোপ্লাজ্‌ম ও নিউক্লিয়াস । ঝিল্লি দিয়ে কোষ ঢাকা । খাবার ভেতরে আসে ঝিল্লি দিয়ে এবং তা দিয়েই বর্জপদার্থ (waste) নিষ্কাশিত হয়ে যায় । সাইটোপ্লাজ্‌ম্ অনেকটা জেলির মতো । কোষের শ্বাসকার্য এবং বর্জ পদার্থ নিষ্কাশন নিয়ন্ত্রিত করে এই সাইটোপ্লাজ্‌ম । এর মধ্যে মাঝখানে ভেসে থাকে নিউক্লিয়াস, যাকে কোষের কেন্দ্রস্থল বলা যায় ।

কোষ এক অদ্ভুত রাসায়নিক কারখানা। কারখানার কর্মীরা হলো প্রোটিন এবং অ্যামিনো অ্যাসিড বলে একরকম যৌগিক উপাদান। অ্যামিনো অ্যাসিডের অণুগুলি এক বিশেষ নিয়মে যুক্ত হয়ে প্রোটিন তৈরি করে। শরীরের মধ্যে যে ক্ষয় হচ্ছে প্রোটিন তাকে মেরামত করে, এবং বাঁচতে গেলে শরীরের ভেতরে যেসব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন, তাতে প্রোটিন সহায়তা করে। যেমন খাবারকে হজম করার জন্যে যেসব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দরকার হয়, তাতে এনজাইম (enzyme) বলে এক বিশেষ রকমের প্রোটিন সহায়তা করে। হজম-হওয়া খাবারকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 'পোড়াবার' ফলে শরীরের মধ্যে একটা শক্তি প্রবাহ চলতে থাকে ও তার নাম বিপাক (metabolism) ।

কিন্তু এই কোষ-কারখানার হেড-অফিস নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসের মধ্যে সুতোর মতো একরকম জিনিস থাকে যাদের নাম ক্রোমোজোম। আবার, ক্রোমোজোমের মধ্যে আশ্চর্য রকমের অ্যাসিড আছে যাকে নিউক্লিক অ্যাসিড বলা হয়। নিউক্লিক অ্যাসিডের মধ্যে প্রধান হলো deoxiribonucleic acid বা সংক্ষেপে যাকে DNA বলে। DNA ছাড়া আর এক রকম অ্যাসিডও আছে, যার নাম ribonucleic acid বা RNA. নিউক্লিক অ্যাসিডের কাজ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিভাবে প্রোটিন তৈরি হবে তার নিয়ম-কানুনগুলি নিউক্লিক অ্যাসিডের মধ্যে আছে সংকেতের (code) আকারে। DNA-র মধ্যে সংকেতের আকারে আরো নানারকম পরিকল্পনা বা প্ল্যান থাকে। প্রাণীর জীবনকালের মধ্যে ঠিক ঠিক সময় মতো সংকেতগুলিকে অনুসরণ করে বিভিন্ন জাতীয় কোষের বংশবৃদ্ধি হয় (যেমন পাকস্থলির কোষ শুধু পাকস্থলির কোষ তৈরি করে, হাড়ের কোষ শুধু হাড়ের কোষই তৈরি করে), এবং প্রাণীর দেহবৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ পায়। সংকেতের মধ্য দিয়ে DNA-র এই স্মৃতি-শক্তি কখনো হ্রাস পায় না। তাই কোনো জীবের মধ্যে পিতামাতা ছাড়াও কয়েক পুরুষ আগেকার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেতে পারে। অর্থাৎ DNA হলো বংশগত বৈশিষ্ট্যের ধারক। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য কথা, সকল প্রাণীর DNA একই রকম রাসায়নিক পদার্থে তৈরি। এর মধ্যে থাকে নিউক্লিওটাইড এবং শর্করা ও ফসফেটের (ফসফরাস থেকে উৎপন্ন এক যৌগিক উপাদান) অণু। নিউক্লিও-টাইডে চার রকম যৌগিক উপাদান আছে : অ্যাডিনিন, থাইমিন, সাইটোসিন ও গুয়ানিন। DNA-র অণুকে অনেকটা ঘোরানো সিঁড়ির মতো দেখতে ; এর সঙ্গে বিনুনির মতো পাকানো দুটি ফিতেরও তুলনা করা যায়। সিঁড়ির কাঠামো (বা বিনুনির দুটি ফিতে) শর্করা ও ফসফেট দিয়ে তৈরি। নিউক্লিয়াসকে খালি চোখে দেখা না গেলেও DNA-র ফিতে কিন্তু অনেক লম্বা। জন কেণ্ড্রু (John Kendrew) অনুমান করেছেন যে, মানুষের একটি কোষের নিউক্লিয়াসের এই ফিতেগুলিকে যদি খুলে সোজা করা যায়, তবে তা লম্বায় ৩-৪ ফুট হবে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, ফিতেগুলি কত সূক্ষ্ম ও কত বেশি পাকানো। ঘোরানো

সিঁড়ির মতো DNA-অণুর মধ্যে ধাপগুলি ঐ চার রকমের যৌগিক উপাদানে তৈরি (মানুষের ক্রোমোজোমে DNA-অণুর মধ্যে প্রায় ৫০০ কোটি জোড়ায় নিউক্লিওটাইড থাকে)। ধাপগুলিকে যে কতরকম ভাবে সাজানো যায়, তা বলে শেষ করা যাবে না। সিঁড়ির ধাপ সাজাবার বৈচিত্র্যের ফলেই প্রাণীজগতে এত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি।

পৃথিবীর জন্মের পর থেকে প্রায় ১০০ কোটি বছর ধরে বায়ুমণ্ডলে ও জলে প্রাণ সৃষ্টির উপাদানগুলি ক্রমে সঞ্চিত হতে থাকে। ১৯৫৩ সনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হ্যারল্ড উরি (Harold Urey) এবং স্ট্যানলি মিলার (Stanley Miller) রসায়নাগারে একটি পরীক্ষা করেন। হাইড্রোজেন, মিথেন, অ্যামোনিয়া ও জলের মিশ্রণের মধ্য দিয়ে তাঁরা বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠালেন। তরল পদার্থটির মধ্যে ধীরে ধীরে তৈরি হলো অ্যামিনো অ্যাসিডের অণু। বিজ্ঞানীরা বলেন, অনেকটা এই প্রক্রিয়ায় পৃথিবীতে অ্যামিনো অ্যাসিডের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই আদি যুগে পাহাড় ও জমি থেকে অগ্ন্যুদ্গার সৃষ্টি করলো তাপশক্তি, এবং আকাশ থেকে এলো বিদ্যুৎ ও সূর্যের অতিবেগনি রশ্মির বিকিরণ (ultra-violet radiation)। এইভাবে হলো প্রাণ সৃষ্টির উপাদান অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্ম।

অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে তৈরি হলো প্রোটিন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিডনি ফক্স (Sidney Fox) রসায়নাগারে অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে প্রোটিন তৈরি করেছিলেন। অ্যামিনো অ্যাসিডের মিশ্রণকে বেশি গরম করে শুকিয়ে নেওয়ার পরে তার সঙ্গে গরম জল মেশালে খুব ছোট ছোট গোলাকার বড়ি তৈরি হয়। বড়িগুলির মধ্যে থাকে নানারকম প্রোটিনের মিশ্রণ; তাই এদের proteinoid microsphere বলে। সিডনি ফক্স মনে করেন, আদি যুগে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গার থেকে যে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হতো, সেই তাপশক্তি অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে প্রোটিন সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিল। আগ্নেয়গিরিময় দ্বীপগুলির ধারে অথবা অগভীর ও খুব গরম জলায় সম্ভবত এইভাবে প্রোটিন তৈরি হয়েছিল (অর্থাৎ প্রোটিনের সৃষ্টি বিশেষ বিশেষ স্থানে সাময়িকভাবে হয়েছিল মনে হয়)।

এবারে কয়েকটা প্রশ্ন উঠতে পারে। জীবকোষের মধ্যে দেখা যায় যে, নিউক্লিক অ্যাসিডের নির্দেশ ছাড়া অ্যামিনো অ্যাসিড প্রোটিন তৈরি করতে পারে না। তবে, কি করে আদি যুগে শুধু তাপশক্তির সহায়তায় অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে প্রোটিন হওয়া সম্ভব? নিউক্লিক অ্যাসিডের অস্তিত্ব ও নির্দেশ কি তখন ছিল না? যদি নিউক্লিক অ্যাসিড প্রকৃতিতে উৎপন্ন হয়ে থাকে, তবে কি করে হলো?

বিজ্ঞানীরা সায়ানাইড থেকে নিউক্লিক অ্যাসিডের অন্যতম উপাদান অ্যাডিনিন তৈরি করেছেন। সূর্যের অতিবেগনি রশ্মির বিকিরণের ফলে আদি যুগে বায়ুমণ্ডলে সায়ানাইডের সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে এবং সায়ানাইড সম্ভবত বৃষ্টির জলে ধুয়ে সমুদ্রে এসে মিশেছিল। কিন্তু সকলেই জানে, সায়ানাইড মারাত্মক

বিষ। এখন যদি এটা কোনোদিন সত্য প্রমাণিত হয় যে সায়ানাইড থেকে অ্যাডিনিন তৈরি হয়েছিল, তবেকি আমরা বলতে পারবো যে গরল থেকে উঠেছিল সৃষ্টির বীজ। পুরাণে বলেছে, সৃষ্টির আদিতে সমুদ্র মন্থনের সময় যে গরল উঠেছিল মহাদেব তা পান করেছিলেন; আবার তিনিই নটরাজ রূপে ডমরুধ্বনির সঙ্গে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছিলেন।

নিউক্লিক অ্যাসিডের অন্য উপাদানগুলিকেও রসায়নাগারে তৈরি করা গেছে। তবে রসায়নাগারে যে অবস্থায় এগুলি তৈরি হয়, আদিম পৃথিবীতে ঠিক সে রকম প্রাকৃতিক পরিবেশ কোথাও ছিল কিনা সন্দেহ; আর তা থাকলেও হয়তো খুব বেশি ছিল না।

আজকাল বিজ্ঞানীরা নিউক্লিক অ্যাসিড উৎপাদনের আর একটা প্রক্রিয়ার কথা বলে থাকেন। তাঁরা বলেন যে, শর্করা ও ক্ষারক (base) যোগ করে তার সঙ্গে ফসফেটকে ঘটক (catalyst) হিসাবে নিয়ে এক বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এটা তৈরি করা সম্ভব।

জীবনের সৃষ্টি নিয়ে পণ্ডিতদের গবেষণা আজও অব্যাহত। যেভাবে প্রাণ সৃষ্টির উপাদানগুলি তৈরি হোক না কেন, সেই বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশ নিশ্চয় কোটি-কোটি বছরের মধ্যে বিরাট পৃথিবীর কোনো-না কোনো স্থানে ছিল বর্তমান। উপাদানগুলি এলোমেলো ভাবে পরস্পর যুক্ত হতে হতে কোনো সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রাণের জন্ম হয়েছিল।

লাভলক-এর (J. E. Lovelock) ভাষায় আমরা বলতে পারি,—"The countless number and variety of random encounters between individual molecular components of life may have eventually resulted in a chance association of parts which together could perform a life-like task, such as gathering sunlight and using its energy to contrive some further action which would otherwise have been impossible or forbidden by the laws of physics. (The ancient Greek myth of Prometheus stealing fire from heaven and the biblical story of Adam and Eve tasting the forbidden fruit may have far deeper roots in our ancestral history than we realize.) Later, as more of these primitive assembly forms appeared, some successfully combined and from their union more complex assemblies emerged with new properties and powers, and united in their turn, the product of fruitful associations being always a more potent assembly of working parts, until eventually there came

into being a complex entity with properties of life itself : the first micro-organism and one capable of using sunlight and the molecules of the environment to produce its own duplicate.[১]

আর একটা কথা এই যে, অজৈব (inorganic) উপাদান থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জীবনের উৎপত্তি হয়েছিল অর্থাৎ প্রাণের সৃষ্টি হয়েছিল জড় থেকে। তবে, সেই আদি যুগে জড় ও জীবনের মধ্যে সীমারেখা এত অস্পষ্ট যে পার্থক্য বোঝা কঠিন ছিল। তাই, বেলজিয়ামের জগদ্বিখ্যাত শিল্পী Hieronymus Bosch তাঁর 'নন্দন-কাননে ইভের জন্ম' চিত্রটিতে[২] জীবজন্তুদের মাঝখানে[৩] এমন এক অদ্ভুত ফোয়ারা এঁকেছেন, যার আকৃতিতে জড় ও জীবনের ভেদরেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

সমুদ্রে প্রায় ৩৫০ কোটি বছর আগে প্রথম প্রাণের জন্ম হয়েছিল বলে অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু এই সৃষ্টি সমুদ্রে হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে নিঃসন্দেহে কিছু বলা কঠিন। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার ফ্রেড হয়েল (Sir Fred Hoyle) বলেছেন, মহাবিশ্বে গ্রহ-নক্ষত্রদের মাঝে ভাসমান মেঘের (intersteller cloud) ভেতরে ব্যাকটেরিয়া থাকে। উনিশ শতকের পণ্ডিত Arrhenius বলেছিলেন যে, তারার আলো মহাকাশের ঐসব জীবাণুকে গ্রহ-নক্ষত্রে ছড়িয়ে যেতে সাহায্য করে। মহান্ধকারের মধ্য দিয়ে তারার আলো জীবনের বীজকে গ্রহ-নক্ষত্রে পৌঁছে দেয়। এইসব পণ্ডিতের কথা থেকে বিশ্বকবির 'বলাকা'র দুটি ছত্র আমাদের মনে পড়ে যায় :

'নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে'

হয়েল ও তাঁর সমর্থকরা বলেন যে, মহাকাশ হতে আগত ঐ জীবাণুদের আক্রমণে ইনফ্লুয়েনজা ও নানারকম সংক্রামক ব্যাধির সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ তাঁদের মতে জীবনের সৃষ্টি হয়েছিল পৃথিবীর বাইরে। তার প্রভাব পৃথিবীতে এসে প্রাণের সৃষ্টি ও জীব-বিবর্তনে সাহায্য করেছিল এবং সম্ভবত বিবর্তনের গতি প্রকৃতিতে পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল।[৪] তবে অনেক বিজ্ঞানী এই মতে বিশ্বাস করেন না।

সম্প্রতি জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আর এক আশ্চর্য আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা মহাকাশের সেই গ্যাস ও ধুলোর মেঘের মধ্যে জলীয় বাষ্প, মিথেন, ইথাইল, অ্যালকোহল, কার্বন-মোনোক্সাইড ইত্যাদির সন্ধান পেয়েছেন।[৫] এ থেকে মনে হয়, পৃথিবীর বাইরেও প্রাণের জন্ম হতে পারে।

আদিমতম প্রাণী হলো ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার মতো এককোষী জীব। তারা কিন্তু অক্সিজেন থেকে জীবনীশক্তি গ্রহণ করত না; আদি সমুদ্রে জৈব-রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণকে গাঁজিয়ে তুলে তা থেকে প্রাণধারণ করত, যেমন আজও কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়া করে থাকে।

কিন্তু শেষকালে এমন এক সময় এলো যখন সমুদ্রে তাদের খাদ্য অর্থাৎ রাসায়নিক পদার্থের ঐ মিশ্রণ প্রায় ফুরিয়ে গেল।

এদিকে সেই জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়া থেকে প্রচুর কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি হলো, যেমন গাঁজিয়ে ওঠা মদ থেকে বের হয় গ্যাসের বুদবুদ।

নতুন সমস্যার মোকাবিলা করতে গিয়ে কিছু জীবকোষের দেহে এমন রাসায়নিক পদার্থ তৈরি হলো যা সরাসরি সূর্যালোক থেকে জীবনীশক্তি গ্রহণ করতে পারে। তখন সেই পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ফলে ঐ জাতীয় জীবকোষের বংশবিস্তার অন্যদের চেয়ে দ্রুততর হলো। এবং তা থেকে জন্ম নিল ক্লোরোফিল যুক্ত জীবকোষ। সূর্যালোক, জল ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড থেকে ফোটোসিন্থেসিস প্রক্রিয়ায় ক্লোরোফিল তার খাদ্য শর্করা প্রস্তুত করে। কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিবেশে আজ থেকে ৩০০ কোটি বছরেরও আগে জীবজগতে এই বিরাট পরিবর্তন এসেছিল।

ফোটোসিন্থেসিস থেকে প্রচুর অক্সিজেন উৎপন্ন হলো এবং এই গ্যাস যুগ যুগ ধরে সমুদ্রের জলে মিশে যায় ও বায়ুমণ্ডলে জমে ওঠে। তখন নতুন এক জাতীয় প্রাণীকোষ জন্ম নেয়; এরা অক্সিজেন নিয়ে এবং উদ্ভিদকোষ বা অন্যান্য জীবাণুকে খাদ্য রূপে গ্রহণ করে বেঁচে থাকে। সেজন্যে বলা হয় যে, ক্লোরোফিল-যুক্ত জীবকোষ বা উদ্ভিদের পূর্বসূরীরা অক্সিজেনসেবী প্রাণীর সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিল। তারা না থাকলে প্রাণীদের জন্ম হতো না।

প্রথম প্রাণীদের মধ্যে কেউ কেউ জলে ভাসত, কেউ বা জলের নিচে ঢালু জায়গায় নিজেদের আটকে রাখত। আবার, কোনো কোনো প্রাণী চাবুকের মতো লেজ নেড়ে জলে সাঁতার দিত। যুগ যুগান্তের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তা থেকে জন্ম নিল স্পঞ্জ, জেলিমাছ, প্রবাল ও কীট প্রভৃতি।

বিবর্তন

আমরা দেখেছি যে, সৃষ্টির আদিতে ছিল এককোষী জীব ও তা থেকে কোটি-কোটি বছরের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রাণীজগতে এত বৈচিত্র্য এসেছে। এটা কি করে সম্ভব হলো তার যথার্থ ব্যাখ্যা প্রথম দিলেন উনিশ শতকের মহান বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন (Charles Darwin)। তাঁর এই ব্যাখ্যাকে বিবর্তনবাদ বা থিওরি-অফ ইভলিউশন (theory of evolution) বলা হয়। তবে, ডারউইনের এই মতবাদ প্রতিষ্ঠার পিছনে জেমস হাটন (Jame Hutton), উইলিয়াম স্মিথ (William Smith) প্রমুখ ভূতাত্ত্বিক পণ্ডিত এবং সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদ টমাস ম্যালথাসের (Thomas Malthus) অবদান অনস্বী-

কার্য। ভূতাত্ত্বিকদের আবিষ্কৃত কালনির্ণয় পদ্ধতি এবং ম্যালথাসের জনসংখ্যাতত্ত্ব থেকে সাহায্য না নিয়ে ডারউইনের কাজ বোধ হয় সম্ভব হতো না।

ডারউইনের বিবর্তনবাদকে যদি সংক্ষেপে ও সহজ করে বোঝাতে হয় তবে এইভাবে বলা যেতে পারে :

ক) জীবজগতে বিরাট বৈচিত্র্য। জীবের মধ্যে শুধু যে বিভিন্ন জাতি ও প্রজাতি (species) আছে তা নয়, এক জাতি বা প্রজাতির মধ্যেও বৈচিত্র্য থাকে এবং এমনকি এক পিতামাতার সন্তানদের মধ্যেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

খ) জীবের এক স্বাভাবিক প্রবণতা সন্তানসংখ্যা বৃদ্ধি। তাই, খাবার ও বাসস্থানের জন্যে প্রতিযোগিতা হয়। এই জীবনযুদ্ধ বিরামহীন।

গ) দৈহিক বৈচিত্র্যের ফলে কারো যোগ্যতা বেশি, কারো যোগ্যতা কম। যাদের যোগ্যতা কম তারা প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়। তারা যুদ্ধে, রোগে বা ক্ষুধার তাড়নায় আগে মরে যায়, এবং বেশি সন্তান রেখে যেতে পারে না। এইভাবে তারা ক্রমশ পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। শারীরিক যোগ্যতা যাদের বেশি তারা জীবনসংগ্রামে জয়ী হয়, বেশিদিন বাঁচে ও তাদের সন্তান-সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘকাল ধরে এইভাবে ক্রমোন্নতির মধ্য দিয়ে নতুন নতুন জাতি ও প্রজাতির সৃষ্টি হয়। প্রকৃতির নির্বাচনে (natural selection) যোগ্যরা টিঁকে যায়, এবং সেটা বোঝাতে গিয়ে ডারউইন হারবার্ট স্পেনসার-এর (Herbert Spencer) ব্যবহৃত 'survival of the fittest' কথাটিকে প্রয়োগ করেছেন।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বিশাল জিরাফ এবং অতি ক্ষুদ্র জীবাণুর কথা ধরা যেতে পারে। জিরাফের পূর্বপুরুষ গাছের পাতা খেত। তাদের সন্তানের মধ্যে কেউ কেউ লম্বা গলা নিয়ে জন্মেছিল, কারণ জীবের মধ্যে কিছু-না কিছু পার্থক্য থাকে। যে সন্তানগুলির গলা লম্বা তাদের পক্ষে উঁচু গাছের পাতা খাওয়া সহজ। তাই, তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকা স্বাভাবিক এবং শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সহজ। তাদের সন্তানসংখ্যা অন্যদের চেয়ে বৃদ্ধি পেল। এইভাবে ক্রম-পরিবর্তনের ফলে, মধ্য দিয়ে লম্বা-গলা জিরাফের সৃষ্টি হয়েছিল।

ব্যাকটেরিয়া এবং অনেক জীবাণুকে পেনিসিলিন দিয়ে মারা হয়। কিন্তু এদের মধ্য থেকে এমন ব্যাকটেরিয়া ও জীবাণুর উদ্ভব হয়েছে যারা পেনিসিলিনেও মরে না, যেমন স্ট্যাফাইলোকক্কাস। যাদের শরীর প্রথম থেকে এরকম তারা টিঁকে যায়।

জীব বিবর্তনের মূল কারণ যে প্রাকৃতিক নির্বাচন, সেকথা অস্বীকার করা যাবে না। প্রাণীদের মধ্যে বৈচিত্র্য আছে বলে এটা সম্ভব হয়েছে। ডারউইনের অনুসরণকারী অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে, জীবজন্তুর দৈহিক প্ল্যানের মধ্যে ছোট-ছোট বিচ্যুতি (deviation) থেকে কোটি-কোটি বছরের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন হয়েছে এবং বিচ্যুতিগুলি স্বাভাবিক। এখন অনেক জীববিজ্ঞানী

বলেন যে, দৈহিক প্ল্যানের এই বিচ্যুতির কারণ হলো mutation বা পরিব্যক্তি। এই মতের প্রবক্তা ছিলেন ওলন্দাজ বিজ্ঞানী হুগো (Hugo de Vries)। মিউটেশন বলতে বোঝায়, কোষের নিউক্লিক অ্যাসিডের মধ্যে সংকেতের পরিবর্তন (অর্থাৎ নিউক্লিওটাইডের বিন্যাসে পরিবর্তন)। সংকেতের পরিবর্তন হলে ঐ সংকেত অনুসারে গড়ে ওঠা প্রাণীর আকৃতিও ভিন্ন হবে। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, মিউটেশন আকস্মিক ভাবে হয়। মিউটেশন যেমন নিউক্লিওটাইডের বিন্যাসে স্বাভাবিক ও এলোমেলো পরিবর্তনে হয়, তেমন তেজস্ক্রিয়তা (radio-activity) অথবা মহাকাশ থেকে আসা রশ্মির প্রভাবেও হতে পারে। মূলার (Hermann J. Muller) প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, মাছির উপরে রঞ্জন-রশ্মি বা এক্স-রে দিলে তার নিউক্লিক অ্যাসিডে পরিবর্তন হয় এবং সন্তানদের মধ্যে অনেক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিউটেশনের ফল কিন্তু খারাপ। তবে, ফল ভালো হলে সেই প্রাণী আরো যোগ্য হয়ে ওঠে ও জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়। তখন তার সন্তানসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও নতুন দৈহিক প্ল্যানের ধারা চলতে থাকে। এইভাবে প্রকৃতি তার যোগ্য প্রতিনিধিকে নির্বাচন করে এবং বিবর্তনের স্রোত এগিয়ে চলে। তাই পণ্ডিতরা বলেন যে, মিউটেশন ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের সম্মিলিত কারণে জীবজগতে বিবর্তন হয়।

ইতিকথা

ভূতাত্ত্বিকরা পৃথিবীর সুদীর্ঘ ইতিহাসকে অনেকগুলি কালে ভাগ করেছেন। সবচেয়ে দীর্ঘ কালের নাম মহাকল্প (eon)। পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে কঠিন আবরণ যুক্ত প্রাণী আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাল মহাকল্প নামে পরিচিত। তার পরবর্তী সময়কে তিনটি অধিকল্পে (era) বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক অধিকল্পের মধ্যে আছে কতকগুলি কল্প (period)। আবার, কল্পকে ভাগ করা হয়েছে অধিযুগে (epoch)।

অতীতে পৃথিবীর আবরণে বহুবার ব্যাপকভাবে ভাঁজ হওয়ায় বড় বড় পর্বত-মালার সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে আগ্নেয়গিরির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলেও পর্বত গড়ে উঠেছিল। দ্রুত পর্বতমালা সৃষ্টির ঐ সময়গুলিকে ভূপৃষ্ঠের পরম পরিবর্তনকাল বলা হয়ে থাকে। দুই পরিবর্তন কালের অন্তর্বর্তী দীর্ঘ সময়কে ভূতাত্ত্বিকরা অধিকল্প নাম দিয়েছেন।

প্রতি অধিকল্পে পৃথিবীপৃষ্ঠে অনেক পরিবর্তন আসে। ছোট ছোট ভাঁজ হওয়ার ফলে জন্ম নেয় পর্বতমালা ও উচ্চভূমি। জলপ্রবাহে উচ্চভূমিতে ক্ষয় ধরে। মহাসাগর স্থলভাগকে গ্রাস করায় সৃষ্টি হয় সমুদ্র। তারপর আবার

স্থলভাগ মাথা তুলতে শুরু করে এবং অগভীর সাগরের জল সেখান থেকে পিছিয়ে যায়। ভূ-আবরণের পরিবর্তনগুলি এই ধারায় প্রতি কল্পে সংঘটিত হয়েছিল। কল্পকে ছোট ছোট ভাগ করে সেগুলিকে বলা হয়েছে অধিযুগ। এই অধ্যায়ের শেষে একটি ছকে ভূতাত্ত্বিক কাল (আনুমানিক), প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সেই সঙ্গে প্রাণীবিবর্তনের প্রধান ঘটনাগুলিকে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাক-ক্যাম্ব্রিয়ান মহাকল্পে পৃথিবীর স্থলভাগ ছিল অতি বিশাল এক মহাদেশ নিয়ে গঠিত। সেই আদি মহাদেশ ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে অর্ডোভিশিয়ান কল্পে জলবায়ুতে আসে বিরাট পরিবর্তন। টুকরো হয়ে যাওয়া মহাদেশগুলি পরে আবার যুক্ত হয়। আটলান্টিক মহাসাগরের আদিরূপ জলভাগ সিলুরিয়ান কল্পে হ্রাস পায় এবং উত্তর আমেরিকা ও উত্তর ইয়োরোপ ধাক্কা খেয়ে যুক্ত হওয়ায় জন্ম নেয় এক বিরাট পর্বতমালা যা ক্ষয়ে ক্ষয়ে বর্তমান স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার পর্বতের রূপ নিয়েছে।

মধ্য-প্যালিওজোইক অধিকল্পের মহাদেশগুলিকে পণ্ডিতরা তিনটি প্রধান ভূখণ্ডে ভাগ করে থাকেন—গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড (আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ মেরু বা অ্যান্টার্টিকা, এবং ভারতবর্ষ) ইউরামেরিকা (ইয়োরোপ এবং উত্তর আমেরিকা) এবং সাইবেরিয়া (বর্তমান সাইবেরিয়া ও সম্ভবত এশিয়ার বাকি অংশ)। প্রধান ভূখণ্ডগুলি প্যালিওজোইক (পুরাজীবীয়) অধিকল্পের শেষভাগে পরস্পর যুক্ত হয়। ইউরামেরিকা ও সাইবেরিয়া ধাক্কা খেল রাশিয়ার উরাল পর্বতমালা বরাবর এবং এই মহাযোগের ফলে জন্ম নেয় লাউরেশিয়া। লাউরেশিয়া ও গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের ধাক্কায় মধ্য-ইয়োরোপের পর্বতমালা মাথা তোলে।

সব ভূখণ্ডগুলি এক হয়ে পার্মিয়ান কল্পের মধ্যে সৃষ্টি হয় বিশাল মহাদেশ প্যান্‌গিয়া সেই বিশাল মহাদেশের অন্তর্গত লাউরেশিয়া ও গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড পশ্চিম দিকে পরস্পর যুক্ত থাকলেও পূর্বদিকে তাদের মাঝে ছিল টেথিজ সাগরের ব্যবধান।[৮]

প্যান্‌গিয়া মহাদেশে ট্রায়াসিক কল্পে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বড় বড় চিড় খায়। ঐ ভূখণ্ড ক্রমে ভাঙ্গতে আরম্ভ করে। উত্তর আমেরিকা থেকে একটি ভূখণ্ড কল্পে জুরাসিক পৃথক হয়। গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড ভেঙ্গে তিনটি ভূখণ্ড পরস্পর থেকে একটু দূরে সরে যায়।

গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড ক্রীটেশাস কল্পে ভাঙ্গতে থাকে। যে বিশাল ফাটল আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ আমেরিকাকে পৃথক করে, তা উত্তর দিকে আরো বিস্তৃত হওয়ার ফলে প্রায় সাড়ে-ছয় কোটি বছর আগে উত্তর আমেরিকা থেকে গ্রীনল্যাণ্ড আলাদা হয়। অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ মেরু (অ্যান্টার্টিকা) ভাগ হয় আরো পরে। এদিকে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড থেকে একটি ভূখণ্ড আলাদা হয়ে উত্তরে এশিয়ার উপ-কূলের দিকে সরে আসতে থাকে। এই ভূখণ্ড এশিয়ার দক্ষিণ উপকূলের সঙ্গে

যুক্ত হওয়ায় জন্ম নিল আমাদের ভারতবর্ষ। আর সেই প্রচণ্ড চাপে সেখানকার ভূ-আবরণ কুঞ্চিত হয়ে মাথা তুলে দাঁড়ালো হিমালয় পর্বতমালা।

মহাবিশ্বের জন্ম আজ থেকে ১৫০০ কোটি বছর আগে (আমাদের পুরনো ধারাপাতের হিসাবে ১ খর্ব ৫ বৃন্দ বছর / ইংরেজি হিসাবে ১৫ হাজার 'মিলিয়ন' বা নিযুত বছর, অথবা ১৫ 'বিলিয়ন' বছর / সংখ্যায় লিখলে হয় ১৫,০০০,০০০,০০০ বছর)। এক বিশাল বিস্ফোরণের (big bang) মধ্য দিয়ে হয়েছিল বলে অনেক পণ্ডিত মনে করেন।[৭] —সেই ১৫০০ কোটি বছরকে এক বছরে নিয়ে এসে একটি মহাজাগতিক পঞ্জিকা তৈরি করেছেন কার্ল সাগান (Carl Sagan)। মহাজাগতিক পঞ্জিকা অনুসারে ২৪ দিন হলো ১০০ কোটি বছরের সমান। পঞ্জিকাটি চিত্তাকর্ষক। এখানে অধ্যাপক সাগান সিন্ধুকে বিন্দুর মধ্যে দেখিয়েছেন। মহাজাগতিক পঞ্জিকা অবলম্বনে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে আমরা এইভাবে উল্লেখ করতে পারি :

১ জানুয়ারি	—	বিশাল বিস্ফোরণ—বিশ্বের জন্ম
১ মে	—	ছায়াপথের সৃষ্টি
৯ সেপ্টেম্বর	—	সূর্য ও গ্রহদের জন্ম
২৫ সেপ্টেম্বর	—	পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব
১৫ নভেম্বর	—	নিউক্লিয়াস যুক্ত কোষের সৃষ্টি
১ ডিসেম্বর	—	বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি হতে আরম্ভ করে
১৬ ডিসেম্বর	—	প্রথম কীট
১৭ ডিসেম্বর	—	প্রাক-ক্যাম্ব্রিয়ান মহাকল্পের অবসান—পুরাজীবীয় অধিকল্প ও ক্যাম্ব্রিয়ান কল্পের স্থচনা—জলে অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের রাজত্ব
১৯ ডিসেম্বর	—	অর্ডোভিশিয়ান কল্প—মেরুদণ্ডী প্রাণীদের পূর্বপুরুষের আবির্ভাব
২০ ডিসেম্বর	—	সিলুরিয়ান কল্প—স্থলভাগে প্রথম উদ্ভিদের জন্ম
২১ ডিসেম্বর	—	ডেভোনিয়ান কল্পের স্থচনা—স্থলভাগে সন্ধিপদ প্রাণীর আগমন
২২ ডিসেম্বর	—	উভচরের আবির্ভাব
২৩ ডিসেম্বর	—	কার্বনিফেরাস কল্প—বনের ব্যাপক বিস্তার—সরীসৃপের সৃষ্টি
২৪ ডিসেম্বর	—	পার্মিয়ান কল্পের স্থচনা—সরীসৃপের মধ্যে বৈচিত্র্য আসে
২৫ ডিসেম্বর	—	পুরাজীবীয় অধিকল্পের অবসান এবং মধ্যজীবীয় অধিকল্পের স্থচনা

২৬ ডিসেম্বর — ট্রায়াসিক কল্প – ডাইনোসরের আদিপুরুষ – স্তন্যপায়ীর আগমন
২৭ ডিসেম্বর — জুরাসিক কল্প – পাখির আদিপুরুষের আবির্ভাব
২৮ ডিসেম্বর — ক্রিটেশাস কল্প – ফুলওয়ালা গাছের জন্ম – ডাইনোসরের অবলুপ্তি
২৯ ডিসেম্বর — নবজীবীয় অধিকল্পের সূচনা – প্রথম প্রাইমেটের সৃষ্টি
৩০ ডিসেম্বর — প্রায়-মানবের জন্ম – বিরাটাকার স্তন্যপায়ীদের রাজত্ব
৩১ ডিসেম্বর — প্লায়োসিন অধিযুগের অবসান – প্রথম মানব।

বর্ষশেষে ৩১ ডিসেম্বরে রাত্রি সাড়ে-দশটায় হলো প্রথম মানবের আগমন। রাত্রি ১১টা বেজে ৪৬ মিনিটে পিকিং-এর আদিমানব আগুনের ব্যবহার শিখলো। শেষে ১১ টা বেজে ৫৯ মিনিট ২০ সেকেণ্ডে মানুষ কৃষিকাজ শিখে স্থায়ীভাবে জীবনযাপন শুরু করে। পরবর্তী মানবসভ্যতার ইতিহাস তৈরি হয় রাত্রির শেষ ৪০ সেকেণ্ডের মধ্যে। বর্ণমালার আবিষ্কার হলো ১১ টা বেজে ৫৯ মিনিট ৫১ সেকেণ্ডে। বলতে গেলে, আমাদের লিখিত ইতিহাস শেষ ১০ সেকেণ্ড সময়ের ভেতরে গড়ে উঠেছে। আর মধ্যযুগ থেকে বর্তমান যুগে আসতে মাত্র এক সেকেণ্ডের চেয়ে একটু বেশি সময় লেগেছে। এক বছরের মধ্যে কয়েক সেকেণ্ড সময় কিছুই নয়। তাই, অধ্যাপক সাগানের এই পঞ্জিকা দেখে কবি জীবনানন্দের লেখা একটি ছত্র মনে পড়ে যায়—

'হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো' — মহাকালের পটভূমিকায় মানবসভ্যতার এই কয়েক হাজার বছর এক বুদ্বুদ ছাড়া আর কি!

শব্দ পরিচিতি

ভূতাত্ত্বিক কালের নাম দিতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা গ্রীক ও ল্যাটিন শব্দ এবং প্রাচীন শিলা আবিষ্কারের স্থানের নাম ব্যবহার করেছেন। নামগুলির ব্যুৎপত্তি এখানে দেওয়া হলো:

প্যালিওজোইক – palaeo = ancient ; zoikos = animal (অর্থাৎ পুরাজীবীয়)
মেসোজোইক – meso = middle (অর্থাৎ মধ্যজীবীয়)
সিনোজোইক – kainos = new (অর্থাৎ নবজীবীয়)
ক্যাম্‌ব্রিয়ান – ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের ওয়েল্‌স-কে রোমানরা বলত ক্যাম্‌ব্রিয়া।
অর্ডোভিশিয়ান ও সিলুরিয়ান – ওয়েল্‌স্-এ অর্ডোভাইস ও সিলুর নামে প্রাচীন জাতি বাস করত।

ডেভোনিয়ান – ইংল্যাণ্ডের ডেভোনশায়ার থেকে নামকরণ ।
কার্বনিফেরাস – কার্বন বা অঙ্গার থেকে নাম দেওয়া হয়েছে ।
পার্মিয়ান – উত্তর রাশিয়ার পার্ম বলে এক জায়গার নাম থেকে হয়েছে ।
ট্রায়াসিক – ট্রাই শব্দের অর্থ তিন । জার্মানিতে ঐ কল্পের শিলায় তিনটি স্তর পাওয়া গেছে ।
জুরাসিক – ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ডের মধ্যবর্তী জুরা পর্বতমালা থেকে এই নামকরণ।
ক্রিটেশাস – খড়ি-পাথরকে (chalk) ক্রিটা বলে । ঐ কল্পের খড়ি-পাথরের নিদর্শন বেশি পাওয়া গেছে ।
প্যালিওসিন – palaeo = ancient ; kainos = new.
ইওসিন – eos = dawn.
অলিগোসিন – oligos = small.
মায়োসিন – meion = less.
প্লায়োসিন – pleion = more.
প্লিস্টোসিন – pleistos = most.

উ ল্লে খ প ঞ্জি

১. 'Gaia' by J. E. Lovelock (1979 edn) p. 14
২. ছবিটি 'Garden of Earthly Delights' চিত্রের একটি অংশ।
৩. এমনকি তার মধ্যে ডাইনোসরের মতো সরীসৃপও আছে।
৪. 'New Theory of Life on Earth – *The Statesman* (21-1-82)
৫. Sanctuary : Asia : vol. 11. no 2, April-June 1982
৬. গ্রীক পুরাণ বর্ণিত পৃথিবীর সমুদয় জলভাগের জনক ওশানাসের ভগ্নী ও পত্নী ছিলেন টেথিজ।

৭. সম্প্রতি ১৯৮২ সনের মে মাসে, অস্ট্রেলিয়ার সিডনির নিকট পারকেস নামক স্থানে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা রেডিও টেলিস্কোপ দিয়ে এক অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক রা Quasar আবিষ্কার করেছেন যেখান থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে দু'-হাজার কোটি বছর সময় লাগে। এই আবিষ্কার থেকে কি মনে হয় না যে মহাবিশ্বের জন্ম আরো আগে হয়েছিল? তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পণ্ডিত কার্ল সাগান (Carl Sagan) বলেছেন, – 'The Big Bang may be the beginning of the universe, or it may be a discontinuity about the earlier history of the uuiverse was destoryed.' তবে তিনি সেই সঙ্গে একথাও বলেছেন যে 'it is certainly the earliest event of which we have any record' ('The Dragons of Eden')

২
জীবের শ্রেণী বিভাগ

আদি কালের প্রাণীদের কথা উল্লেখ করার আগে জীবের শ্রেণীবিভাগ কিভাবে করা হয়, সে সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। বিজ্ঞানীরা প্রাণীদের দুই ভাগে বিভক্ত করে থাকেন—এককোষী প্রাণী (protozoa) এবং বহুকোষী প্রাণী (metazoa)।

বহুকোষী প্রাণীদের মধ্যে আছে অনেকগুলি পর্ব (phylum)। প্রত্যেক পর্ব আবার কতকগুলি শ্রেণী (class) নিয়ে গঠিত। কতকগুলি বর্গ (order) নিয়ে একটি করে শ্রেণী। প্রতি বর্গে থাকে বিভিন্ন গোত্র (family)। কয়েকটি গণ (genus) নিয়ে প্রত্যেক গোত্র সৃষ্টি হয়েছে; আর প্রতি গণে আছে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি (species)। প্রজাতি হলো শ্রেণীবিভাগের সবচেয়ে ছোট গণ্ডি। এক প্রজাতির অন্তর্গত প্রাণীদের মধ্যে মিলন হলে যে সন্তান হয় তার প্রজনন ক্ষমতা (fertility) থাকে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির প্রাণীদের মিলন থেকে উৎপন্ন সন্তানের এই ক্ষমতা থাকে না।

মেটাজোয়ার অন্তর্গত কতকগুলি পর্বের কথা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো—

ক) **পরিফেরা** ॥ গায়ে ঝাঁঝরির মতো ফুটো থাকার জন্যে স্পঞ্জ এই পর্বের অন্তর্গত। সেই ছোট ছোট ফুটো আবার ভেতরের পথ দিয়ে কতকগুলি বড় গর্তের সঙ্গে যুক্ত। স্পঞ্জ তার ভেতরের দেওয়ালে লাগানো প্রোটোজোয়াগুলির বেতের মতো লেজ কাঁপিয়ে ফুটো দিয়ে সমুদ্রের জল টেনে নেয় এবং তা থেকে খাবার ছেঁকে বড় গর্ত দিয়ে জল বের করে দেয়। স্পঞ্জের শরীর দুই স্তরে (diploblestica) গঠিত। স্নান করার স্পঞ্জের দেহ কোমল, কিন্তু অন্য শ্রেণীর স্পঞ্জের কাঠামো সিলিকা অথবা চুন জাতীয় জিনিস দিয়ে তৈরি।

খ) **সিলেন্‌টেরিটা** (গ্রীক Koilos = ফাঁপা, enteron = অন্ত্র) ॥ এদের দেহ দুই স্তরে বিভক্ত টিস্যু দিয়ে তৈরি। দেহের মাঝখান পাত্রের মতো; ভেতর দিকের কোষগুলি খাদ্য পরিপাকের কাজে সাহায্য করে। ফাঁপা থলির মতো অংশটির একদিকে মুখগহ্বর। মুখগহ্বরকে ঘিরে থাকে কর্ষিকা (tentacle), যা দিয়ে সে শিকার ধরে। জেলিমাছ প্রভৃতি প্রাণীর কর্ষিকাগুলিতে হুল থাকে। জেলিমাছের শরীরে দুই স্তরের মাঝে আছে থকথকে নরম অংশ। সিলেনটেরেটা

পর্বের প্রাণীদের শরীরে কেন্দ্র থেকে ব্যাসার্ধ বরাবর বিস্তৃত সব অঙ্গগুলি পরস্পর প্রতিসম (radially symmetrical)। এদের মধ্যে প্রধান শ্রেণী হলো : হাইড্রোজোয়া—হাইড্রা ; অ্যান্থোজোয়া—প্রবাল ও সাগর-কুসুম (sea anemone) ; স্কাইফোজোয়া—জেলিমাছ।

গ) **প্ল্যাটিহেল্‌মিন্‌থেস** (গ্রীক platus = চ্যাপ্টা ; helmins = কীট) ॥ এই প্রাণীদের শরীর তিন স্তরে (triploblestica) গঠিত এবং চ্যাপ্টা। দেহের দু'পাশ পরস্পর প্রতিসম। কীটগুলির স্নায়ুতন্ত্র থাকে। এই পর্বের মধ্যে প্রধান শ্রেণীগুলির নাম : ট্রিমাটোডা—কৃমি ; সিস্টোডা—ফিতাকৃমি (tapeworm)।

ঘ) অ্যানিলিডা (অঙ্গুরীমাল) ॥ কতকগুলি আংটার মতো অংশ দিয়ে এদের দেহ গঠিত বলে এর আর এক নাম segmented worm ; শরীর তিন স্তরে তৈরি ও তার দু'পাশ পরস্পর প্রতিসম। প্রাণীগুলির স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্ক আছে। পলিকিটা শ্রেণীর জীবের চোখ ও শুঁড় থাকে। কোনো কোনো প্রাণীর দেহে কুঁচির মতো (bristle) আছে যা চলার কাজে সাহায্য করে। দেহের প্রতি খণ্ডে চলন-অঙ্গ থাকে এবং সেগুলি সন্ধিহীন। প্রধান শ্রেণীগুলির নাম : পলিকিটা—নেরেইস ; অলিগোকিটা—কেঁচো ; হিরুডিনিয়া—জোঁক।

ঙ) আর্থ্রোপডা (গ্রীক arthron = সন্ধি ; pous = পা) ॥ পাগুলি সন্ধিযুক্ত বলে এই প্রাণীদের চলাফেরায় সুবিধা হয়। শরীরও কয়েকটি ভাগে গঠিত বলে তার অনেক সুবিধা আছে। প্রথমত—ভ্রূণ অবস্থা থেকে দেহ বর্ধিত হওয়া সহজ। দ্বিতীয়ত—এক এক ভাগ (অঙ্গ) এক একটি কাজের উপযোগী হয়ে গড়ে উঠতে পারে, এবং তৃতীয়ত—অঙ্গগুলির মধ্যেপারস্পরিক সহযোগিতা আরো সুষ্ঠুভাবে হওয়া সম্ভব। দেহ তিন স্তরে গঠিত এবং দু'পাশ পরস্পর প্রতিসম। বিভিন্ন সন্ধিপদ প্রাণীর শরীরকে ঢেকে থাকে এক রকম আবরণ যা প্রোটিন পদার্থের সঙ্গে ক্যালসিয়াম ফসফেট অথবা ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিয়ে তৈরি ; একে কাইটিন বলে। এই আবরণ তার দেহের কোমল অঙ্গগুলিকে রক্ষা করে। সন্ধিপদ প্রাণীদের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য সর্বাধিক এবং তার প্রধান শ্রেণী হলো : ক্রাস্টেসিয়া ('কবচী' প্রাণী)—কাঁকড়া, চিংড়ি ; অ্যারাক্‌নিডা—মাকড়সা[১] ; বৃশ্চিক ; মিরিয়াপডা—বিছা বা 'শতপদ' কীট ; ইনসেক্টা—মাছি, প্রজাপতি প্রভৃতি পতঙ্গ।

চ) মোলাস্কা (ল্যাটিন mollis = কোমল) ॥ প্রাণীগুলির আর এক নাম কম্বোজ। এদের কোমল দেহকে ঢেকে থাকে টিস্যুর তৈরি আবরণ (mantle), আর এই আবরণের ওপরে সাধারণত ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিয়ে তৈরি খোলা থাকে। এ জাতীয় প্রাণীর পা কোমল ও পেশল। জলচরেরা শ্বাসকাজ চালায় ফুলকার মতো অঙ্গ দিয়ে এবং স্থলচরেরা বাতাসে শ্বাস নেয়।

কম্বোজ পর্বের অন্তর্গত প্রধান শ্রেণী : গ্যাস্ট্রোপডা ('উদরপদ') – শামুক (যাদের একটি করে খোলা থাকে) ; পেলিসিপডা (যাদের পা কুঠারের মতো) – ঝিনুক (যাদের দুটি করে খোলা) ; সেফালোপডা ('শিরস্পদ') – অকটোপাস, স্কুইড ও নটিলাস।

ছ) **ব্র্যাকিওপডা** ॥ দুটি খোলা দিয়ে এদের শরীর ঢাকা থাকে – পিঠের (dorsal) খোলা ছোট, পেটের (ventral) খোলা বড় । পিঠের খোলার এক প্রান্তে গর্ত যার মধ্য দিয়ে একটি মাংসল বৃন্ত গেছে ; বৃন্তটি জলের নিচে কোনো বস্তুর সঙ্গে অথবা মাটিতে সংলগ্ন হয়ে থাকে । আদিম ব্র্যাকিওপডা সমুদ্রের স্রোত থেকে খোলার মধ্যে খাবার ছেঁকে নিতে পারত । প্রদীপের মতো দেখতে 'ল্যাম্প্ শেল্' এই পর্বের অন্তর্গত ।

জ) **একিনোডার্মাটা** (গ্রীক echinos = কণ্টকযুক্ত ; derma = ত্বক) ॥ এই প্রাণীগুলি সমুদ্রবাসী । দেহের কেন্দ্র থেকে ব্যাসার্ধ বরাবর বিস্তৃত সব অঙ্গগুলি পরস্পর প্রতিসম । সাধারণত ক্যালসিয়াম কার্বনেটের তৈরি আবরণে শরীর ঢাকা থাকে এবং অনেক প্রাণীর গায়ে কাঁটা দেখা যায় । এদের পায়ে নালি থাকে ও সেই নালি সমুদ্রের জলে পূর্ণ । নালির 'বাল্ব'গুলি সংকুচিত হলে জলের চাপে পা প্রসারিত হয় এবং যে কোনো বস্তুকে ধরে থাকতে পারে । এদের মধ্যে প্রধান শ্রেণী হলো : অ্যাস্টেরয়ডিয়া – তারামাছ ; একিনয়ডিয়া – 'সমুদ্র-আর্চিন' ; হলোথুরয়ডিয়া – সমুদ্র-শশা (sea cucumber) ; ক্রিনয়ডিয়া – সমুদ্র-পদ্ম (sea-lily) ।

ঝ) **কর্ডাটা** ॥ সব মেরুদণ্ডী প্রাণী এই পর্বের মধ্যে পড়ে । কর্ডাটাদের মধ্যে যদিও কঠিন মেরুদণ্ডহীন কয়েকটি প্রাণী আছে, তবে এই জাতীয় সব জীবের দেহে একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয় এবং তা হলো শরীরের মধ্যে পেশীতন্তু দিয়ে তৈরি ও দীর্ঘ অক্ষ বরাবর বিস্তৃত একটি ঋজু অঙ্গ যার নাম 'নোটোকর্ড' । অধিকাংশ প্রাণীর নোটোকর্ড ঘিরে মেরুদণ্ডের অস্থিসন্ধিগুলি (vertebra) সাজানো । নোটোকর্ডের সম্মুখপ্রান্তে সাধারণত জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি থাকে এবং তা দিয়ে এদের মস্তক গঠিত । এই পর্বের অধিকাংশ প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্রের মূল কেন্দ্র বা মস্তিষ্ক থাকে করোটির (skull) মধ্যে । আদিম কর্ডাটাদের মধ্যে 'সমুদ্র-স্কোয়ার্ট' অন্যতম । লার্ভা অবস্থায় এর শরীরে দৈর্ঘ্য বরাবর নোটোকর্ড থাকে, কিন্তু বড় হলে আর নোটোকর্ড থাকে না । উন্নত প্রাণী স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে ভ্রূণ অবস্থায় প্রথম দিকে নোটোকর্ড থাকে এবং পরে সেই স্থানে মেরুদণ্ড গড়ে ওঠে । উন্নত কর্ডাটাদের মেরুদণ্ড থাকে এবং তাদের প্রধান শ্রেণী হলো :

অ্যাগ্নাথা – ল্যাম্প্রে মাছ (এক রকম চোয়ালহীন মাছ) ;
তরুণাস্থিযুক্ত মাছ – হাঙর, শংকর মাছ (sting ray) ;
অস্থিযুক্ত মাছ ;

২

উভচর – ব্যাং, স্যালামাণ্ডার ;
সরীসৃপ – গিরগিটি, কুমির, কচ্ছপ, সাপ ;
পাখি ;
স্তন্যপায়ী ।

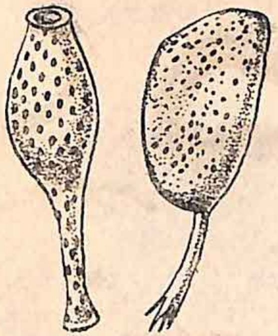
জীবের শ্রেণীবিভাগ কিভাবে করা হয়ে থাকে, তার উদাহরণ স্বরূপ সিংহকে নেওয়া যেতে পারে। সিংহের পর্ব হলো কর্ডাটা এবং তার মধ্যে সে মেরুদণ্ডী প্রাণী। তার শ্রেণী – স্তন্যপায়ী [যার মধ্যে আছে 'প্রাইমেট' (বানর, শিম্পাঞ্জি, মানুষ প্রভৃতি), কীটভুক (ছুঁচো), করপক্ষ (বাদুড়), তীক্ষ্ণদন্ত (ইঁদুর, কাঠ-বিড়াল প্রভৃতি), মাংসাশী, তিমি, শুণ্ডধারী, সশফ (গোরু, ঘোড়া প্রভৃতি খুরযুক্ত প্রাণী), দ্বিগর্ভ (ক্যাঙ্গারু, অপোসাম প্রভৃতি) ইত্যাদি বর্গ] ।

বর্গ – মাংসাশী (যার মধ্যে আছে ভালুক, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি গোত্র)
গোত্র – ফেলিডি অর্থাৎ বিড়াল (যার মধ্যে আছে লিঙ্ক্স এবং বাঘ, বিড়াল প্রভৃতি প্রাণী) ;
গণ – ফেলিস (যার মধ্যে আছে বিড়াল, বাঘ, পুমা, জাগুয়ার প্রভৃতি প্রজাতি) ;
প্রজাতি – লিও ।

উল্লেখপঞ্জি

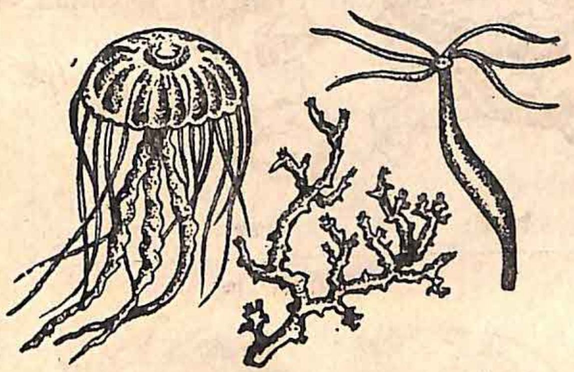
১. গ্রীক পুরাণে বলেছে যে, অ্যারাকনি নামে এক বালিকার সঙ্গে বয়ন কৌশলের প্রতিযোগিতায় দেবী আথেনা পরাজিত হয়ে ঈর্ষাবশত ঐ বালিকাকে শাপ দিয়ে মাকড়সায় রূপান্তরিত করেছিলেন যাতে সে অনন্তকাল ধরে জাল বুনতে থাকে। তাইমাকড়সা জাতির নাম অ্যারাকনিডা ।

পরিফেরা (১)



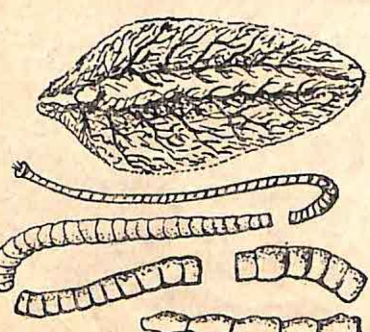
স্পঞ্জ

সিলেন্‌টেরেটা (২)



জেলি মাছ প্রবাল হাইড্রা

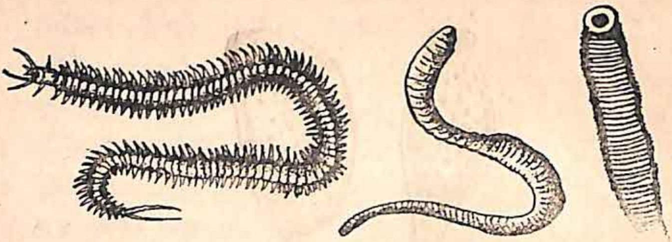
প্ল্যাটিহেল্‌মিন্‌থেস (৩)



যকৃৎ-কৃমি

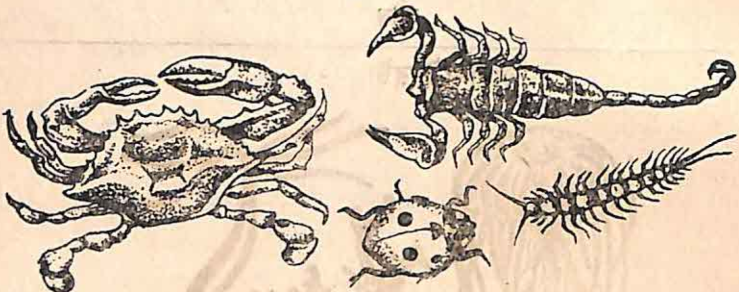
ফিতা-কৃমি

অ্যানিলিডা (৪)



নেরেইস্ কেঁচো জোঁক

আর্থ্রোপডা (৫)



বৃশ্চিক

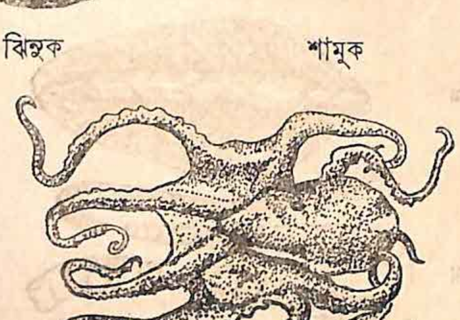
বিছা

কাঁকড়া পতঙ্গ

মোলাস্কা (৬)

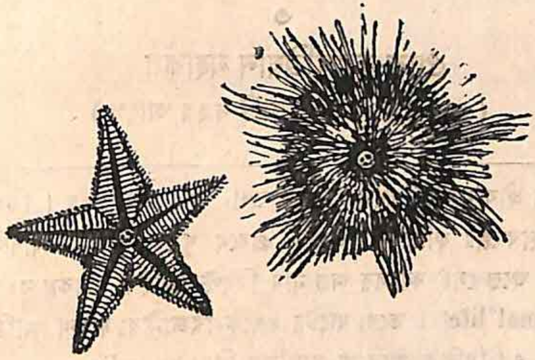


ঝিনুক শামুক



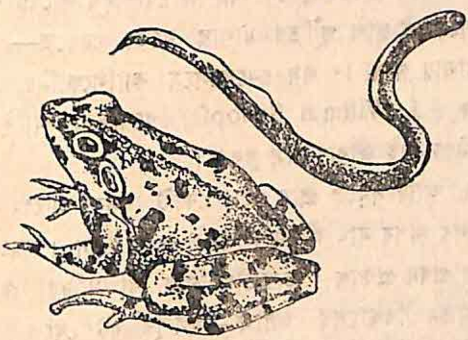
অক্টোপাস

একিনোডার্মাটা (৭)



তারা মাছ   সমুদ্র 'আর্চিন'

কর্ডাটা (৮)



৩

প্রাক-ক্যাম্ব্রিয়ান মহাকল্প

(৪৬০ থেকে ৫৭ কোটি বছর আগে)

সুদূর অতীতের জীব সম্পর্কে ফসিল থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু প্রাক-ক্যাম্ব্রিয়ান মহাকল্পের ফসিলের নিদর্শন প্রথমে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ফসিলের অভাবের জন্যে সেই কালের অন্য নাম ক্রিপ্টোজোইক মহাকল্প বা 'Eon of hidden animal life'। তবে, ষাটের দশকে বিজ্ঞানীরা দক্ষিণ আফ্রিকার Fig Tree Chert-এ (সিলিকা জমে যে পাললিক শিলা বা sedimentary rock হয় তাকেচার্ট বলে) প্রায়৩২০কোটি বছরের পুরনো ব্যাকটিরিয়াওনীল-সবুজ অ্যাল্‌জির (ক্লোরোফিল যুক্ত কোষ) ফসিল আবিষ্কার করেছেন। সাম্প্রতিক কালে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রায় ৩৫০ কোটি বছরের পুরনো ব্যাকটিরিয়া-সদৃশ জীবের ফসিল পাওয়া গেছে; পাথরের গায়ে এই ছাপ পুঁতির মালার মতো দেখতে—হাজার হাজার জীবকোষ সেই মালায় গাঁথা।[১] লস-এনজেলেসে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত জে. শফ্ (J. William Schopf) বলেছেন, আদি যুগে কোনো অগভীর সমুদ্রের নিচে সেই জীবাণু বাস করত।

অনেকে মনে করেন যে, আদি সমুদ্রে প্রায় ৩৫০ কোটি বছর আগে প্রথম প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছিল। জলের অপর নাম জীবন। জলই সৃষ্টির উৎস। হয়তো বা জলের মধ্যেই জীবনধারার প্রথম প্রকাশ। ভারতীয় শিল্পে বা মন্দির স্থাপত্যে পূর্ণঘটের ব্যবহার সেই সনাতন বিশ্বাসের রুদ্রাক্ষ—জলপূর্ণ ঘট থেকে উদ্‌গত পত্রাবলীর উচ্ছ্বসিত ছন্দ জীবনের সৃষ্টি ও বহুবিধ বিকাশকে বোঝাচ্ছে।

ব্যাকটিরিয়া প্রভৃতি জীবাণু থেকে কিভাবে উদ্ভিদকোষ এবং উদ্ভিদকোষ থেকে প্রাণীকোষের উদ্ভব হয়েছিল, তা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

প্রাণ সৃষ্টির সময় থেকে দুই শতাধিক কোটি বছরের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এককোষী জীবের মধ্যে বৈচিত্র্য দেখা দিল—কেউ জলে ভেসে থাকে, কেউবা চাবুকের মতো লেজ নেড়ে সাঁতার দেয় (আজও সুতোর মতো চেহারাওয়ালা ব্যাকটিরিয়া আছে যার নিদর্শন Spirochetes)। অ্যাল্‌জি ফোটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ায় আপন খাদ্য প্রস্তুত করলো সূর্যালোক, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল থেকে। ফোটোসিনথেসিস হতে উৎপন্ন অক্সিজেনের জলে ও বায়ুমণ্ডলে মিশতে শতকোটি বছরের চেয়েও বেশি সময় লাগলো। অতীতে যেসব এককোষী জীব অক্সিজেনহীন পরিবেশে জলে বেঁচে থাকত (Anaerobic cells) তাদের অনেকে

অক্সিজেনের প্রভাবে প্রাণ হারালো। কোনো কোনো জীব আত্মগোপন করলো অক্সিজেন মুক্ত কাদার মধ্যে, যেখানে আজও তাদের উত্তরসূরীরা বাস করে (যেমন, অক্সিজেনহীন বদ্ধ জলায় থাকে মিথেন সৃষ্টিকারী জীবাণু) । আবার, কিছু জীব সেই নতুন পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিল। তারা আপন খাদ্যের সঙ্গে অক্সিজেনজাত শক্তিকে মিশিয়ে বেঁচে থাকত ; তাদের বলা হয় Aerobic cells । জৈব-রাসায়নিক পদার্থকে গাঁজিয়ে তোলার চেয়ে অক্সিজেন-কার্বনের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বেশি জীবনীশক্তি উৎপন্ন হয় বলে এ জাতীয় জীবকোষের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেল । এইভাবে জন্ম নিয়েছে অক্সিজেন গ্রহণ-কারী জীবকোষ ।

কিন্তু বিভিন্ন জাতীয় জীবকোষ যখন পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে প্রাণধারণ করতে আরম্ভ করলো, তখন বিবর্তন ধারায় এলো এক নতুন অধ্যায়। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন মিথোজীবীত্ব (symbiosis) । মিথোজীবীত্ববাদে বিশ্বাসী পণ্ডিতদের মতানুসারে ব্যাকটিরিয়া জাতায় বৃহদাকার জীবাণুর শরীরে অক্সিজেন গ্রহণকারী জীবকোষ এমনভাবে প্রবেশ করেছিল যে তাতে কারো ক্ষতি হয়নি। ব্যাকটিরিয়া যে কার্বনপূর্ণ খাদ্য গ্রহণ করত, তাকে সেই ক্ষুদ্র জীবকোষ অক্সিজেনের সঙ্গে মিশিয়ে দিত এবং তার ফলে উৎপন্ন অধিকতর জীবনীশক্তিতে উভয়ের উপকার হতো।

প্রাণধারণের এই সুবিধার ফলে মিথোজীবী কোষগুলির সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেল । তবে, তারা জলে সম্ভবত শুধু ভেসে থাকত ; সাঁতার দেবার ক্ষমতা ছিল না যতদিন পর্যন্ত তাদের গায়ে না এসে লাগলো সুতোর মতো চেহারার ব্যাকটিরিয়া । তার ফলে সৃষ্ট মিশ্র কোষের অন্তর্গত তিন জাতীয় জীবের মধ্যে পরস্পর নির্ভরশীলতার বন্ধন সুদৃঢ় হলো ।

শুধু তাই নয়, সেই ব্যাকটিরিয়ার বেতের মতো শরীরের (flagellum) কিছু অংশ বৃহত্তর কোষের দেহের গভীরে প্রবেশ করার ফলে তা থেকে ক্রমে নিউ-ক্লিয়াসের উদ্ভব হয়েছিল বলে কোনো কোনো পণ্ডিত বিশ্বাস করেন ।

জীবকোষ বিবর্তনের এই ব্যাখ্যাকে অনেক বিজ্ঞানী সম্পূর্ণ মানেন না । তাঁরা বলেন যে, এর সমর্থনে এখনো পর্যন্ত যথেষ্ট প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়নি । তবে, এই ক্রমবিবর্তনে নিউক্লিয়াসের উদ্ভব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিজ্ঞানীরা জীব-কোষকে দুই ভাগে ভাগ করে থাকেন—প্রাক-নিউক্লিয়ার (procaryotic) কোষ এবং নিউক্লিয়াসযুক্ত (eucaryotic) কোষ ।

প্রাক-নিউক্লিয়ার জাতির মধ্যে আছে ব্যাকটিরিয়া ও নীল-সবুজ অ্যাল্‌জি । এই জাতির ক্ষেত্রে বংশগত বৈশিষ্ট্যের ধারক (genetic material) কোষের ভতরের তরল পদার্থে ভেসে বেড়ায় । বংশ বিস্তারের সময় এই উপাদান একে-ভাবে সঠিকভাবে দু'ভাগে বিভক্ত হয় না ।

পূর্ব বর্ণিত মতবাদ অনুসারে তিন রকমের প্রাক-নিউক্লিয়ার কোষের সমন্বয়ে জন্ম নিয়েছে নিউক্লিয়াস যুক্ত কোষ। এদের নিউক্লিয়াস বংশগত বৈশিষ্ট্যের ধারক উপাদানকে ঝিল্লি দিয়ে কোষের বাকি অংশ থেকে আলাদা করে রেখেছে। নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজোমগুলিতে সুনির্দিষ্ট নিয়মে DNA সাজানো থাকে। বংশবিস্তারের সময় প্রত্যেক ক্রোমোজোম দু'ভাগে এমনভাবে বিভাজিত হয় যে, তা থেকে উৎপন্ন কোষগুলি মূল কোষের অনুরূপ আকার নেয়। নিউক্লিয়াস যুক্ত কোষ থেকে হয়েছে উদ্ভিদ ও প্রাণীর সৃষ্টি। উদ্ভিদকোষের গায়ে 'সেলুলোজ'-এর আবরণ আছে বলে তা স্থান পরিবর্তন করতে পারে না। আর প্রাণীকোষের গা স্থিতিস্থাপক (elastic) বলে তারা সাধারণত চলে বেড়াতে পারে।

আমেরিকার 'ন্যাশানাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স'-এর আবিষ্কার এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা এক জাতীয় জীবাণু আবিষ্কার করেছেন যা আজও কোনো কোনো স্থানের অক্সিজেনহীন পরিবেশে বেঁচে আছে। কার্ল উজ (Carl Woese) বলেন যে এই এককোষী জীব প্রাক-নিউক্লিয়ার জাতির হলেও একে অন্যান্য ব্যাকটিরিয়াদের মধ্যে ধরা যায় না; এর অণুর গঠন অন্যান্য ব্যাকটিরিয়াদের থেকে আলাদা। তিনি এর নাম দিয়েছেন 'আদি ব্যাকটিরিয়া' (archaebacteria)। সেজন্যে আজকাল অনেক পণ্ডিত ব্যাকটিরিয়াদের দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করে থাকেন, এক হলো—ইউব্যাকটিরিয়া (যার মধ্যে আছে সাধারণ ব্যাকটিরিয়া), এবং দ্বিতীয় হলো—আর্কিব্যাকটিরিয়া।

আর্কিব্যাকটিরিয়াদের কোষের ঝিল্লি এমন যে, বেশি উত্তাপ বা অ্যাসিড দিলেও তাদের ক্ষতি হয় না। কোনো কোনো অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধেও তাদের ওপরে কাজ হয় না। কিন্তু অনেক আর্কিব্যাকটিরিয়া অক্সিজেন সহ্য করতে পারে না—অক্সিজেনে মরে যায়।

নানা পরিবেশে আর্কিব্যাকটিরিয়া জীবনধারণ করে। কেউ থাকে আবর্জনাময় পঙ্কের মধ্যে। হ্যালোব্যাকটিরিয়া এমন জলে থাকে যেখানে লবণের ভাগ অত্যন্ত বেশি, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউটা প্রদেশের ও মধ্যপ্রাচ্যের বিশাল লবণ-হ্রদের জলে।

আর এক অদ্ভুত অ্যার্কিব্যাকটিরিয়া আছে যাদের জীবনীশক্তি উত্তপ্ত গন্ধক থেকে আহৃত। জার্মানির মিউনিকের ম্যাক্স্ প্ল্যাঙ্ক্ ইন্স্টিটিউটের অধ্যাপক জিলিগ (W. Zillig) ও রিজেন্স্বার্গ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্টেটার (K.O. Stetter) আইসল্যাণ্ডের আগ্নেয়গিরির ফুটন্ত প্রস্রবণে এদের সন্ধান পেয়েছেন। আমরা যেমন অক্সিজেন নিয়ে বেঁচে থাকি, এরা তেমন বেঁচে থাকে গন্ধক গ্রহণে। বেঁচে থাকার জন্যে শরীরের মধ্যে যেসব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন, তাকে চালু রাখার উদ্দেশ্যে এরা হাইড্রোজেন ও গন্ধক থেকে জৈব পদার্থ এবং হাইড্রোজেন সালফাইড তৈরি করে, আর কার্বন-মোনোঅক্সাইড থেকে কার্বন গ্রহণ

করে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এদের অনেকটা গাছের কাণ্ডের মতো দেখায়। বংশবিস্তারের সময় এই কাণ্ডের গা থেকে শাখা বেরিয়ে আসে ও আলাদা হয়ে যায়।

এই আবিষ্কার থেকে অনেকে মনে করেন যে, আদিম পৃথিবীতে আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত গন্ধক-প্রস্রবণের মধ্যে এরকম ব্যাকটিরিয়া বাস করত। অর্থাৎ এরা হলো প্রথম জীবের অন্যতম উত্তরসূরী।[২]

দক্ষিণ আফ্রিকায় আবিষ্কৃত ব্যাকটিরিয়া এবং অ্যাল্‌জির ফসিলের পরবর্তী-কালের জীব সম্পর্কেও প্রমাণ পাওয়া গেছে। সম্ভবত স্তরে স্তরে অ্যাল্‌জির সঙ্গে পলি মিশে পাথরের মতো স্ট্রোমাটোলাইট গড়ে ওঠে। উত্তর আমেরিকার সুপিরিয়র হ্রদ অঞ্চলে শতাধিক মাইল বিস্তৃত Gunflint Chert-এ চেটালো ধরনের স্ট্রোমাটোলাইট (mat) আছে, যা প্রায় ২০০ কোটি বছরের পুরনো। কোনো কোনো স্ট্রোমাটোলাইট দেখতে শঙ্কুর মতো ও দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫০ ফুট। আমাদের দেশেও মধ্যপ্রদেশ এবং কর্নাটকের পাললিক শিলা থেকে অ্যাল্‌জি এবং এককোষী প্রাণীর নিদর্শন পাওয়া গেছে।

নিউক্লিয়াস কোমল বলে ফসিলে সাধারণত তার ছাপ দেখা যায় না। তাই নিউক্লিয়াস যুক্ত জীবকোষের ফসিল আবিষ্কার সহজ নয়। তবে অস্ট্রেলিয়ার Bitter Springs Chert-এ আবিষ্কৃত ও প্রায় ৯০ কোটি বছরের পুরনো কোষদেহের ভেতরে নিউক্লিয়াসের মতো দাগ দেখে মনে হয়, ঐগুলি সম্ভবত নিউক্লিয়াস যুক্ত ছিল।

প্রোটোজোয়াদের মধ্যে নানা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ আজ-কের দিনের অ্যামিবা, ইউগ্লিনা, প্যারামেসিয়াম প্রভৃতি এককোষী প্রাণীদের নাম করা যায়। তবে,আজকের দিনের অ্যামিবা সেযুগের প্রোটোজোয়াদের চেয়ে উন্নত। কোষের খানিকটা অংশকে তারা এগিয়ে দিয়ে চলে এবং ঐ অংশকে উদ্ভিদকোষ ইত্যাদির ওপরে গড়িয়ে দিয়ে তাকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। আবার, ফ্ল্যাজেলেট তার বেতের মতো লেজ দিয়ে চলে বেড়ায়। ফ্ল্যাজেলেটের মধ্যে ইউগ্লিনা জাতীয় জীবকোষে এমন অঙ্গ আছে যা আলোক সচেতন। প্যারামেসিয়াম প্রোটো-জোয়ায় মুখ ও খাদ্য-পরিপাকের অঙ্গ আছে। তারা অসংখ্য শুঁয়ো (cilia) নেড়ে চলে। প্রোটোজোয়ার বংশবিস্তার হয় কোষবিভাজন রীতিতে। বংশ-বিস্তারের সময় প্রোটোজোয়া ডাম্বেলের মতো আকার নেয় এবং সেই ডাম্বেল মাঝখান থেকে ভেঙ্গে গিয়ে সৃষ্টি করে দুটি অনুরূপ জীবকোষ।

প্রোটোজোয়ার জীবনধারণে তার অতি ক্ষুদ্র আকার অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল। তাই, আকার বৃদ্ধির জন্যে এক জাতীয় প্রোটোজোয়াগুলি মিলিত ও পরস্পর নির্ভরশীল হলো। এই মিলন থেকে বহুকোষী প্রাণী বা মেটাজোয়ার উদ্ভব হয়েছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন। তবে, মেটাজোয়ার জন্ম কিভাবে হয়েছিল সে বিষয়ে আজও সম্পূর্ণ জানা যায়নি।

একাধিক নিউক্লিয়াসযুক্ত এবং ছোট ছোট শুঁয়ো ঢাকা বৃহদাকার প্রোটোজোয়া থেকে বহুকোষী প্রাণীর উদ্ভব হয়েছিল বলে কোনো কোনো পণ্ডিতের বিশ্বাস। তাঁরা বলেন, সম্ভবত এরকম কোনো প্রোটোজোয়ার শরীরে এমনভাবে পার্টিশন হয়েছিল যে, তার ফলে কোষের প্রত্যেক ভাগ পেল একটি করে নিউক্লিয়াস। দেহের প্রত্যেক ভাগে এভাবে নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষ তৈরি হওয়ায় সৃষ্ট হলো মেটাজোয়া।

তবে অধিক সংখ্যক পণ্ডিতরা মনে করেন যে, ফ্ল্যাজেলেট জাতীয় জীবকোষগুলির একসঙ্গে মিলে সংঘবদ্ধ হয়ে (colony) বসবাস করা থেকে মেটাজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। কোনো কোনো প্রোটোজোয়া আজও এভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে বাস করে। সংঘে বসবাসকারী জীবকোষগুলিতে কোথাও কোথাও তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ তাদের আলাদা করে দিলেও কোষগুলি বেঁচে থেকে স্বাভাবিক নিয়মে বিভাজিত হয়ে আবার সংঘবদ্ধ হতে পারে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোষগুলির সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী ভাব চলে যায় এবং তারা সংঘের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মে থেকে নিজেদের এত সীমিত করে রাখে যে,এর বাইরে আর বাঁচতে পারে না। যে জীবকোষগুলির মধ্যে কিছুটা কর্মবিভাজন রীতি লক্ষ্য করা যায়, তাদের সংঘের ভেতরে ভল্‌ভক্‌স্ অন্যতম (তবে এরা প্রাণীকোষ না উদ্ভিদকোষ তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়নি)। ভল্‌ভক্‌স্ সাঁতার দিয়ে বেড়ায়; তার রং সবুজ, দেখতে একটু লম্বাটে ও গোলাকার। সংঘের অন্তর্গত কোষগুলি বেতের মতো লেজ দিয়ে সাঁতার কাটে।

ভল্‌ভক্‌সে যুক্ত জীবকোষগুলির লেজ বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকে। এদের মধ্য থেকে কাউকে আলাদা করে দিলে সে সাঁতার দিয়ে বেড়াবে. কিন্তু কিছুক্ষণ পরে মরে যাবে। এর মধ্যে শুধু বিশেষ কতকগুলি কোষ বংশবিস্তার করে। এক কথায়, ভল্‌ভক্‌সের মধ্যে কিছুটা কর্মবিভাজন রীতি লক্ষ্য করা যায় এবং সেখানে কোষগুলি সমগ্র সংঘের জন্যে কাজ করে।

ফ্ল্যাজেলেট যেমন ভল্‌ভক্‌স-রূপ সংঘে থাকে, তেমন আরো কোনো কোনো এককোষী জীব সংঘবদ্ধ হয়ে বাস করে। বিভিন্ন জাতীয় মেটাজোয়া নানা শ্রেণীর সংঘবদ্ধ জীবকোষ থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকতে পারে।

মেটাজোয়ার দেহ ক্রমে ক্রমে জটিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কোষগুলির মধ্যে কর্মবিভাজন আরো স্পষ্ট হতে থাকে। এইভাবে স্নায়ু, মস্তিষ্ক, মাংসপেশী প্রভৃতির কোষ তৈরি হয়েছিল।

আদিম মেটাজোয়াদের মধ্যে স্পঞ্জ অন্যতম। সে চলতে পারে না। সমুদ্রের নিচে মাটিতে আটকে থেকে ব্যাকটিরিয়া প্রভৃতি ভাসমান খাদ্য গ্রহণ করে বলে তাকে suspension feeder বলা হয়। তাদের মূল গঠনে আজও কোনো পরিবর্তন হয়নি। মস্তিষ্ক বা হৃৎপিণ্ড না থাকলেও স্পঞ্জের কোষগুলি সুনির্দিষ্ট

ভাবে ভিন্ন ভিন্ন কর্মে লিপ্ত — কতকগুলি কোষ তার বহির্গাত্রে ত্বকের কাজ করে, কতকগুলি কোষ খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে। তাই, স্পঞ্জকে শুধুমাত্র কোষের সমন্বয় বললে ভুল হবে।

ইংল্যাণ্ড ও দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বালি ও কাদাতে প্রায় ৭০ কোটি বছরের পুরনো জেলি মাছ, কোমল প্রবাল এবং কৃমি বা কেঁচো সদৃশ কীট দেহের ছাপ পাওয়া গেছে। সম্ভবত জেলি মাছকে অন্ত্র (intestine) ও মুখ যুক্ত আদিমতম মেটাজোয়া বলা যায়। দুই স্তরে বিভক্ত টিস্যু দিয়ে তৈরি দেহের মধ্যভাগ পাত্রের মতো বলে প্রবালকে জেলি মাছের সঙ্গে সিলেন্‌টেরেটা পর্বের মধ্যে ফেলা হয়। প্রবালেরও ভেতর দিকের কোষগুলি খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে এবং দেহের এক দিককে ঘিরে থাকে কর্ষিকা।

কৃমিসদৃশ চ্যাপ্টা দেহের কীটের (প্ল্যাটিহেল্‌মিন্‌থেস্‌) স্নায়ুতন্ত্র ও সামনের দিকে মাথা আছে, যা আদিম ধরনের। কোনো কোনো কীট চওড়া ও চ্যাপ্টা পায়ের মতো অঙ্গ দিয়ে জলের একেবারে নিচে চলাফেরা করে।

অ্যানিলিড বা কেঁচোসদৃশ কীট আরো উন্নত। এদের শরীরে এক বিশেষ তরল পদার্থে পূর্ণ গহ্বর বা 'সিলোম' থাকে (প্রায় সব উন্নততর প্রাণীর দেহে সিলোম আছে, স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে এই থলির মধ্যে দেহের যন্ত্রপাতিগুলি থাকে। সিলোম যুক্ত প্রাণীগুলি এক আদিপুরুষ থেকে উদ্ভূত বলে কোনো কোনো পণ্ডিতের বিশ্বাস)। সম্ভবত, কিছু কৃমিবৎ কীটের শরীরে কোনো পরিবর্তনের ফলে এরূপ তরল পদার্থে পূর্ণ গহ্বর সৃষ্ট হয়েছিল। তার ওপরে মাংসপেশীর চাপ দিয়ে শরীরের প্রান্তভাগকে সেই কীট জোরের সঙ্গে ঠেলতে পারত। ফলে, সে সমুদ্রের নিচে নরম কাদায় গর্ত করতে সমর্থ হলো ; সে কাদা থেকে জৈব-রাসায়নিক পদার্থকে খাদ্য রূপে গ্রহণ করত। পলি খায় বলে এদের আর এক নাম দেওয়া হয়েছে deposit feeder বা পলিভুক।

উ ল্লে খ প ঞ্জি

১. When Micro-Organisms Wielded The Sceptre
— *Thc Statesman* (20-6-1980)

২. *Scala* : no 2/1982

৪

ক্যাম্‌ব্রিয়ান কল্প

(৫৭ থেকে ৫০ কোটি বছর আগে)

ক্যামব্রিয়ান কল্পে প্রাণীর বিবর্তন ধারায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় এবং তা হলো কঠিন আবরণ ও কাঠামো যুক্ত প্রাণীর উদ্ভব। ঐ সময় থেকে পুরাজীবীয় অধিকল্পের সূচনা।

কঠিন আবরণ বা কাঠামো যুক্ত প্রাণীর আবির্ভাব ফসিল গঠনে সাহায্য করেছিল। ফসিলে ব্র্যাকিওপডা ও মোলাস্কা (শামুক, ঝিনুক প্রভৃতি) জাতীয় প্রাণীর দেহাবরণ বা অন্যান্য সামুদ্রিক জীবের চুনের কাঠামো ইত্যাদি কঠিন অঙ্গের নিদর্শন পাওয়া যায়। ফসিল তৈরি হতে পারে নানা কারণে বা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায়। শিলীভবন প্রক্রিয়ায় (petrification) ফসিল গঠনের দৃষ্টান্ত অধিক। সমুদ্রের অগভীর স্থানে বা মহীসোপানে নদীর জল বাহিত পলি এসে জমা হয়। অনেক সময় নদীর প্লাবনেও সাগরের নিচে প্রচুর কাদা ও বালি থিতিয়ে পড়ে। তার নিচে চাপা পড়ে যায় হাজার হাজার জলচর জীব। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে যে পর্বত প্রমাণ পলি জমে তা প্রচণ্ড চাপে ধীরে ধীরে প্রস্তরীভূত হয়। তার মধ্য দিয়ে জল চুঁইয়ে ভেতরে গিয়ে প্রাণীদেহের কঠিন অঙ্গকে গলিয়ে দেয় বা দ্রবীভূত করে এবং শরীরের জৈব পদার্থ নষ্ট হয়ে যায়। জলে মিশে থাকা বালি (সিলিকা) বা চুন জাতীয় (ক্যাল্‌সাইট) খনিজ পদার্থগুলি ক্রমে সেই জৈব উপাদানের স্থান গ্রহণ করে। এইভাবে তৈরি হয় জীবদেহের কঠিন অঙ্গের ছাঁচ। আবার, কঠিন আবরণযুক্ত কোনো কোনো প্রাণীর পচনশীল শরীর ও পলি থেকে যে 'পাইরাইট' (আয়রন-সাল্‌ফাইড) উৎপন্ন হয়, তা ঐ দেহকে ক্রমে ফসিলে রূপান্তরিত করে।

প্রাক্‌-ক্যাম্‌ব্রিয়ান মহাকল্পের প্রাণীদের শরীরে শক্ত খোলা বা কাঠামো না থাকায়, স্ট্রোমাটোলাইট ছাড়া ফসিল খুবই কম আবিষ্কৃত হয়েছে। বস্তুত, ক্যাম্‌ব্রিয়ান কল্পের প্রচুর ফসিল পাওয়ার প্রধান কারণ কঠিন অঙ্গ-যুক্ত প্রাণীর আবির্ভাব। ফসিল থাকার জন্যে জীব সম্পর্কে অধিকতর তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

ইংল্যাণ্ড ও দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া থেকে জেলি মাছ, কৃমিবৎ এবং কেঁচোসদৃশ কীট প্রভৃতি জীবদেহের যে ছাপ কাদায় ও বালিতে পাওয়া গেছে তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রাক-ক্যাম্‌ব্রিয়ান মহাকল্পের প্রাণীরা কোমলদেহী হলেও তাদের মুখগহ্বর, স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্ক ছিল, অর্থাৎ তাদের দৈহিক গঠন বেশ জটিল। তাই, ক্যাম্‌ব্রিয়ান

কল্পে প্রায় এক সময়ে কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন জাতির আবির্ভাব হতে বোঝা যায় যে পূর্ববর্তী কালে তাদের আদিপুরুষরা আগে থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল।

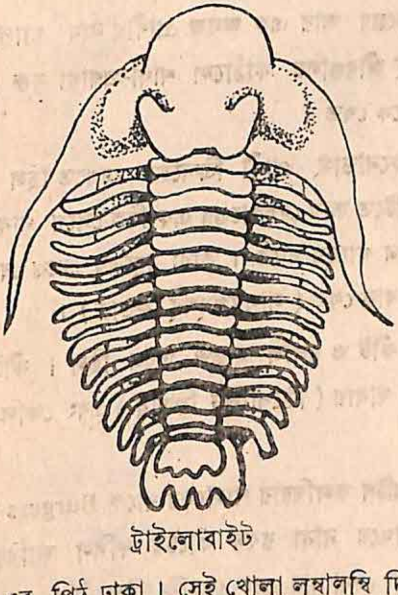
বহির্জগতের বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে গিয়ে প্রাণীদের শরীরে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কাঠামো বা আবরণের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রায় একই সময়ে বিভিন্ন জাতীয় জীবের দেহে বিভিন্ন ধরনের কঠিন অঙ্গ তৈরি হয় এবং তা এদের জীবনধারণে নানাভাবে সাহায্য করে।

সমুদ্রের অগভীর স্থানে ক্যাম্ব্রিয়ান কল্পে কঠিন অঙ্গ যুক্ত প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

কম্বোজ বা মোলাস্কা জাতীয় প্রাণীর শরীরের বাইরে ক্যালসিয়াম-কার্বনেট থেকে তৈরি হয় শক্ত খোলা। ফলে শরীরের ভেতরের যন্ত্রপাতিগুলি কঠিন আবরণের মধ্যে আরো নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে কাজ করতে পারে।

ক্যালসিয়াম কার্বনেট বা ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট দিয়ে ব্র্যাকিওপড প্রাণীর দেহে কঠিন আবরণ গঠিত হলো। আদিম ব্র্যাকিওপড জীব সমুদ্রের স্রোত থেকে খাবার ছেঁকে নিতে পারত এই খোলার মধ্যে (সাস্‌পেন্‌শন্‌ ফিডার)।

প্রাণীজগতে সন্ধিপদ বা আর্থ্রোপড জাতির প্রাধান্য সবচেয়েবেশি। যে আর্থ্রো-পডের ফসিল ক্যাম্ব্রিয়ান কল্পে সর্বাধিক, তার নাম ট্রাইলোবাইট। কাইটিন দিয়ে



ট্রাইলোবাইট

তৈরি শক্ত খোলায় এর পিঠ ঢাকা। সেই খোলা লম্বালম্বি দিকে তিনটি খণ্ডে বিভক্ত বলে এর এই নামকরণ। প্রাণীগুলির মধ্যে বৈচিত্র্য ছিল—কারো বিরাট মাথা, কারো অনেক চোখ। সামনের দিকে ছিল শুঁড়ের মতো অঙ্গ (feeler);

শরীরের প্রত্যেক পাশে অনেকগুলি পা। শ্বাসকার্যের জন্যে ফুলকার (gill) মতো ছিল, যেমন মাছের থাকে। কোনো কোনো ট্রাইলোবাইট ৩ ইঞ্চির থেকেও কম, আবার কোনো কোনোটি প্রায় ১৮ ইঞ্চি লম্বা। কাঁকড়া বা চিংড়ির মতো খোলাযুক্ত এই জীব অন্য প্রাণীর মাংসের বর্জিতাংশ বা জলের নিচে পড়ে থাকা জৈব-রাসায়নিক আবর্জনা ভক্ষণ করে প্রাণধারণ করত (scavenger)। তারা ঘুরে বেড়াত সমুদ্রের নিচে পাঁকে, যার মধ্যে থাকে জৈব-রাসায়নিক পদার্থ সমৃদ্ধ খাদ্য। মাথায় কঠিন আবরণ থাকার জন্যে ট্রাইলোবাইটের পক্ষে তা দিয়ে কাদায় গর্ত করতে সুবিধা হতো, কারণ এরা ছিল ডিপোজিট ফিডার।

কঠিন আবরণ থাকার আর যে গুরুত্ব পরবর্তীকালে বৃদ্ধি পায়, তা হলো আত্মরক্ষা। পরবর্তীকালে নানা রকমের শিকারী প্রাণীর (predator) উদ্ভব হওয়ায় ছোট ছোট জীবের কঠিন আবরণ আত্মরক্ষায় সহায়তা করে।

অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রেও কাঠামো নানাভাবে সাহায্য করেছিল। উদাহরণ স্বরূপ স্পঞ্জের নাম করা যায়। স্পঞ্জের শরীরের কিছু কোষ ছোট ছোট ছুঁচের মতো সিলিকা বা ক্যাল্‌সাইট-এর সঙ্গে মিলে তৈরি করলো একটা শক্ত কাঠামো (যেমন, উন্নততর প্রাণীদের থাকে কঙ্কাল)। ঐ কাঠামোর সহায়তায় স্পঞ্জের দেহ আরো দৃঢ় ও বর্ধিত হলো।

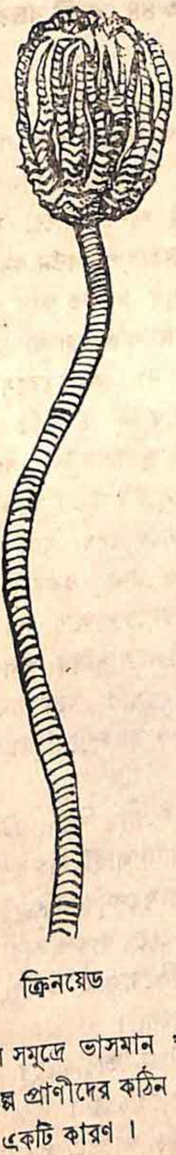
ক্যামব্রিয়ান কল্পের আর এক জলজ প্রাণীর নাম গ্র্যাপ্‌টোলাইট। হাইড্রার মতো দেখতে এই জীবগুলির কাঠামো শাখা-প্রশাখা যুক্ত। সম্ভবত তারা জল থেকে খাবার ছেঁকে খেত।

আবার, একিনোডার্ম্‌ প্রাণী ক্রিনয়েড দেখতে ছিল চারাগাছের মতো। সমুদ্রের নিচে মাটিতে তার দেহকাণ্ডের এক দিক লেগে থাকত, তবে তার কোনো মূল ছিল না, যেমন গাছের থাকে। তারা সমুদ্রের মেঝে থেকে একটু ওপর দিয়ে ভেসে যাওয়া খাবার খেত (সাস্‌পেন্‌শন্‌ ফিডার)।

কোমলদেহী কীট ও জেলি মাছও তখন ছিল। কীট খায় সমুদ্রের নিচে পাঁকে পড়ে-থাকা খাবার (ডিপোজিট ফিডার) এবং জেলি মাছ খায় জলে ভেসে থাকা খাবার।

ক্যানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়ার পাহাড়ের থাকে Burgess Shale নামে পরিচিত স্থানের 'শেল্‌' পাথরে নানা রকম কীটের ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে। ফসিলে তাদের শুঁড় ও পা দেখা যায় এবং এমনকি বিজ্ঞানীরা তাদের অন্ত্র ও কণ্ঠনালী সদৃশ অঙ্গও নিরীক্ষণ করতে পেরেছেন। সেখানে অধিকাংশ প্রাণী ছিল ডিপোজিট-ফিডার।

যদিও ক্যাম্‌ব্রিয়ান কল্পে ডিপোজিট-ফিডারের সংখ্যাধিক্য ছিল, তবেব্র্যাকিও-পড, স্পঞ্জ, ক্রিনয়েড, প্রভৃতি প্রাণী ছিল সাসপেন্‌শন-ফিডার। তাই মনে হয়, ক্যাম্‌ব্রিয়ান কল্পে বিশাল স্থলভাগ ক্রমে ক্রমে ভাঙ্গতে আরম্ভ করায় আবহাওয়া



ক্রিনয়েড

আরো সহনশীল হলো বলে সমুদ্রে ভাসমান খাদ্য আগের থেকে কিছুটা সুলভ হয়েছিল। ক্যাম্‌ব্রিয়ান কল্পে প্রাণীদের কঠিন অঙ্গ বা আবরণ গড়ে ওঠার পিছনে জলবায়ুর পরিবর্তন সম্ভবত একটি কারণ।

৫

অর্ডোভিশিয়ান কল্প

(৫০ থেকে ৪৩/৪৪ কোটি বছর আগে)

যে বিশাল স্থলভাগ ক্যাম্ব্রিয়ান কল্পে ভাঙতে থাকে তা অর্ডোভিশিয়ান কল্পে সম্ভবত আরো ছোট ছোট ভূখণ্ডে বিভক্ত হয়ে পরস্পর থেকে দূরে সরে যায়। মহাদেশগুলির উপকূলে বড় বড় নিম্নভূমিতে সাগর জল এসে অগভীর সমুদ্রের সৃষ্টি করে। এর ফলে জলবায়ু হলো আরো সামুদ্রিক ভাবাপন্ন। সামুদ্রিক জলবায়ুতে ঋতুর প্রভাব এবং উষ্ণতার পরিবর্তন কম।

স্থলভাগের যে স্থানগুলিকে সমুদ্র প্লাবিত করে সেখানে জলের নিচে নানা-রকম শৈবাল ও গুল্ম জন্ম নেয়। অ্যাল্‌জির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এককোষী উদ্ভিদ-কে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না। জলে ভেসে থাকা কোটি কোটি সংখ্যক উদ্ভিদ-কোষকে বলে 'ফাইটোপ্ল্যাঙ্ক্‌টন্'। অতি ক্ষুদ্র এই 'মাইক্রোপ্ল্যাঙ্কটন'-এর মধ্যে আর এক জাতি হলো 'জুওপ্ল্যাঙ্কটন'—যার মধ্যে আছে প্রোটোজোয়া এবং জেলিমাছ, তারামাছ, ও ক্রাস্‌টেসিয়ান (কাঁকড়া প্রভৃতি) জাতীয় প্রাণীর লার্ভা। যে প্ল্যাঙ্ক্‌টনকে খালি চোখে দেখা যায় তার নাম 'ম্যাক্রোপ্ল্যাঙ্ক্‌টন' এবং তার মধ্যে প্রধানত থাকে নানা রকম ছোট ছোট ক্রাস্‌টেসিয়ান। জুওপ্ল্যাঙ্ক্‌টন খায় ফাইটোপ্ল্যাঙ্ক্‌টনকে, আর সব রকম ভাসমান প্ল্যাঙ্ক্‌টন হলো সামুদ্রিক প্রাণীদের খাদ্য। সামুদ্রিক জলবায়ু সহনশীল বলে জলজ প্রাণীদের খাদ্য প্ল্যাঙ্ক্‌টনের সরবরাহ সারা বছর সমান থাকে। সম্ভবত এজন্যে ভাসমান প্ল্যাঙ্ক্‌টনের খাদক সংখ্যা ও তাদের বৈচিত্র্য অর্ডোভিশিয়ান কল্পে আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল।

নতুন পরিবেশে ট্রাইলোবাইট ইত্যাদি ডিপোজিট-ফিডার তত সুবিধা করতে পারলো না, যতটা পেরেছিল গ্র্যাপ্‌টোলাইট, দুই খোলা যুক্ত (ঝিনুক) মোলাস্ক ব্র্যাকিওপড, ক্রিনয়েড ইত্যাদি সাস্‌পেন্‌শন্-ফিডার প্রাণী। যে গ্র্যাপ্‌টোলাইট আগে সমুদ্রের নিচে গাছের মতো লেগে থাকত,তারা জল ছেঁকে খাদ্য গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে ভেসে উঠলো। আর, একিনোডার্ম্‌ জাতীয় জীবের কঠিন অঙ্গ সৃষ্টি হওয়ায় তার দেহকাণ্ড দৃঢ় ও দীর্ঘ হলো।

অর্ডোভিশিয়ান কল্পের প্রথম দিকে তারামাছের আবির্ভাব। সমুদ্রে শামুক প্রভৃতি মোলাস্ক্‌ প্রাণীর মধ্যে আসে বৈচিত্র্য।

প্রথমদিকে তারামাছ এবং মোলাস্কা জাতির সেফালোপডের (অকটোপাস বা

কাট্‌ল-মাছ সদৃশ জীব) খাদ্য ছিল মৃত বা জীবিত প্রাণী। কিছুকাল পরে তাদের মধ্যে কেউ কেউ পুরোপুরি শিকার করে জীবনধারণ শুরু করলো। প্ল্যাঙ্ক্‌টন-ভক্ষক কোনো কোনো জীব সমুদ্রের ওপরে ভাসমান খাদ্য গ্রহণ করায় তাদের খুঁজে পাওয়া সহজ হয় বলে, সেফালোপড ও তারা মাছের মধ্যে আসে নতুন বিবর্তন। সেফালোপডের মধ্যে নটিলাস-সদৃশ জীবদেহে তৈরি হলো একরকম খোলা, যা কয়েকটি খোপে বিভক্ত। বর্তমান যুগে নটিলাসের এরকম খোলা থাকায়, সে আপন প্রয়োজন অনুসারে জলের মধ্যে বিভিন্ন গভীরতায় ভারসাম্য রাখতে পারে। সন্তরণের সুবিধার জন্যে সেফালোপডের শরীরে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিবর্তন হয়েছিল। এইভাবে হয় শিকারী প্রাণীদের অগ্রগতি।

নটিলাস সদৃশ প্রাণীদের কঠিন আবরণ ছিল লম্বাটে ও শঙ্কুর মতো। তার এক প্রান্তে মাথার সামনে অনেকগুলি কর্ষিকা। তাদের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ১৫-১৬ ফুট॥



নটিলয়েড

কিন্তু অর্ডোভিশিয়ান কল্পে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মেরুদণ্ডী প্রাণীর অগ্রদূতের আবির্ভাব। অমেরুদণ্ডী থেকে হয় এই কর্ডাটা জাতির বিবর্তন। খুব সম্ভবত মেরুদণ্ডীদের উদ্ভব হয়েছিল নোটোকর্ড যুক্ত এবং অস্থিবিহীন কোনো কর্ডাটা প্রাণী থেকে।

ফসিলে এমন কোনো জীবের নিদর্শন এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, যাকে মেরু-দণ্ডীদের আদিপুরুষ বলে সঠিক ভাবে সনাক্ত করা যায়। মনে হয়, তাদের আদিপুরুষ ছিল কোনো কোমলদেহী প্রাণী। জলের নিচে গর্ত করে থাকে এরকম কোনো

কোনো কীট আছে যাদের আদিম কর্ডাটা (Hemichordate) বলে, যেমন বালানোগ্লোসাস্। আপাতদৃষ্টিতে এদের অমেরুদণ্ডী বলে মনে হয় ; কিন্তু এদের শরীরে আছে নোটোকর্ড, পৃষ্ঠীয় স্নায়ুতন্ত্রী (dorsal nerve cord) এবং কানকো (gill slit) । শরীরের সামনে শুঁড় থাকে যা দিয়ে এরা মাটিতে গর্ত করে। কীটগুলির সমুদ্রে ভাসমান লার্ভাকে দেখতে অনেকটা একিনোডার্ম প্রাণীর লার্ভার মতো বলে কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন যে, তারা সাধারণ আদিপুরুষ থেকে উদ্ভূত। আমাদের সেই কোমলদেহী আদিপুরুষ ক্ষুদ্র রূপে তখন হয়তো সমুদ্রগর্ভে ছিল । তাই সমুদ্র দেখে বিশ্বকবি বলেছেন :

"...মনে হয়, অন্তরের মাঝখানে
নাড়ীতে যে রক্ত বহে সেও যেন ওই ভাষা জানে
আর কিছু শোখে নাই । মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবনভ্রূণ মাঝে, লক্ষকোটি বর্ষ ধরে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে।..."

অস্থিবিহীন নোটোকর্ড যুক্ত প্রাণীদের মধ্যে সমুদ্র-স্কোয়ার্ট এবং অ্যামফিওক্সাস আজও জীবিত। সমুদ্র-স্কোয়ার্টের লার্ভার যদিও নোটোকর্ড আছে, কিন্তু বড় বয়সে তার নোটোকর্ড থাকে না এবং তাকে দেখতে স্পঞ্জের মতো হয়ে যায়। অ্যামফিওক্সাস প্রায় ২ ইঞ্চি লম্বা এবং তার নোটোকর্ড, পৃষ্ঠীয় স্নায়ুতন্ত্রী ও ফুলকা আছে। কিন্তু সেও অস্থিবিহীন এবং মুখে চোয়াল ও দেহে পাখনা নেই। জলের নিচে মাটিতে গর্ত করার সময় নোটোকর্ড শক্ত হয়ে ওঠে । তারা শিকার করতে পারে না ; অধিকাংশ সময়ে বালি ও কাদার গর্তে থেকে শরীরের সামনের দিক বের করে জল থেকে খাবার ছেঁকে খায়।

প্রাণীদেহে নোটোকর্ড থাকায় অনেক সুবিধা হলো । নোটোকর্ড শিথিল করলে শরীর নমনীয় হয়, আর তাকে সংকুচিত করলে হয় কঠিন ও দৃঢ়। বস্তুত এই নোটোকর্ড ঋজু দণ্ডের মতো বলে তার অবলম্বনে পেশীগুলি প্রসারিত ও সংকুচিত হতে পারে। এরূপ অঙ্গ থাকার জন্যে দেহকে পর্যায়ক্রমে কঠিন ও নমনীয় করা যায় বলে মনে হয় যে, আদিম কর্ডাটা জাতীয় প্রাণীর সন্তরণে সুবিধা হয়েছিল।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের কাঠামো শরীরের মধ্যে থাকায় আরো সুবিধা হয়। এই প্রসঙ্গে পতঙ্গ বা চিংড়ি, কাঁকড়া প্রভৃতির সঙ্গে কর্ডাটাদের তুলনা করা যেতে পারে। সন্ধিপদ প্রাণীদের গা আবরণে ঢাকা থাকার একটা অসুবিধা এই যে, খোলা না পালটে তাদের শরীর বড় হতে পারে না। তাছাড়া, খোলা

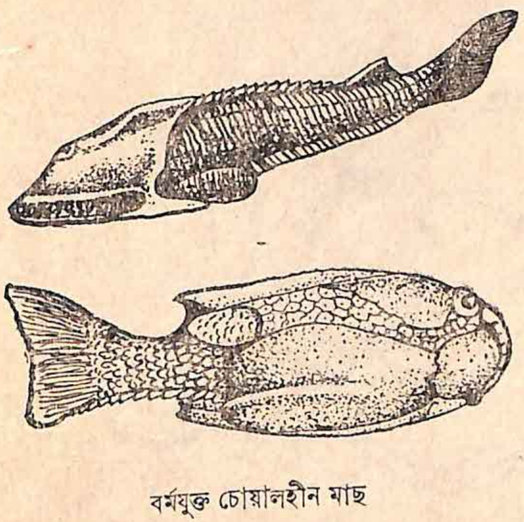
পাল্‌টাবার সময়ে তাদের খুব সাবধানে থাকতে হয়, কারণ তখন তাদের আত্মরক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই, নতুন খোলা শক্ত না হওয়া পর্যন্ত গলদা চিংড়ি পাথরে বা সমুদ্র-গুল্মের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। বারবার খোলা পাল্‌টানো এড়াবার জন্যে সন্ধিপদ প্রাণীদের আকার ছোট রাখতে হয়। অপরপক্ষে, মেরুদণ্ডীদের এই অসুবিধা ভোগ করতে হয় না, এবং তার দেহাভ্যন্তরস্থ কাঠামো বর্ধিত হয় শরীরের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সমতা রেখে।

যে আদিম মাছের উদ্ভব অর্ডোভিশিয়ান কল্পে হয়েছিল, তাদের দেহের ভেতরের কোনো অস্থি কিন্তু আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। মাছগুলির গা শক্ত খোলায় ঢাকা এবং ঐ আবরণ ছিল ফস্‌ফেট দিয়ে তৈরি। এদের নাম অস্ট্রাকোডার্ম।

আদিম মাছগুলির চোয়াল ছিল না। মুখের সামনের দিকে একটু ফাঁক দিয়ে তারা খাবার খেত। ছোট ছোট এমন সব জিনিস তাদের খাদ্য ছিল যা পরিপাকের জন্যে চিবিয়ে খাওয়ার দরকার হতো না। তারা জলের নিচে পাঁক থেকে খাবার চুষে খেত।

ছোট আকারের এই মাছগুলির মাথায় হাড়ের টুকরো দিয়ে তৈরি আবরণ ছিল। ভারি বর্ম থাকায় তারা জোরে সাঁতার দিতে পারত বলে মনে হয় না। বর্ম কঠিন বলে এরা সম্ভবত লেজের পাখনা দিয়ে সাঁতার দিত সমুদ্রের একেবারে নিচে মাটির কাছাকাছি।

কয়েক প্রকার চোয়ালহীন মাছের উদ্ভব হয় অর্ডোভিশিয়ান থেকে সিলুরিয়ান



বর্মযুক্ত চোয়ালহীন মাছ

কল্পের মধ্যে। কোনো কোনো মাছের মুখের চারপাশে শক্ত খোলা থাকায় তারা সম্ভবত তাকে সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে খুন্তির মতো করে সমুদ্রের মেঝে থেকে

খাবার তুলে নিতে পারত। সিলুরিয়ান থেকে ডেভোনিয়ান কল্পের প্রথম দিক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে চোয়ালহীন মাছগুলির শরীরে বৈচিত্র্য আসে—কারো মাথার বর্ম এমন যে তা জলে ভেসে যেতে সাহায্য করে, কারো শরীর সন্তরণে সহায়ক ; কোনো মাছের নলের মতো মুখ পলি চুষে খেতে পারে, আবার কেউবা জলে ভাসমান খাবার চামচের মতো তুলে নেয়।

আদিম মাছগুলির যে ফসিল পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে আইনিকটোজুন অন্যতম। মাছটির মাথা ছিল শরীরের সঙ্গে এক এবং মেরুদণ্ড আদিম ধরনের। সেফালাস্পিস মাছের মাথায় চেটালো বর্ম এবং গায়ে আঁশের মতো জিনিস ছিল। টর্পেডোর মতো জেময়টিয়াস মাছের শরীরে ধার দিয়ে ছিল পাখনার মত ভাঁজ।

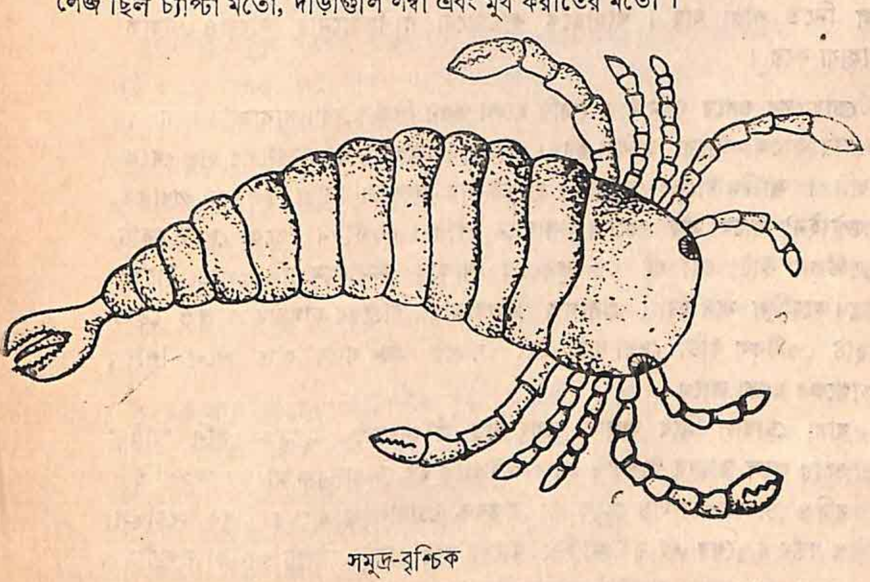
৬
সিলুরিয়ান কল্প
(৪৩/৪৪ থেকে ৩৯.৫ কোটি বছর আগে)

অনেক পণ্ডিতের মতে, পৃথিবীতে প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছিল সমুদ্রে। কোটি কোটি বছর ধরে সমুদ্রই ছিল প্রাণীর একমাত্র আবাস। সিলুরিয়ান কল্পেও সব প্রাণী সমুদ্রবাসী ছিল।

সমুদ্রে ট্রাইলোবাইট ও নটিলাস-সদৃশ জীবের সংখ্যা হ্রাস পায়। নটিলাস জাতীয় কোনো কোনো কম্বোজ বা মোলাস্কার আবরণ বর্তুলাকার (spiral) ও কুঞ্চিত।

সিলুরিয়ান কল্পের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা 'রাজা-কাঁকড়া'র (king crab) আবির্ভাব। আজও সমুদ্রে এই সন্ধিপদ জীবের বংশধরের দেখা পাওয়া যায়।

সবচেয়ে ভয়ংকর যে শিকারী প্রাণীর আবির্ভাব সিলুরিয়ান কল্পে হয়, তার নাম সমুদ্র-বৃশ্চিক। তাকে দেখতে অনেকটা এখনকার কাঁকড়াবিছের মতো বলে কেউ কেউ মনে করেন যে, তারা কাঁকড়াবিছের পূর্বপুরুষ ছিল। দুই-তিন ইঞ্চি থেকে ৬ ফুট পর্যন্ত নানা আকারের সমুদ্র-বৃশ্চিক তখন দেখা যেত। সমুদ্র-বৃশ্চিকের লেজ ছিল চ্যাপ্টা মতো, দাঁড়াগুলি লম্বা এবং মুখ করাতের মতো।



সমুদ্র-বৃশ্চিক

কিন্তু সমুদ্র-বৃশ্চিকের মতো শক্তিশালী শিকারী প্রাণী থাকা সত্ত্বেও চোয়ালহীন মাছ লোপ পেল না। তার প্রথম কারণ এই যে, মাছের মেরুদণ্ড থাকায় সে ছিল

সমুদ্র-বৃশ্চিকের চেয়ে দ্রুতগামী। দ্বিতীয়ত—মেরুদণ্ডী মাছ তখন বিবর্তনের ধারায় এগিয়ে যাচ্ছে বলে তার দৈহিক গঠন ক্রমে আরো উন্নত হতে থাকে। শুধু তাই নয়, কোনো কোনো চোয়ালহীন মাছ সুপ্রাচীন যুগেও যে স্বাদু জলে বাস করত, তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

যখন সিলুরিয়ান কল্পের শেষ ভাগে অস্ট্রাকোডার্মের মধ্যে নানা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে, সেই সময় জন্ম নিল চোয়ালযুক্ত মাছ, যার আবির্ভাব চোয়ালহীন মাছের সামনে বাধার সৃষ্টি করলো বলে তাদের অগ্রগতি ব্যাহত হলো।

চোয়ালের উদ্ভব এক আশ্চর্য ঘটনা। যে ফুলকা দিয়ে আদিম মাছগুলি শ্বাসকার্য চালাত, তার সঙ্গে ছোট ছোট হাড় যুক্ত ছিল। ইংরেজি V-অক্ষরকে যদি পাশের দিক করে ঘুরিয়ে সাজানো যায় তাহলে যেমন দেখাবে, সে রকম দেখতে ছিল ফুলকার হাড়গুলি (gill arch)। মাছের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামনের দু'জোড়া ফুলকার হাড় আপাতদৃষ্টিতে লোপ পেল; সম্ভবত তৃতীয় জোড়া হাড় বড় হলো এবং V-এর সূক্ষ্মাগ্র অংশে কবজার মতো (hinge) অংশ তৈরি করলো। এইভাবে হয় চোয়ালের উদ্ভব। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন, এক সময়ে পাম্পের প্রক্রিয়ায় ফুলকার মধ্যে জলপ্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে ফুলকার হাড় জোড়া বেঁকে গিয়েছিল এবং ক্রমে ক্রমে তা চোয়ালের আকার নিল।

শ্বাসকার্যে ও খাদ্যগ্রহণে অনেক সুবিধা হলো চোয়ালের জন্যে। চোয়াল থাকায় বড় হাঁ করে মুখের মধ্যে বেশি খাবার এবং ফুলকার শ্বাসকার্যের জন্যে বেশি জল নিতে পারা যায়। খাবারকে কামড়ানো বা চিবানোর কাজেও চোয়াল সাহায্য করে।

চোয়ালের ওপরে যখন দাঁত তৈরি হলো তখন শিকার ধরা, খাবার চিবানো বা পেশার কাজে আরো সুবিধা হয়। দাঁতের উদ্ভব কিন্তু চোয়ালের হাড় থেকে হয়নি। আদিম মাছের চোয়ালের হাড়ের ধার দিয়ে যে চামড়া ছিল, তা প্রধানত 'ডেন্টাইন' নামে এক ধরনের উপাদানে তৈরি। ডেন্টাইন থেকে ছোট ছোট 'ডেন্টিক্‌ল' কাঁটা এবং এই ডেন্টিক্‌ল-এর আকার কালক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁতের উদ্ভব হয়েছিল মনে হয়। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, হাঙরের চামড়ায় আজও ছোট ছোট ডেন্টিক্‌ল কাঁটা দেখা যায় এবং সেজন্যে এর গায়ে হাত দিলে শিরিষ কাগজের মতো লাগে।

যারা চোয়াল নিয়ে জন্মাল, সেই মাছ জীবনধারণে অনেক বেশি সুবিধা পাওয়ার ফলে তাদের বংশবৃদ্ধি হয়। এইভাবে হয় চোয়ালযুক্ত মাছের অগ্রগতি।

যদিও চোয়ালহীন মাছ থেকে খুব সম্ভবত চোয়ালযুক্ত মাছের উদ্ভব হয়েছিল, কিন্তু বর্তমান যুগের এই দুই জাতীয় মাছের মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য লক্ষণীয়। এখন যে অল্প কয়েক জাতীয় চোয়ালহীন মাছ আছে তাদের ফুলকা মুখগহ্বরের মধ্যে থাকে, অর্থাৎ এর অবস্থিতি ফুলকার বাঁকানো হাড়ের ভেতর দিকে। কিন্তু

এখনকার সব চোয়ালযুক্ত মাছের ফুলকা আছে এই বাঁকানো হাড়ের বাইরের দিকে। তাই মনে হয়, আদিম যুগের চোয়ালহীন মাছের মধ্যে কারো ফুলকা ছিল বাঁকানো হাড়ের ভেতর দিকে, কারো বা ছিল বাইরের দিকে; এবং এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মাছের ফুলকার বাঁকানো হাড় শ্বাসকার্যে বাধা না দিয়ে ক্রমে চোয়ালে রূপান্তরিত হয়েছিল।

চোয়াল ও দাঁত তৈরি হওয়ায় মাছগুলির আর জলের নিচে পড়ে থাকা খাবার খাওয়ার প্রয়োজন রইল না,—তারা শিকার করে খেতে আরম্ভ করলো। শিকার ধরতে হলে দ্রুত সাঁতার দিতে হয়। ধীরে ধীরে তাদের শরীর টর্পেডোর মতো হয়ে উঠলো এবং ফলে তারা আরো দ্রুতগামী হলো।

আদিম কর্ডাটা প্রাণীদের নোটোকর্ডে অস্থিখণ্ডগুলি (vertebrae) সন্ধির আকারে যুক্ত হওয়ায় তাকে মজবুত করে তোলে। এর ফলে সন্তরণে যে কত সুবিধা হলো তা মাছেদের দেখলে বোঝা যায়। মাছের শরীরে দু'ধারের পেশীগুলি সন্তরণে সহায়ক। পেশীগুলিকে যখন সে পর্যায়ক্রমে সংকুচিত করে তখন তার দেহ তরঙ্গায়িত হতে থাকে, এবং এখানে মেরুদণ্ডের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অস্থিযুক্ত কঠিন মেরুদণ্ডে চাপ দিয়ে পেশীগুলি মাছের শরীরকে তরঙ্গায়িত করতে পারে। আর এই সঙ্গে লেজের পাখনার আন্দোলনে যে স্রোতের সৃষ্টি হয়, তা মাছের দেহ-তরঙ্গের সহায়তায় তাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সন্তরণের সময় ভারসাম্য রাখা, গতি নিয়ন্ত্রণ, দিক পরিবর্তন ইত্যাদি কাজে পিঠ, পায়ু, বুক, পেট ও শ্রোণীর (pelvis) পাখনাগুলি সহায়তা করে।

যে চোয়ালযুক্ত মাছের উদ্ভব সিলুরিয়ান কল্পের শেষ দিকে হয়েছিল তাদের দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—অ্যাকান্থোডিয়ান ও প্ল্যাকোডার্ম। প্রথম শ্রেণীর মাছগুলির শরীর হালকা ও ছোট এবং আঁশে ঢাকা। তাদের মুখে ছোট ছোট দাঁত আছে। চোয়ালহীন মাছের থেকে তারা দ্রুতগামী। পাখনাগুলি কণ্টকযুক্ত থাকায় মনে হয়, সন্তরণের সময় ভারসাম্য রাখা ও দিক পরিবর্তনের জন্যে তা ব্যবহার করা হতো। সিলুরিয়ান কল্পের শেষভাগে ও ডেভোনিয়ান কল্পের প্রথম দিকে এই জাতীয় মাছগুলি শুধু সমুদ্রে নয়, স্বাদু জলেও বাস করত। কালক্রমে আরো উন্নত শ্রেণীর মাছের আবির্ভাব হওয়ায় অ্যাকান্থোডিয়ানরা ধীরে ধীরে লোপ পেল।

প্ল্যাকোডার্ম মাছের আবির্ভাব হয় অ্যাকান্থোডিয়ানদের কিছুকাল পরে। প্রথমে এরা স্বাদু জলে বাস করত; তারপর ডেভোনিয়ান কল্পে অনেকে সমুদ্রে চলে গেল। এই মাছগুলির মাথা ও শরীর বর্ম দিয়ে ঢাকা। মাথা ও শরীরের বর্ম পরস্পরের সঙ্গে কবজার মতো যুক্ত। আবার, এই প্ল্যাকোডার্ম মাছগুলি দুই জাতিতে বিভক্ত—আর্থ্রোডায়ার এবং অ্যান্টিয়ার্ক। কোনো কোনো আর্থ্রোডায়ার মাছ ছিল প্রায় ৩০ ফুট লম্বা ও মাথা প্রায় ৬ ফুট। ডেভোনিয়ান কল্পেও এই

ভয়ংকর শিকারী মাছগুলির দেখা পাওয়া যেত। তাদের মুখে ধারালো দাঁত আছে। একই সঙ্গে ওপরের চোয়াল উঠিয়ে ও নিচের চোয়াল নামিয়ে তারা বিরাট হাঁ করতে পারত ; শরীরের বর্মের সঙ্গে যেখানে মাথার সন্ধি ছিল, সেই জায়গা থেকে করোটি এবং ওপরের চোয়াল ওঠানো হতো । শরীরের বেশি পিছনে বর্ম না থাকায় দ্রুত সন্তরণের অসুবিধা হতো বলে মনে হয় না ।

অ্যান্টিয়ার্ক মাছের বর্ম শরীরের আরো পিছন পর্যন্ত আবৃত করেছিল । আর্থ্রোডায়ারদের শরীরের গড়ন যেমন দ্রুত সন্তরণের উপযোগী ছিল, এদের শরীর কিন্তু সে রকম নয়—আন্টিয়ার্কের শরীর চ্যাপ্টা মতো । বর্ম দিয়ে আবৃত মাথার ওপরে ছোট ছোট চোখ ছিল বলে মনে হয়, তারা সমুদ্রের একেবারে তলায় মাটির কাছাকাছি থাকত। মাছগুলির ছোট মুখের চোয়াল মজবুত ছিল না । তবে, অ্যান্টিয়ার্ক মাছের একটা বড় বিশেষত্ব তার পাখনা । সুক্ষ্মাগ্র পাখনাগুলি মজবুত ও সন্ধিযুক্ত বলে কতকটা পায়ের মতো ছিল ; মনে হয়, এই পাখনা দিয়ে তারা জলের নিচে মেঝেতে 'হামাগুড়ি' দিয়ে চলত। অ্যান্টিয়ার্ক মাছের আর একটা বৈশিষ্ট্য হলো ফুসফুস । ফুসফুস থাকায় তারা বাতাসে শ্বাসের কাজ চালাতে পারত ।

স্থলভাগে প্রথম প্রাণের জন্ম সিলুরিয়ান কল্পের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং তা হলো উদ্ভিদের আবির্ভাব । সিলুরিয়ান কল্পে ভূত্বকে বিরাট আলোড়নের ফলে অনেক জায়গায় সমুদ্রের নিচের মাটি উঠে আসে জলের ওপরে । নতুন পরিবেশে জলজ উদ্ভিদের শরীরে রূপান্তর ঘটে । এইভাবে জন্ম নেয় স্থলবাসী উদ্ভিদ । উদ্ভিদগুলি মস বা শৈবাল জাতীয় । তাদের পাতা বা শিকড় ছিল না এবং লম্বায় ৮ ইঞ্চির চেয়ে বেশি নয় । ফার্ন জাতীয় গাছের জন্ম হয় পরে ।

৭

ডেভোনিয়ান কল্প

(৩৯.৫ থেকে ৩৪.৫ কোটি বছর আগে)

ভূত্বকে প্রচণ্ড আলোড়ন হতে থাকে সিলুরিয়ান থেকে ডেভোনিয়ান কল্পান্তরে। সাগরের জল বহুবার এগিয়ে আসে আর পিছিয়ে যায়। সমুদ্র পিছিয়ে গেলে সেখান থেকে যে স্থলভাগ মাথা তোলে, তা উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহ হতে উৎপন্ন জৈব-রাসায়নিক পলি বা কাদায় সমৃদ্ধ। এই পলি উদ্ভিদের বিস্তারে খুব সহায়তা করেছিল। আর, স্থলজ উদ্ভিদের মৃত্যু হলে তাদের পচনশীল শরীর ঐ পলির সঙ্গে মিশলো ও তার ফলে তৈরি হলো প্রথম মৃত্তিকা (humic soil)।

জল, খনিজ এবং জৈব-রাসায়নিক পদার্থকে ধরে রাখতে পারে বলে গাছের জীবনধারণে মাটির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ডাঙায় বেঁচে থাকতে গেলে মাটি ছাড়া আর কোথাও খাবার পাওয়া যায় না বলে, ক্রমে গাছের শিকড় গড়ে ওঠে। তারা প্রথমদিকে জলের ধার ছাড়া আর কোথাও থাকতে পারত না। ক্রমে ক্রমে তারা সেখান থেকে ডাঙার আরো ভেতরে বিস্তৃত হয়।

আদিম যুগের গাছের কিন্তু বীজ ছিল না। তাই তাদের বংশবিস্তার হতো রেণুর (spore) সাহায্যে, যেমন ফার্ন গাছে দেখা যায়। হাওয়ায় ভেসে রেণু অন্য জায়গায় গিয়ে পড়ে। আর্দ্র মাটিতে রেণু ভেঙ্গে ফলার মতো একরকম 'চারা' বের হয়, যার নাম গ্যামেটোফাইট। গ্যামেটোফাইট থেকে তৈরি হয় পুং ও স্ত্রী কোষ ; এই দুই-এর মিলনে জন্ম নেয় নতুন গাছ। এই প্রক্রিয়ায় বংশ বিস্তারের জন্যে আর্দ্র পরিবেশ ও জল থাকা দরকার। সেই যুগে জলবায়ু আর্দ্র বলে উদ্ভিদের বংশ বিস্তারে তা সাহায্য করেছিল।

সমুদ্র যদিও জৈব-রাসায়নিক পদার্থে খুব সমৃদ্ধ, কিন্তু স্থলভাগে জীবনধারণ করতে গিয়ে উদ্ভিদের সুবিধাই হলো। উদ্ভিদ তার খাদ্য ফোটোসিন্থেসিস প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করে যে সূর্যালোক থেকে সেই অতিবেগনি রশ্মির বিকিরণ জলের চেয়ে স্থলে অনেক তীব্র। ডেভোনিয়ান কল্পের প্রথম দিকে যে ছোট ছোট গাছের জন্ম হয়, তাদের পাতা না থাকায় সূর্যরশ্মি থেকে নিজেদের খাবার তৈরি করার কাজে তেমন অগ্রসর ছিল না। সে যুগের গাছগুলি ছিল ফার্ন আর 'ঘোড়া-লেজা'র (horse tail) পূর্বসূরী। গাছগুলিতে পরের দিকে পাতার বিকাশ হলে তারা সূর্যের আলো শুষে নেবার জন্যে আরো বেশি জায়গা পায়। শুধু তাই নয়, বেশি আলো পাওয়ার আকাংক্ষায় গাছগুলি ক্রমে আরো বড় হয়, আর

ওপর দিকে মাথা তুলতে থাকে । বড় গাছকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে বেশি জল ও খাবার এবং তার সরবরাহ শরীরের সব জায়গায় ঠিকমতো হওয়া দরকার । তাই. তার শিকড় ও নালি আরো উন্নত হলো ।

গাছের বংশবিস্তার প্রণালীতে ধীরে ধীরে আসে পরিবর্তন । ডেভোনিয়ান কল্পের একেবারে শেষ দিকে কোনো কোনো গাছ নিজের রেণুকে রাখলো বিশেষ এক ধরনের আধারে । পরবর্তীকালে এরকম আধার হলো বীজের অঙ্গ ।

সেই যুগে ইউরামেরিকা ইত্যাদি বিশাল স্থলভাগের বিষুবরেখা অঞ্চলের জলবায়ুতে ঋতুর পরিবর্তন ছিল কম এবং তা আর্দ্র ও উষ্ণ । বন তখন ডেভো-নিয়ান কল্পে চিরসবুজ ; ফুল ছিল না বলে গাছগুলিতে সবুজ ছাড়া আর কোনো রং নেই । গাছেদের আকারে তখন নানা বৈচিত্র্য—কোথাও তা মাটির ওপর দিয়ে সাপের মতো লতিয়ে ছিল, কোথাও মসের সূচ্যগ্র পাতাগুলি ছিল বেরিয়ে, কোথাও বা ২০-৩০ হাত উঁচু গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ।

হ্রদ, ছোট নদী বা জলার মতো জায়গায় গাছ মরে পচে গেলে, সেই জলে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায় । অক্সিজেন কমে যাওয়ায় জলজ সন্ধিপদ প্রাণী ও মাছেদের বেঁচে থাকায় সমস্যা দেখা দিল । এই অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে গিয়ে কোনো কোনো সন্ধিপদ প্রাণী ও মাছের শরীরে বায়ু থেকে শ্বাসকার্য চালাবার উপযুক্ত অঙ্গের সৃষ্টি হলো ।

ডাঙায় প্রথমে উঠে আসে সন্ধিপদ প্রাণী । তারা সম্ভবত ছিল বৃশ্চিক ও মাকড়সার পূর্বপুরুষ, অথবা সমুদ্র-বৃশ্চিকের মতো কোনো প্রাণী থেকে উদ্ভূত । ডেভোনিয়ান কল্পে গাছপালার বিস্তারও বোধ হয় তাদের ডাঙায় উঠে আসার একটি কারণ ছিল, কেননা তা হলো সন্ধিপদ প্রাণীর খাদ্য । এদের শরীরে ছিল সরু-সরু নালির মতো অংশ যাকে trachea বলে, তা দিয়ে এরা বাতাসে শ্বাস নিত । শুধু তাই নয় ডেভোনিয়ান কল্পের মধ্যভাগে স্থলবাসী পতঙ্গও ছিল, তবে সেগুলি ছিল পাখনাহীন ।

অকসিজেনের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় কোনো কোনো জাতীয় মাছ ডেভোনিয়ান কল্পে ডাঙায় উঠে আসার চেষ্টা করে এবং লক্ষ-লক্ষ বছরের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাদের থেকে সৃষ্ট হয় উভচর প্রাণীর । আগে মাছের কথা আলোচনা করে তারপর আমরা উভচরের কথায় আসবো ।

জীব-বিবর্তনের ইতিহাসে যদি কোনো যুগকে মৎস্যযুগ নাম দেওয়া যায়, তবে তা হলো ডেভোনিয়ান কল্প । বস্তুত ঐ সময়ে সব প্রাণীর মধ্যে মাছের বৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশি । একদিকে যেমন ছিল চোয়ালহীন মাছ, তেমন অন্যদিকে দেখা যেত চোয়ালযুক্ত নানা রকম মাছ—কারো ত্বক মসৃণ, কারো গায়ে আঁশ, কারো বা দেহ বর্মাবৃত । এক ধরনের বিরাটাকৃতি মাছও তখন ছিল, যার নাম ডিনিক্‌থিস । তাদের দৈর্ঘ্য ২০ থেকে ৩০ ফুট । মাছগুলির বিরাট মাথা বর্ম দিয়ে ঢাকা ।

ওপর ও নিচের চোয়ালের ধার দিয়ে করাতের মতো খাঁজ কাটা, এবং তা দাঁতের মতো শক্ত ও তীক্ষ্ণ ।

পূর্বে বর্ণিত প্ল্যাকোডার্ম জাতীয় মাছগুলি ডেভোনিয়ান কল্পের শেষে লোপ পেল । কোনো কোনো বিজ্ঞানীর মতে, অ্যাকান্থোডিয়ান জাতীয় মাছ থেকে দুটি শাখার জন্ম হয়েছিল । একটি শাখার মাছ ছিল হাঙর প্রভৃতির পূর্বপুরুষ এবং অন্য শাখা থেকে হলো কণ্টকযুক্ত মাছের উদ্ভব ।

বর্তমানযুগের মাছগুলিকে দুই জাতিতে বিভক্ত করা যায় তরুণাস্থিযুক্ত এবং কণ্টক যুক্ত মাছ। হাঙর, শংকর মাছ (ray) ও ডগফিশ-এর (dogfish) শরীর কণ্টকের পরিবর্তে তরুণাস্থি (cartilage) দিয়ে গঠিত । ডেভোনিয়ান কল্পে তরুণাস্থি-যুক্ত মাছের আদিমতম ফসিল পাওয়া গেছে । প্রাচীনকালে স্বাদু জলেও যে হাঙর বাস করত, তার প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে পুরাজীবীয় অধিকল্পের শেষভাগের শিলা থেকে । জলের মধ্যে ভেসে থাকার জন্যে কণ্টকযুক্ত মাছের যেমন পটকা (air bladder) আছে, হাঙরের কিন্তু তা নেই ; সেজন্যে হাঙরকে সব সময় সাঁতার দিতে হয় যাতে সে ডুবে না যায় । প্রজননের (reproduction) সময় হাঙরের গর্ভাধান (fertilization) হয় দেহ মধ্যে। তরুণাস্থি যুক্ত মাছের গায়ে আঁশগুলি উঁচু হয়ে থাকে এবং তা দাঁতের মতো এনামেল দিয়ে ঢাকা । তাই হাঙরের গা শিরিষ কাগজের মতো মনে হয় ।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে কণ্টকযুক্ত মাছের বৈচিত্র্য সর্বাধিক । সব মেরুদণ্ডী-দের মধ্যে প্রজাতির সংখ্যা যত, তার অর্ধেকেরও বেশি হলো কণ্টকযুক্ত মাছের প্রজাতি সংখ্যা । অগভীর জল থেকে আরম্ভ করে সমুদ্রের অতলেও তারা বাস করে । শুধু হ্রদ বা নদীতে নয়, গুহায় বা উষ্ণ প্রস্রবণেও তাদের দেখা যায় । এই মাছগুলির শরীর হাড় দিয়ে তৈরি যাকে কাঁটা বলে । শরীরের মধ্যে যে পটকা আছে তার ভেতরে হাওয়া কম-বেশি করে জলের মধ্যে বিভিন্ন গভীরতায় এরা ভেসে থাকতে পারে । পুং-জনন-কোষ ও ডিম মিলিত হয় মাছের দেহের বাইরে অর্থাৎ জলে ।

কণ্টকযুক্ত মাছেদের ৩টি জাতিতে ভাগ করা হয়ে থাকে—

ক) অ্যাক্টিনোপ্টেরিজিয়ান (অর্থাৎ যাদের পাখনায় কাঁটাগুলি রশ্মির মতো বিন্যস্ত) ;

খ) ফুসফুস মাছ (lung fish) ; এবং

গ) ক্রসোপ্টেরিজিয়ান (অর্থাৎ যাদের পাখনায় আছে লতির মতো মাংসল অংশ)।

এই তিন জাতীয় মাছের উদ্ভব ডেভোনিয়ান কল্পের প্রথমে হয়েছিল । কিন্তু তখন সব মাছেরই ফুসফুস ছিল । কালক্রমে অধিকাংশ মাছের ফুসফুস পটকায় রূপান্তরিত হলো ।

অ্যাকৃটিনোপ্টেরিজিয়ান॥ বর্তমান যুগে স্বাদু জলে ও সমুদ্রে এই জাতির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এদের পাখনায় কাঁটাগুলি রশ্মির মতো সাজানো এবং তা ঝিল্লি দিয়ে যুক্ত। ডেভোনিয়ান কল্পের প্রথমে তারা থাকত স্বাদু জলে। কিছু কালের মধ্যে তারা সমুদ্রে জীবনধারণের উপযোগী হয়ে ওঠে। যখন তারা সমুদ্রে বসবাস আরম্ভ করে, সম্ভবত সেই সময় থেকে এদের ফুসফুস পটকায় রূপান্তরিত হলো। ক্রমবিবর্তনের ফলে মাছগুলির কণ্টকযুক্ত কাঠামো এবং আঁশ ক্রমে হালকা আর চোয়াল আরো কার্যোপযোগী হয়ে ওঠে।

ফুসফুস মাছ॥ পাখনা ও আঁশ ইত্যাদি অংশ দেখতে গেলে ফুসফুস মাছ ও ক্রসোপ্টেরিজিয়ানদের মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্য চোখে পড়ে। পাখনার মধ্যে সন্ধিযুক্ত কাঁটাগুলি এমনভাবে সাজানো যে, লম্বালম্বি দিক বরাবর একটা অক্ষের (axis) সৃষ্ট হয়েছিল এবং পাখনার মাঝামাঝি দিক বরাবর এরকম অক্ষ থাকার জন্যে এদের পাখনার আন্দোলন অ্যাকৃটিনোপ্টেরিজিয়ান মাছের পাখনার থেকে মন্থর হলেও তা আরো দৃঢ় ছিল। প্রাচীন ফুসফুস মাছ ও ক্রসোপ্টেরিজিয়ানদের মধ্যে পার্থক্য বোঝা যায় করোটির গঠনে যা থেকে মনে হয় যে, ডেভোনিয়ান কল্পের পূর্বে এই দুই জাতীয় প্রাণীর বিবর্তনের ধারা আলাদা হয়েছিল।

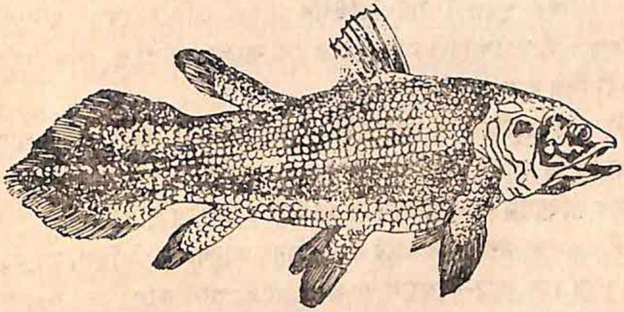
বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, ফুসফুস মাছেরা প্রথম থেকে স্বাদু জলে বাসের উপযোগী হয়ে গড়ে উঠেছিল। দ্রুত সন্তরণে তারা অক্ষম। বিবর্তনের ধারায় তাদের দাঁত ক্রমে চ্যাপ্টা হয়ে যায়, যাতে ছোট ছোট শামুক ও ক্রাসটেসিয়ান (চিংড়ি, কাঁকড়া ও তৎসদৃশ প্রাণী) এবং জলজ উদ্ভিদ ও মৃত প্রাণীদেহ তারা পিষে খেতে পারে।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে প্রথমে ফুসফুস মাছ ও ক্রসোপ্টেরিজিয়ান স্থলে শ্বাসকার্য চালাবার উপযোগী হয়ে উঠেছিল। যে নদীগুলিতে সারা বছর জল থাকতো না, সেখানে ফুসফুস মাছের উদ্ভব হয়। জলের নিচে এরা অন্য মাছেদের মতো ফুলকা দিয়ে শ্বাস নেয়, কিন্তু জলের বাইরে বেঁচে থাকার জন্যে এদের ফুসফুস সাহায্য করে। অগভীর ও স্রোতহীন নদী বা জলায় অক্সিজেন কম বলে এই মাছগুলিকে বায়ুসেবী হতে হয়েছে। আর নদীর জল শুকিয়ে গেলে এদের কাদায় থাকতে হয় এবং তাই এরা তখন শ্বাস নেয় বাতাস থেকে।

ফুসফুস মাছকে 'জীবন্ত ফসিল' বলা যায়, কারণ আজও তারা বাস করে অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার নদীতে অস্ট্রেলিয়ার এই মাছ-গুলির একটিমাত্র ফুসফুস। জলে অক্সিজেন খুব কম থাকলে, অথবা বেশি খরার সময় অস্ট্রেলিয়ার ফুসফুস মাছের জীবনধারণে সমস্যা দেখা দেয়। এদিক থেকে দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার মাছগুলি নিজেদের আরো মানিয়ে নিতে পেরেছে এবং এদের দুটি করে ফুসফুস থাকে। খরার সময় দক্ষিণ আমেরিকার মাছ নদী

বা জলার ধারে কাদায় গর্ত করে তার মধ্যে কয়েকমাস কাটিয়ে দেয়। নদী বা জলা শুকিয়ে গেলে আফ্রিকার ফুসফুস মাছ মাটির তলায় থাকে একরকম অদ্ভুত আবরণের ভেতরে,—মাছগুলির দেহ নিঃসৃত রস থেকে এই আবরণ তৈরি। মাছগুলি এই আবরণের মধ্যে গ্রীষ্মকাল বা খরার সময় অতিবাহিত করে, আবরণের মধ্যে ছোট গর্ত দিয়ে তার শ্বাস-প্রশ্বাস চলে। বর্ষা আরম্ভ হলে আবরণ থেকে এরা বেরিয়ে জলে আসে।

ক্রসোপ্টেরিজিয়ান ॥ কতকগুলি বিষয়ে ফুসফুস মাছের সঙ্গে ক্রসোপ্টেরিজিয়ানের সাদৃশ্য থাকলেও এরা সন্তরণে আরো দ্রুতগামী। নদী ও জলায় ক্রসোপ্টেরিজিয়ানদের বাস। ডেভোনিয়ান কল্পে মাছগুলি থাকত স্বাদু জলে। কালক্রমে কোনো কোনো মাছ সমুদ্রে বসবাস আরম্ভ করে। সমুদ্রবাসী এই জাতীয় মাছের মধ্যে আজও একরকম মাছ দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলে পাওয়া যায়, তার নাম সিলেকান্থ। ১৯৩৮ সনে সিলেকান্থের অস্তিত্ব প্রথম আবিষ্কৃত হয়। মাছটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৫ ফুট। তবে, ক্রসোপ্টেরিজিয়ানদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্ব বেশি ছিল রিপিডিষ্টিয়ান জাতির। রিপিডিষ্টিয়ান মাছদের মাথায় অস্থিসন্ধিগুলি এমন যে, তারা ওপরের চোয়ালকে নিচের চোয়াল থেকে স্বাধীনভাবে ওঠাতে-নামাতে পারত। ফলে তাদের দু'দিক থেকে সুবিধা হয়েছিল। প্রথমত—শ্বাসকার্যে ফুলকার জন্যে জল অথবা ফুসফুসের জন্যে বায়ু গ্রহণ করার সময় শুধু ওপরের চোয়াল ওঠালে চলত, নিচের চোয়াল নামাবার দরকার হতো না। দ্বিতীয়ত—অগভীর জলে দ্রুত গতিতে শিকার ধরে গ্রাস করার সময় নিচের চোয়াল নামানো বিপজ্জনক এবং সেজন্যে ওপরের চোয়াল স্বাধীনভাবে ওঠাতে পারলে সুবিধা হতো।



সিলেকান্থ্ মাছ

শ্বাসকার্যের জন্যে মাছগুলির ফুলকা ও ফুসফুস ছিল। জলে অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকলে অথবা নদী ও পুকুর শুকিয়ে গেলে এরা ফুসফুস দিয়ে বায়ুসেবন করতো।

মাছগুলির বুক ও পেটের পাখনা শরীরের সঙ্গে মাংসল লতি (fleshy lobe)

দিয়ে যুক্ত। রিপিডিস্টিয়ানদের লতিযুক্ত পাখনাগুলি মজবুত ছিল। এই পাখনাগুলির ভেতরের হাড় ছিল কতকটা চতুষ্পদ প্রাণীদের (quadruped) পায়ের হাড়ের মতো। তলার দিকে একরকম মজবুত পাখনা থাকায় এরা পাঁকের ওপর দিকে শরীর ঠেলে ঠেলে এগোতে পারতো। পুকুর বা নদী শুকিয়ে গেলে এরা ঐ মাংসল পাখনার ওপর ভর করে অনেকটা হামাগুড়ির মতো করে সেখান থেকে চলে যেত অন্য কোনো জায়গায়—যেখানে জল আছে। এইভাবে দৈহিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে রিপিডিস্টিয়ান মাছ থেকে উভচরের উদ্ভব হয়।

লতিযুক্ত পাখনার আর একটি ভূমিকা ছিল বায়ুসেবনে সহায়তা। বাতাস থেকে শ্বাসকার্য চালাতে গেলে ফুসফুসের পাম্প্‌ প্রক্রিয়া ঠিকমতো হওয়া দরকার। অনেক সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ীর বুকের খাঁচা (rib cage) মাংসপেশীর সাহায্যে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে ফুসফুসের পাম্প্‌ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে। রিপিডিস্টিয়ান মাছ আপন দেহের ভার লতিযুক্ত পাখনার ওপর দিত এবং সেজন্যে শ্বাসকার্যে তার বুকের খাঁচাকে (যা ফুসফুস মাছ ও সিলেকান্থের বুকের খাঁচার থেকে আরো মজবুত) সংকুচিত ও প্রসারিত করতে পারতো। খুব অল্প জলে শিকার ধরার সময় তারা যখন এগিয়ে যেত, তখন শরীরের অনেকটা ভার পাজরের ওপরে পড়ায় শ্বাস-প্রশ্বাসের অসুবিধা হতে পারতো, যদি না তাদের দেহ ঐ লতিযুক্ত পাখনায় ভর করে উঁচু হয়ে থাকে। অনেক সময় এরা পাখনার উপর ভর দিয়ে জলের ধারে ভিজে কাদায় বিশ্রাম নিত ; মনে হয়, তখন শ্বাসের কাজ চলতো ফুসফুসের সাহায্যে।

আদিম উভচর প্রাণীরা যেমন শরীর ও লেজের আন্দোলনে সাঁতার দিত তেমন তাদের পূর্বসূরী রিপিডিস্টিয়ান মাছও এগিয়ে যেত অনেকটা একই প্রক্রিয়ায়। সাঁতারে গতি লাভ করতে এই মাছের লতিযুক্ত পাখনাগুলি তেমন কার্যকরী ছিল বলে মনে হয় না।

নদী ও জলাভূমিতে যে রিপিডিস্টিয়ান মাছ ছিল, তাদের লতিযুক্ত পাখনা ক্রমে আরো দৃঢ় হয় যাতে তারা ডাঙায় আরো বেশিক্ষণ থাকতে পারে। লতিযুক্ত পাখনার পরিবর্তন হতে হতে তৈরি হয় উভচর প্রাণীর পা।

নদী, হ্রদ ও জলাশয়ের ধারে ধারে যেসব জায়গায় মাটি ছিল, তা ডেভোনিয়ান কল্পে সবুজ হয়ে ওঠে—শৈবাল ও মস থেকে শুরু করে বড় বড় গাছ গজায় সেখানে। ঐ সময়ে শিরা-নালি যুক্ত (vascular) আদিমতম গাছ সাইলোফাইটনও ছিল। তবে, তখন শুধু জলার কাছে কাছে গাছপালা ছিল বলে মনে হয়। গাছগুলি মরে গেলে তাদের শরীর পচতে আরম্ভ করে। জলে এই আবর্জনা পচতে থাকলে সেই পচন প্রক্রিয়ার (decaying process) সঙ্গে অক্সিজেন গ্রহণকারী জীবাণুর দ্রুত বংশবিস্তার হয় ও তার ফলে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। মাছ প্রভৃতি যেসব জলচর জীব শুধু ফুলকা দিয়ে শ্বাস নেয় তারা এক

বিরাট সমস্যায় পড়ে। প্রথমত—ফুলকা দিয়ে বেশি অক্সিজেন নেওয়া শক্ত এবং তার ওপর অক্সিজেন কমে গেলে জীবনধারণ কষ্টকর। সমুদ্রের জলে যথেষ্ট অক্সিজেন মিশে থাকে বলে ফুলকা দিয়ে শ্বাস নেওয়া সহজ। কিন্তু ছোট ছোট নদী, হ্রদ ও বদ্ধ জলাশয়ে অক্সিজেন কম থাকলে, সেখানে শুধু ফুলকা দিয়ে শ্বাস নেওয়া বিপজ্জনক। এই পরিবেশে মাছ ও সন্ধিপদ প্রাণীদের মধ্যে বায়ুসেবন শুরু হয়।

কোনো কোনো বিজ্ঞানী মনে করেন যে, কোটি-কোটি বছর আগে প্রাকৃতিক বা জলবায়ুগত কারণে অনেক হ্রদ শুকিয়ে যেতে থাকে এবং সেখানে মাছগুলির শরীরে ক্রম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বায়ুসেবনের উপযোগী অঙ্গ গড়ে উঠেছিল।

আজও দেখা যায়, যেখানে জলে অক্সিজেন কম, সেখানে মাছেরা মাঝে মাঝে ভেসে উঠে বুদবুদ কাটে ও আবার নিচে চলে যায়। বুদবুদের মধ্য দিয়ে আসে অক্সিজেন ও কিছু কার্বন ডাই-অক্সাইড। অক্সিজেন শরীরের মধ্যে থাকে, আর কার্বন ডাই-অক্সাইড ফুলকা দিয়ে জলে বেরিয়ে যায়।

সিলুরিয়ান ও ডেভোনিয়ান কল্পে যে মাছগুলি স্বল্প অক্সিজেন মিশ্রিত স্বাদু জলে বাস করত, তাদের মধ্যে বায়ুসেবন আরম্ভ হয়েছিল বলে অনেকের বিশ্বাস। তাদের মুখগহ্বরের পিছনে একরকমথলি তৈরি হয় যাতে বাতাস থাকে; এই থলি ফুসফুসের রূপ নিল (কেউ কেউ, মনে করেন জঠরের সম্মুখবর্তী অন্ত্র বা anterior intestine-এর রূপান্তরের ফলে ফুসফুসের সৃষ্টি হয়েছিল)। যে মাছগুলি সমুদ্রে ফিরে গেল তাদের আর ফুসফুস থাকলো না,তা বদলে গিয়ে পটকা হলো। আর নদী, ও হ্রদবাসী মাছগুলির ফুসফুস থেকে গেল।

কিন্তু ডাঙায় থাকতে গেলে শরীর হতে কার্বন ডাই-অক্সাইড বের করার একটা সমস্যা দেখা দেয়, কারণ ফুলকা দিয়ে নিশ্বাস ছাড়তে গেলে তার সূত্রগুলি (gill filaments) জুড়ে শুকিয়ে যায় ও কাজ করতে পারেন না। তাই ব্যাং প্রভৃতি উভচর প্রাণীরা প্রধানত ত্বক দিয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত করে। এজন্যে উভচরের ত্বক পাতলা ও তাতে কোনো আবরণ বা আঁশ নেই। ত্বক দিয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমনের সময় শরীরের অনেকটা জলও বাষ্প হয়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু প্রাণীর দেহের জন্যে জল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় (উদাহরণ স্বরূপ মানবদেহের প্রায় ৭১ শতাংশ জল)। বেশি জল এভাবে বেরিয়ে যাওয়া ক্ষতিকর। সেজন্যে উভচর জীব সাধারণত আর্দ্র পরিবেশে বাস করে। দ্বিতীয়ত—ত্বক দিয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমনের আর একটা অসুবিধা আছে। উভচরের আকার ছোট বলে তারা এই প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে পারে। কিন্তু শরীর বৃহৎ হলে সেই আয়তনের অনুপাতে উপরিপৃষ্ঠ বা ত্বক বৃদ্ধি পায় না এবং সেজন্যে গ্যাস নির্গমন প্রক্রিয়ার তা যথেষ্ট কার্যকরী হয় না। তখন প্রাণীকে অন্য উপায়ের আশ্রয় নিতে হয়।

শরীর থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমনের অন্য প্রক্রিয়া হলো দ্রুত শ্বাসকার্য চালানো। শ্বাসকার্যদ্রুত হলে শরীরের মধ্যে এই গ্যাস বেশিক্ষণ থাকতে পারে না দ্বিতীয়ত—শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্ত কাজটা সেক্ষেত্রে ফুসফুস দিয়ে হয় বলে প্রাণীদেহের আকার বৃদ্ধি পাওয়া সহজ। তৃতীয়ত—গ্যাস নির্গমনে ত্বকের মূল ভূমিকা চলে যাওয়ায় তা আর পাতলা থাকার দরকার রইল না (মানুষ প্রভৃতি উন্নততর প্রাণীর ক্ষেত্রে শরীর থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন প্রক্রিয়ায় ত্বকের ভূমিকা খুবই নগণ্য)। তখন প্রাণীদের ত্বকে আঁশ, বর্ম, পালখ ও লোম তৈরি হলো।

দ্রুত বায়ুসেবনের জন্যে ফুসফুসের পাম্প্ প্রক্রিয়ায় বুকের খাঁচা কেমনভাবে সাহায্য করতো তা আগে বলা হয়েছে। ডেভোনিয়ান কল্পের আদিম উভচর প্রাণীগুলির শ্বাসকাজ কিন্তু ফুসফুস দিয়ে চলত বোধ হয়, কারণ তাদের শরীর ছিল আঁশে ঢাকা। তাই কোনো কোনো বিজ্ঞানী মনে করেন যে তারা ত্বক দিয়ে নিশ্বাস ছাড়ত না, যেমন ব্যাং প্রভৃতি বর্তমান উভচরেরা করে। আদিম উভচর প্রাণীদের শ্বাসকার্যে বুকের খাঁচার সম্ভবত একটা ভূমিকা ছিল।

রিপিডিস্টিয়ান মাছের লতিযুক্ত পাখনা থেকে কেমন করে উভচর জীবের পা হলো, সেই ক্রম-বিবর্তনের সব ফসিল ধারাবাহিক ভাবে পাওয়া যায়নি। তবে, উদাহরণরূপে দুটি প্রাণীর বর্ণনা দিলে বিষয়টা একটু পরিষ্কার হবে; তার মধ্যে প্রথমটি হলো—ইউস্থেনোপ্টেরন নামে এক রিপিডিস্টিয়ান মাছ এবং দ্বিতীয়টি একরকম প্রাচীন উভচর—যার নাম ইক্থিওস্টেগা।

ইউস্থেনোপ্টেরন মাছের বুকের পাখনা কাঁধের হাড়ে (shoulder girdle বা উরশ্চক্র) জোড়া এবং কাঁধের ঐ হাড় ছিল করোটি বা মাথার খুলির সঙ্গে যুক্ত। বুকের পাখনার সন্ধিস্থল দৃঢ় ও অনম্য বলে, এরা তেমন সহজভাবে পাখনা চালাতে পারত না, পাখনার আন্দোলন সীমিত ছিল। পেটের পাখনার গোড়ায় হাড়ের ছোট ছোট প্লেট ছিল, যাকে শ্রোণী (pelvis) বলা হয়। এদের শ্রোণী কিন্তু মেরুদণ্ডের সঙ্গে যুক্ত নয় বলে অসুবিধা হতো। শরীরকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় পাখনা বা পায়ের হাড়ে যে চাপ পড়ে, তাকে ধরে রাখার জন্যে শ্রোণী ও মেরুদণ্ডের সংযোগ থাকাটা অত্যন্ত জরুরি। এই সংযোগ না থাকায় ইউস্থেনোপ্টেরন মাছের পক্ষে সামনে এগিয়ে যাওয়া একটু কষ্টকর ছিল মনে হয়।

আদিম উভচর ইক্থিওস্টেগার গঠনে এই সমস্যার একটা সমাধান লক্ষ্য করা যায়। তার সামনের পায়ের সঙ্গে কাঁধের যে হাড় জোড়া ছিল, সেই উরশ্চক্র করোটি থেকে পৃথক। তাই, সামনের পা-কে চলার কাজে তারা আরো সহজে ব্যবহার করতে পারতো। পিছন দিকে শ্রোণীর হাড় বড় ও একটু বাঁকানো হয়ে শ্রোণীচক্রে (pelvic girdle) রূপান্তরিত হয়েছিল এবং শ্রোণীচক্র হলো মেরুদণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। ফলে, তাদের পিছনের পা চলাফেরার আরো উপযোগী হলো।

মাছ থেকে উভচরের বিবর্তন ধারায় আর একটা জিনিস আমাদের চোখে পড়ে। নতিযুক্ত পাখনাগুলি একদিকে যেমন দৃঢ় হতে থাকে, তেমন তার গা ক্রমে আরো খাল-কাটা মতো (ridged) হলো, যাতে বালি-কাদার ওপরে চললে পিছলে যেতে না হয়। এইভাবে আরো পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তৈরি হলো পায়ের পাতা ও আঙুল।

পূর্ববর্ণিত ক্রসোপ্টেরিজিয়ান মাছ থেকে ডেভোনিয়ান কল্পের শেষভাগে উদ্ভূত উভচরের পা-গুলি শরীরের অনেকটা পাশের দিকে যুক্ত। ইক্‌থিওস্টেগার ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায় যে, পাখনাগুলি শরীরের পাশে সরে এসে ফাতনার (flipper) মতো পায়ের আকার নিয়েছে। পা-গুলি শরীরের ঠিক নিচে না হয়ে পাশের দিকে থাকায় তারা পা বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে হেলেদুলে জবুথবুভাবে চলতো ; ইংরেজিতে এইভাবে হাঁটাকে বলে waddling।

ছোট ছোট মাছ ও পক্ষবিহীন পতঙ্গ ছিল উভচর প্রাণীর খাদ্য। এরকম শিকার ধরার জন্য যদিও বড় হাঁ করার দরকার হয় না, তবে শিকারী এমন হওয়া উচিত যাতে সে একটু দূর থেকেও এদের ধরতে পারে। আদিম উভচরগুলির মুখের বিশেষ গঠনের এটা একটি সম্ভাব্য কারণ। এদের মুখ রিপিডিস্টিয়ানের চেয়ে আরো লম্বাটে এবং উপরের চোয়াল করোটির সঙ্গে সম্পূর্ণ যুক্ত। মাথার হাড়গুলি আরো হালকা হাওয়ায় এরা সহজে মাথা উঠাতে পারতো। করোটির পিছনের অস্থিসন্ধি আরো নম্য হওয়ায় কাজের উপযোগী গ্রীবা তৈরি হলো এবং সেই সঙ্গে এরা পাশের দিক করে মুখ খুলে ও বন্ধ করে শিকার ধরতে সক্ষম হলো।

মাছের শরীরের দু'পাশ দিয়ে রেখার মতো আছে এবং সেই রেখা বরাবর এক বিশেষ ধরনের কোষ সাজানো থাকে, যা দিয়ে জলের মধ্যে শব্দ-তরঙ্গকে অনুভব করা যায়—এর নাম lateral line। তাছাড়া, মাছের মাথার ভেতরে আরো এক ইন্দ্রিয় আছে যা ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। তরল পদার্থে পূর্ণ এই ইন্দ্রিয় দিয়ে কম্পন অনুভব করা যায় বলে মনে হয়। প্রাচীনকালে উভচর প্রাণীরা জলের মধ্যে শব্দ 'শোনা'র জন্যে মাছের মতো ল্যাটারাল লাইনের সাহায্য নিত। ক্রমে ডাঙায় শব্দ শোনার উপযোগী ইন্দ্রিয় তৈরি হলো। উভচরের কানের কাছে চোয়ালের একটি হাড় (jaw bone) এমন যে তা বাতাস থেকে কানের ঝিল্লিতে ধাক্কা দেওয়া শব্দ-তরঙ্গকে ভেতরের শ্রবণেন্দ্রিয়ে পৌঁছে দিতে পারে।

উভচরের চোখ ডাঙায় দেখার উপযোগী হয়ে উঠলো। বাতাসে চোখ ভিজে ও পরিষ্কার রাখার জন্যে এদের যে অশ্রুনালি (tear duct) ছিল তার প্রমাণ ফসিল থেকে পাওয়া গেছে।

আদিম উভচর জীবের করোটি প্লেটের মতো দেখতে যেমন রিপিডিস্টিয়ান

মাছের ছিল। এদের দাঁতের সঙ্গে মাছের সাদৃশ্য ছিল। আদিম উভচরের তালুর গায়েও যে দাঁত হতো তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রথমদিকে আবির্ভূত এই প্রাণীগুলির দাঁতের ওপরে জটিল ভাঁজ কাটা ছিল বলে এদের সাধারণ নাম Labyrinthodont ('ল্যা'বিরিন্থ' শব্দের অর্থ গোলকধাঁধা) রাখা হয়েছে।

প্রথমে আবির্ভূত উভচর প্রাণীগুলির শরীর লম্বাটে ও লেজে পাখনা। রিপিডিস্টিয়ান মাছ যেমন শরীর ও লেজের আন্দোলন থেকে সন্তরণের গতি লাভ করতো, আদিম উভচরের ক্ষেত্রেও তাই ছিল। তাদের লেজ দু'পাশে চ্যাপ্টা, যাতে সাঁতার দিতে সুবিধা হয় (বর্তমান স্যালামাণ্ডারের লেজও এই রকম)। জলে তারা অনেকটা সময় কাটাতো, আর তাদের চোখ ছিল মাথার ওপরে, যেমন কুমিরের থাকে।

যদিও উভচরের পা আছে, কিন্তু এর চলার ধরনে মাছের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য দেখা যায়। সাঁতার দেওয়ার সময় মাছের শরীরের দৈর্ঘ্য বরাবর যেমন ঢেউ খেলতে থাকে, স্যালামাণ্ডারের চলার সময়ও সে রকম হয় (অর্থাৎ সে চলার সময় এঁকেবেঁকে পা ফেলে)।

জলকে একেবারে বাদ দিয়ে উভচর প্রাণী বাঁচতে পারে না। তার অন্যতম কারণ—এদের ডিমে শক্ত খোলস বা আবরণ নেই; ডাঙায় থাকলে ডিম শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং তাই এদের ডিম পাড়ার সময় জলে যেতে হয়। মাছের মতো ব্যাঙের ক্ষেত্রেও পুং-জননকোষ ও ডিম মিলিত হয় দেহের বাইরে অর্থাৎ জলে। ডিমগুলি জেলির মতো জিনিসে ঢাকা। এই জেলি ডিম হতে উৎপন্ন ভ্রূণকে ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা করে। পরবর্তী পর্যায়ে ব্যাঙাচি জলে মাছের মতো সাঁতার কাটে ও শ্বাস নেয় ফুলকা দিয়ে। ডাঙার চেয়ে জলে খাদ্য আরো সহজলভ্য এবং সেজন্যে উভচরের প্রথম জীবন জলে কাটাবার এটি অন্যতম কারণ হতে পারে। ব্যাঙাচিদের পা নেই এবং তারা দেহ ও লেজের আন্দোলনে সাঁতার দেয়। ক্রমে তাদের লেজ ছোট হতে থাকে ও পা গজায়। শেষে লেজ ও ফুলকা মিলিয়ে যায় ও তারা ডাঙায় এসে ফুসফুস দিয়ে বায়ুসেবন আরম্ভ করে।

প্রাচীনতম উভচরের ফসিলগুলির মধ্যে একটি হলো ইক্‌থিওস্টেগা। এর ফসিল



ইক্‌থিওস্টেগা

গ্রীনল্যাণ্ডে আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাণীটি লম্বায় প্রায় ৩ ফুট। লেজ লম্বা ও

পাখনাযুক্ত, আর ঐ পাখনার হাড়গুলি ছিল মাছের পাখনার কাঁটার মতো (fin rays)। ডাঙায় এরা পা দিয়ে চলতো, জলে সাঁতার দিত লেজের আন্দোলনে এবং জল খুব কম থাকলে সেখানে পা ও লেজ দুয়ের সাহায্যে এগিয়ে যেত, যেমন কুমিরের ক্ষেত্রে দেখা যায়।

স্টিগোসেফালিয়ান বর্গের যে প্রাচীন উভচরগুলির ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের মধ্যে কোনো কোনো প্রজাতির শরীরে পেটের কাছে আঁশগুলি খোলার মতো পুরু ও শক্ত হয়ে উঠেছিল। ডাঙায় চলার সময় ঐ আবরণ তার দেহকে ঘর্ষণ থেকে রক্ষা করত।

উভচরের বিবর্তন ইতিহাস জটিল। তবে সাধারণভাবে বলা যায়, দুটি প্রধান ধারায় এদের বিবর্তন হয়েছিল—একটি ধারার প্রাণীদের অনেকটা 'স্থলবাসী' বলা যায়, অন্য ধারার প্রাণীরা 'জলবাসী'।

স্থলবাসী প্রাণীদের পা লম্বা ও মজবুত। মেরুদণ্ড খুব দৃঢ় এবং তা সহজে ঘোরানো-বাঁকানো যেত না, কারণ ডাঙায় চলার সময় পায়ের চাপকে ধরে রাখার জন্যে মেরুদণ্ড শক্তিশালী হওয়া আবশ্যক। ইরিয়প্‌স নামে পরিচিত উভচরগুলি সম্ভবত জলের কাছে রোদ পোহাত আর মাছ ধরে খেত; উত্তর আমেরিকার টেক্‌সাস অঞ্চলে পার্মিয়ান কল্পের ফসিলে এর নিদর্শন পাওয়া গেছে। কতকটা সরীসৃপের মতো দেখতে একরকম উভচর প্রাণীও ছিল, যার নাম সেমউরিয়া। যদিও একে সরীসৃপের পূর্বসূরী বলা যায় না, তবে কয়েক জাতীয় উভচরের দেহে যে সরীসৃপসদৃশ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাচ্ছিল তা এই থেকে প্রমাণিত হয়।

দ্বিতীয় ধারার উভচর প্রাণীরা হলো জলবাসী। এদের শরীর স্থলবাসীদের তুলনায় আরো লম্বাটে এবং পা-গুলি ছোট। এদের মেরুদণ্ড অনেক বেশি নম্য বা **flexible** বলে সাঁতারে সুবিধা হতো। আদিম স্থলবাসী উভচরের থেকে এরা আরো দীর্ঘকাল বর্তমান ছিল। মধ্যজীবীয় অধিকল্পের প্রথম দিকের ফসিলেও এদের নিদর্শন পাওয়া গেছে। ট্রায়াসিক কল্পের এরকম কতকগুলি উভচরের ফসিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউ সাউথ ওয়েল্‌স থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের পা-গুলি দুর্বল, মাথা বড় (কোনো কোনো প্রাণীর করোটি ৪ ফুট লম্বা) এবং চোখের গর্ত ওপর দিকে। দেহবৈশিষ্ট্য থেকে বোঝা যায় যে, এরা জলবাসের উপযোগী হয়ে গড়ে উঠেছিল।

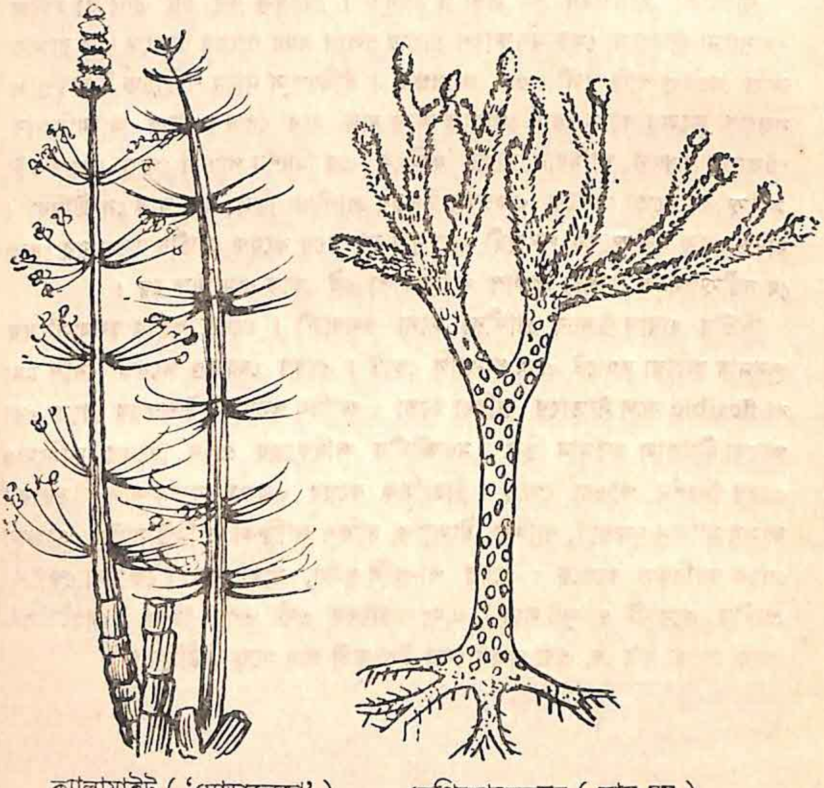
৮

কার্বনিফেরাস কল্প

(৩৪·৫ থেকে ২৮ কোটি বছর আগে)

প্রকৃতির ইতিহাসে বনের বিস্তার সবচেয়ে বেশি যে, সময় হয়েছিল তার নাম কার্বনিফেরাস কল্প। বন বিস্তারের পিছনে ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন ও জলবায়ু অন্যতম কারণ। পৃথিবীপৃষ্ঠে পরিবর্তনের ফলে স্থলভাগ বসে যেত বা উঁচু হয়ে উঠত, তাই সমুদ্র স্থলভাগের বহুদূর পর্যন্ত প্লাবিত করেছিল। সমুদ্র এগিয়ে আসা ও পিছিয়ে যাওয়ার ফলে তৈরি হলো বহু জলাভূমি। আবহাওয়া তখন উষ্ণ ও আর্দ্র—প্রায় সব সময় বৃষ্টি। এজন্যে অরণ্যের বিস্তার আরো ব্যাপক হলো।

গাছগুলি বিরাট, এখন যেমন ২-৩ ফুট 'ঘোড়ালেজা' গাছ (অর্থাৎ horsetail



ক্যালামাইট ('ঘোড়ালেজা')   লেপিডোডেন্‌ড্রন (ক্লাব মস্‌)

যেগুলি সাধারণত অকর্ষিত জমি বা বেলেমাটিতে গজিয়ে থাকে) বা ইঞ্চি খানেক ক্লাব-মস দেখা যায় সে যুগের এই জাতীয় গাছ প্রায় ৫০ থেকে ১০০ ফুট উঁচু হতো। বনে নানারকম গাছের মধ্যে লেপিডোডেন্‌ড্রন (লাইকোপোডিয়াম জাতীয়)

অন্যতম। তাদের গা কিন্তু শক্ত কাঠের নয়, যেমন আমরা এখনকার গাছে দেখি। সেই গায়ে কোনো পুরু ছালও নেই। গাছগুলি রসালো। তাতে ফুল বা ফল ধরতো না; তাদের বংশবিস্তার হতো 'রেণু'র (spore) সাহায্যে যেমন হয় ফার্ন গাছে।

বন ঘন হয়ে উঠেছিল উদ্ভিদের দ্রুত বিস্তারে। "পাখী নেই, ফুল নেই, মানুষ নেই, সৃষ্টির কোনো সৌন্দর্য্য নেই সেখানে, অথচ প্রতিদিন সুন্দর সোনার সূর্য্যাস্ত হচ্ছে, প্রতি রাত্রে রূপোলী চাঁদের আলোর ঢেউ আদিম অরণ্য আর জলার বুকে বেয়ে যাচ্ছে। দেখবার কেউ নেই, বুঝবার কেউ নেই। কতদিন পরে মানুষ আসবে, পৃথিবী যেন সেজন্যে উন্মুখী হয়ে আছে।"[১]

গহন বনের মাটি ও জলা থেকে উঠতো গরম বাষ্প। গাছগুলি মরে গেলে তাদের শরীর জলকাদায় পড়তো ও ক্রমে ডুবে যেত। এর ওপরে আরো গাছ গজাত, আর তারা মরে গেলেও এই পরিণতি হতো। এইভাবে গাছগুলি স্তরে স্তরে নেমে গিয়েছিল মাটির নিচে। সেখানে বাতাসের সংস্পর্শে না আসার জন্য এদের শরীর পচন থেকে রক্ষা পেল। পৃথিবী-পৃষ্ঠের পরিবর্তনে বা আন্দোলনে এর ওপরে প্রচণ্ড চাপ পড়তো : ভূপৃষ্ঠের চাপ, ভূগর্ভের তাপ ও কোটি-কোটি বছরের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মরা গাছগুলির শরীর কয়লায় রূপান্তরিত হলো। তাই, কয়লা বা কার্বনের নাম থেকেএই কল্পের নাম দেওয়া হয়েছে কার্বনিফেরাস।

কার্বনিফেরাস কল্পের বনে হলো প্রথম পক্ষযুক্ত পতঙ্গের আবির্ভাব। বড় আকারের বহু পতঙ্গ ছিল। এখন যে dragonfly দেখা যায়, সে সময় এই জাতীয় পতঙ্গ ছিল প্রায় ১৫ ইঞ্চি লম্বা ও ডানা ছড়ালে প্রায় ৩০ ইঞ্চি হতো (এখনকার ড্রাগনফ্লাই বস্তুত আদিম ধরনের পতঙ্গ, কারণ এরা ডানা মুড়তে পারে না)। অধিকাংশ পতঙ্গ ২ ইঞ্চির চেয়ে বড় ছিল; অনেকে এমনকি ৮ ইঞ্চির চেয়েও বড়। আরশোলাদের মধ্যে ছিল বিরাট বৈচিত্র্য—প্রায় ৮০০ রকমের আরশোলা; এক জাতীয় আরশোলা ৪ ইঞ্চি লম্বা ছিল। এছাড়া, আরো নানারকম পতঙ্গ ছিল যাদের আজ আর চোখে পড়ে না, যেমন ছয়-ডানাওয়ালা স্টেনোডিক্‌টিয়া। পতঙ্গদের মধ্যে অনেকে শিকার করে জীবনধারণ করত।

জলা-জঙ্গলে উভচরগুলির মধ্যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছিল। ইরিয়প্‌স জাতীয় প্রাণীগুলি বড় ব্যাঙাচির মতো; মাথা চওড়া ও চ্যাপ্টা ধরনের, লেজ ছোট। আর এক জাতীয় উভচরের ফুসফুস ও ফুলকা উভয়ই ছিল। ফুলকাগুলি ছিল শরীরের বাইরে ও মাথার পিছনে। সামনের পা এত ছোট যে সেগুলি তেমন কাজ দিত বলে মনে হয় না। পিছনে কোনো পা নেই বলে পিছন দিক ছিল সাপের মতো। আয়ারের কিলকেনি থেকে সাপের মতো উভচরের ফসিল পাওয়া গেছে এবং তাদের মধ্যে কোনো কোনো নিদর্শন প্রায় ৩ ফুট লম্বা।

উভচরের জীবনযাত্রায় এক বিশেষ সমস্যা ছিল। তার ডিমের খোসা

(membrane) শুকিয়ে গেলে ডিম নষ্ট হয়ে যায়। তাই, সে ডিম পাড়ে জলে বা খুব ভিজে জায়গায়। জলকে একেবারে বাদ দিয়ে সে বাঁচতে পারে না। অন্যান্য জলচর প্রাণীদের সঙ্গে বাস করতে হয় বলে উভচর-শাবকের বিপদ আছে এবং জলে খাদ্য সংগ্রহের সময় তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয়। ক্রম-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে কিছু উভচর প্রাণী সম্ভবত খুব আর্দ্র জায়গায় ডিম পাড়তে সমর্থ হলো। এই জাতীয় ডিমগুলির ওপরে শুষ্ক পরিবেশে থাকার উপযোগী আবরণ গড়ে উঠলো যাতে ভেতরের ভ্রূণ রক্ষা পায়। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন যে, সমুদ্র যখন পিছিয়ে যাচ্ছিল সেই সময় সম্ভবত কিছু উভচরের ডিম এমন ভাবে তৈরি হলো যাতে জল ছাড়া থাকলেও শুকিয়ে না যায়। ডিমগুলি ক্রমে ডাঙায় থাকার আরো উপযোগী হয়ে উঠলো। ডিমের মধ্যে ভ্রূণের খাবার (কুসুম) মজুত থাকে। তাই, তাকে জলে সাঁতার দিয়ে খাদ্য সন্ধান করতে হতো না বলে ভ্রূণের আর ব্যাঙাচির মতো আকৃতি নেওয়ার প্রয়োজন রইল না, তা স্বাভাবিক রূপে গড়ে উঠলো। এইভাবে যে প্রাণী উদ্ভূত হলো তার নাম সরীসৃপ।

সরীসৃপের ডিম শক্ত খোসায় ঢাকা। খোসার বাইরে থাকে চুন জাতীয় উপাদানে তৈরি আবরণ বা খোলা (shell)। শ্বাসকাজের জন্যে ছুটি স্তরের মধ্য দিয়ে বাইরের বাতাস থেকে কিছু গ্যাস বিনিময়ের কাজও চলে। আবরণ পুরু বলে ডিম শুকিয়ে যায় না এবং শক্ত মাটিতে থাকলেও তার আকৃতি নষ্ট হয় না। ডিমের মধ্যে ভ্রূণ গড়ে ওঠে সরীসৃপের ক্ষুদ্র সংস্করণ রূপে ; জন্ম সময় হতে তার ফুসফুস ও পা থাকে। ভ্রূণ অবস্থায় সে কুসুম থেকে খাদ্য গ্রহণ করে এবং বিশেষ ধরনের থলিতে (allantois) তার শরীরের বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন হয়। শুধু তাই নয়, তরল পদার্থে (amnion) পূর্ণ যে থলির মধ্যে ভ্রূণ মাছের মতো ভেসে বেড়ায় তা একে বাইরের ধাক্কা হতে রক্ষা করে।

জীবনধারণে এইসব সুবিধা হওয়ায় সরীসৃপের জলের কাছে থাকার দরকার রইল না। এরা ডাঙায় খাদ্য সন্ধানে অনেক দূর যেতে পারত। ফলে এদের বংশবিস্তার ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি দ্রুত হলো।

ডিমের এইসব বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখতে গিয়ে সরীসৃপের দেহ সেইভাবে গড়ে উঠলো। প্রথমত—খোলায় ঢাকা থাকে বলে ডিমগুলির পরিপুষ্টি খোলা তৈরির আগে হওয়া দরকার ; তাই, প্রজননের সময় (reproduction) সরীসৃপের গর্ভাধান হয় শরীরের মধ্যে (internal fertilization)। দ্বিতীয়ত—এদের ডিম মাছ বা উভচরের ডিমের চেয়ে বড় হয় বলে ডিমের মধ্যে উপাদান আরো বেশি থাকে। তাই এদের ডিমের সংখ্যা কম। ডিমের আকার বড় রাখতে গেলে সরীসৃপের ক্ষুদ্রাকৃতি হয়ে থাকা চলে না ; বস্তুত ক্ষুদ্রাকৃতি সরীসৃপ কম দেখা যায়।

উভচরের সঙ্গে সরীসৃপের কঙ্কালের তুলনা করলে বোঝা যায় যে, সরীসৃপের

দেহ ডাঙায় বসবাসের আরো উপযোগী হয়ে গড়ে উঠেছে। সরীসৃপের শরীরের কাঠামো এবং পিছনের পায়ের সংযোগ ব্যবস্থা আরো উন্নত। তাছাড়া, সরীসৃপের মস্তিষ্ক উভচরের তুলনায় বড়।

আদিম সরীসৃপের সঙ্গে ব্যাং বা স্যালামাণ্ডারের চেয়ে আদিম উভচর প্রাণীদের সাদৃশ্য বেশি ছিল বলে চোয়ালের গঠন ও করোটিতে কানের অবস্থিতি ইত্যাদি কয়েকটি বৈশিষ্ট্য থেকে ফসিলে সরীসৃপকে সনাক্ত করা হয়ে থাকে। প্রথমদিকে আবির্ভূত সরীসৃপদের এভাবে সনাক্ত করা সহজ নয়। কারণ এই দৈহিক পরিবর্তনগুলি একটু অস্পষ্ট ছিল। পরের দিকে পার্থক্য অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ক্যানাডার নেভোস্কোশিয়া থেকে কার্বনিফেরাস কল্পের সরীসৃপ প্রাণীর প্রথম নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। তাদের আকার ও গঠন ছিল গিরগিটি সদৃশ।

সেই যুগের উভচরের চেয়ে প্রথম সরীসৃপ কিন্তু ছোট। ছোট আকার হওয়ার কারণ হলো খাদ্য, চলাফেরা, প্রজনন ও জলবায়ু।

সরীসৃপের পূর্বপুরুষ যে উভচরেরা ডাঙায় বেশি সময় থাকার উপযোগী হয়ে উঠেছিল তাদের খাবার হিসেবে মাছের বদলে পোকামাকড় ধরতে হতো। জীবনধারণে ছোট ছোট কীট, পতঙ্গের ওপরে নির্ভর করতে হলে খাদকের দেহের আকার ছোট ও হালকা থাকলে শিকার ধরতে সুবিধা হয়, কারণ এরকম শিকারের জন্যে ক্ষিপ্রতার প্রয়োজন বেশি। সরু ফাটলে লুকিয়ে থাকা পোকামাকড় খুঁজে বের করতে অথবা লতাপাতার ওপর দিয়ে তাড়াতাড়ি চলতে গেলে শরীর ছোট ও হালকা হওয়া দরকার। তাই, প্রথমদিকে সরীসৃপগুলি ছিল নাতিদীর্ঘ।

ক্রমবিবর্তনে উভচরের ডিমে খোলা তৈরি হলে এই খোলা ও খোসার মধ্য দিয়ে গ্যাস বিনিময়ে সমস্যা দেখা দিল। এক্ষেত্রে ডিমের আয়তন ছোট থাকলে (এবং আয়তনের তুলনায় উপরিপৃষ্ঠ বিস্তৃত হলে) গ্যাস বিনিময়ে সুবিধা হতো। তাই মনে হয়, প্রথমদিকে আবির্ভূত সরীসৃপগুলির আকারের সঙ্গে ডিমও ছোট ছিল। পরবর্তীকালে, ডিমের মধ্যে ভ্রূণের প্রাণধারণের উপযোগী সব বৈশিষ্ট্য পূর্ণভাবে প্রকাশ পেলে ডিম বড় হয়ে ওঠে।

শরীরকে চালু রাখার জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তির উৎপত্তি হয় খাদ্য থেকে এবং খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে এন্‌জাইম। এন্‌জাইম সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে গেলে শরীরের তাপমাত্রা নির্দিষ্ট থাকা দরকার। স্তন্যপায়ীদের দেহের তাপমান নির্দিষ্ট থাকে। তাপমাত্রাকে নির্দিষ্ট রাখার অনেক ব্যবস্থা স্তন্যপায়ীদের দেহে আছে, যেমন ত্বকের ওপরে লোম ও নিচে মেদের (fat) স্তর। বেশি ঠাণ্ডায় লোম খাড়া হয়ে ওঠে, অথবা শরীরে কম্পন আরম্ভ হয় ও কম্পনের সময় পেশীর ক্রিয়া থেকে হয় তাপের উৎপত্তি। মেদ দেহকে বাইরের তাপমাত্রার পরিবর্তন থেকে রক্ষা করে। এছাড়া, রক্ত সংবহনতন্ত্রের (blood circulation) নিয়ন্ত্রণ তাপমান

নির্দিষ্ট রাখতে সহায়তা করে, যেমন বেশি ঠাণ্ডায় দেহের তাপমাত্রা কমে যেতে থাকলে ত্বকের কাছে রক্তপ্রবাহ কমে যায়, যাতে শরীর থেকে বেশি উত্তাপ আর বাইরে চলে যেতে না পারে। কিন্তু সরীসৃপের রক্তের উষ্ণতা সবসময় সমান থাকে না। তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্যে তারা বিভিন্ন উপায়ের সাহায্য নেয়—কখনো বেশি ঠাণ্ডা বা বেশি গরম থেকে বাঁচার জন্যে গর্তে থাকে, কখনো বা শরীর গরম করতে রোদ পোহায়। দেহ ছোট থাকলে সরীসৃপের পক্ষে এভাবে তাপ নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়।

রিপিডিস্টিয়ান মাছ ও উভচরের চোয়াল এমন যে, তারা শিকার ধরে কতকটা দরজার মতো ভাবে মুখ বন্ধ করতো। পোকামাকড় খাওয়ার উপযোগী হয়ে গড়ে ওঠার জন্যে সরীসৃপের চোয়ালে পরিবর্তন হলো। তার চোয়াল এমনভাবে তৈরি হলো যাতে দরজার মতো বন্ধ করার চেয়ে শিকারকে ধরে রাখা, চিবানো বা পিষে ফেলার কাজে তা সাহায্য করতে পারে। শিকারকে ধরে সরীসৃপ তার চোয়াল আশেপাশে নেড়ে তাকে বাগে আনে। আদিম সরীসৃপের মাথায় খুলি কিন্তু বেশি লম্বা নয়, যেমন ছিল আদিম উভচরের।

প্রথমে সব সরীসৃপ কীটভুক অর্থাৎ মাংসাশী ছিল। পরে উদ্ভিদভোজী সরীসৃপের আবির্ভাব হলো। উদ্ভিদভোজীদের আকার পরবর্তীকালে আরো বড় হয়ে ওঠে।

কার্বনিফেরাস কল্পের জলবাসীদের মধ্যে হাঙর সর্বপ্রধান। হাঙরদের সংখ্যা তখন খুব বৃদ্ধি পেয়েছিল।

উল্লেখ পঞ্জি

১. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্মৃতির রেখা' (২১ আগস্ট, ১৯২৫)।

৯

পার্মিয়ান কল্প

(২৮ থেকে ২২·৫ কোটি বছর আগে

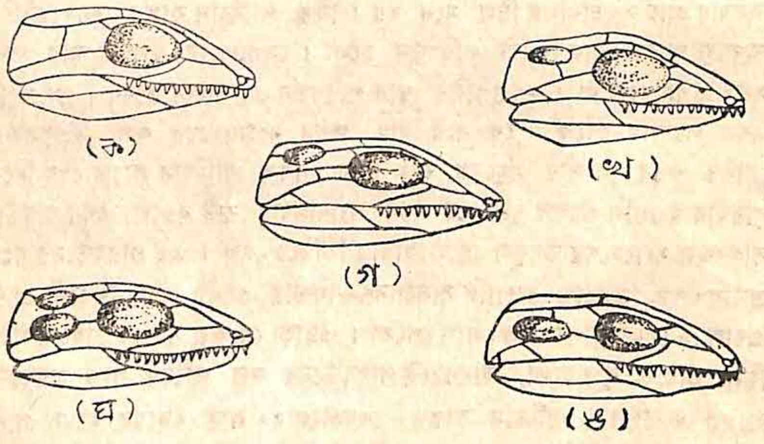
পৃথিবীর ভূখণ্ডগুলি পার্মিয়ান কল্পের মধ্যে এক হয়ে যে অতিবিশাল ভূভাগ প্যান্‌গিয়ার সৃষ্টি করেছিল সে বিষয়ে আগে আলোচনা হয়েছে। প্যান্‌গিয়ার পূর্বাংশে উষ্ণমণ্ডলে ছিল টেথিজ সাগর। বিষুবরেখা (equator) অঞ্চল দিয়ে সব সময় উষ্ণ সাগরজলের স্রোত পূব থেকে পশ্চিমগামী ছিল। সেজন্যে তখন সব ঋতুতে টেথিজ সাগরের প্রবাল-প্রাচীর (barrier reef) ও দ্বীপগুলিতে জলবায়ু প্রায় সমভাবাপন্ন ছিল মনে হয়। কিন্তু পার্মিয়ান কল্পের শেষে টেথিজ অঞ্চলে আবহাওয়ায় বিরাট পরিবর্তন হলো। সেখানকার জলবায়ু আর তেমন সমভাবাপন্ন রইল না। ভূখণ্ডগুলির স্থান পরিবর্তন এর প্রধান কারণ। ভূখণ্ডগুলি যখন পরস্পর থেকে দূরে সরে যায় তখন মহাসাগরের জল উপকূলভাগ প্লাবিত করে অগভীর সমুদ্রের সৃষ্টি করে। কিন্তু পার্মিয়ান কল্পের শেষ দিকে পৃথিবীর খণ্ডগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে যখন প্যানগিয়ার সৃষ্টি করলো তখন অগভীর সাগরজল মহাদেশের উপকূল ছেড়ে আবার পিছিয়ে গেল। এই পরিবর্তনের ফলে ব্র্যাকিওপড, ক্রিনয়েড ইত্যাদি সাসপেনশন-ফিডার প্রাণী এবং শিকারী প্রাণী প্রবাল ও সেফালোপড দ্রুত লোপ পেলো। এছাড়া যে অল্প সংখ্যক ট্রাইলোবাইট ছিল তারাও লুপ্ত হলো, কারণ এই পরিবর্তনের জন্য তাদের খাদ্য সরবরাহ ব্যাহত হয়েছিল। পার্মিয়ান কল্পের শেষভাগে ৫০ লক্ষ বছরের মধ্যে প্রাণী জগতের ইতিহাসে ঘটেছিল এই বিরাট বিপর্যয়।

স্থলভাগে পার্মিয়ান কল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো বীজযুক্ত গাছের আবির্ভাব। কর্ডাইট নামে এক রকম গাছের কাণ্ড মসৃণ এবং পাতাগুলি লম্বা ফিতের মতো ছিল। পাতাগুলির ফাঁকে থোকা থোকা বীজ। শুধু তাই নয়, তখন পাইন, ফার, স্প্রুস প্রভৃতির সমজাতীয় 'কনিফার' গাছও যে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

পুরাজীবীয় অধিকল্পের শেষে উভচরের প্রাধান্য হ্রাস পেয়েছিল—ঐ সময় থেকে সরীসৃপ যুগের সূচনা। পার্মিয়ান এবং পরবর্তী ট্রায়াসিক কল্পে নানা রকম সরীসৃপের উদ্ভব হয়েছিল।

সরীসৃপের শ্রেণীবিভাগ করায় সময় জীববিজ্ঞানীরা এক বিশেষ উপায়ের সাহায্য নিয়ে থাকেন। অনেক সরীসৃপের করোটির পিছনে ওপর দিকে কোটর বা

গর্ত (opening) থাকে। এই জায়গাগুলিতে হাড় এমনভাবে বাঁকানো (arches of bone) যে গর্তের মতো দেখায়। চোয়াল নাড়াবার জন্যে বা ঘাড়ের ওপরে মাথা নাড়াবার সময় যে পেশীগুলি কাজ করে তারা এই জায়গায় যুক্ত হয়ে আছে। করোটির কোন জায়গায় এরকম গর্ত আছে, সেই ভিত্তিতে সরীসৃপের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। যাদের করোটিতে এরকম কোনো গর্ত নেই, তাদের অ্যানাপ্‌সিড বলে (যেমন কচ্ছপ)। যাদের করোটিতে দুই পাশে চোখের পিছনে ওপর দিকে একটি করে গর্ত ছিল তাদের নাম প্যারাপ্‌সিড (যেমন ইক্‌থিওসর)। যেসব সরীসৃপের মাথার কোটর ওপরে না হয়ে করোটির পাশের দিকে ছিল, তাদের সাইন্যাপ্‌সিড নাম দেওয়া হয়েছে (পেলিকোসর ও থেরাপ্‌সিড)। আর যাদের করোটির দুই পাশে এক জোড়া করে (অক্ষিকোটরের পিছনে ওপরে ও নিচে) গর্ত থাকে, তাদের নাম রাখা হয়েছে ডায়াপ্‌সিড (যেমন থেকোডন্ট, ডাইনোসর, কুমির, গিরগিটি ও সাপ)।



সরীসৃপের করোটি : ক) অ্যানাপ্‌সিড (কটিলোসর); খ) ইউরিযাপ্‌সিড (প্লিসিওসর); গ) প্যারাপ্‌সিড (ইক্‌থিওসর); ঘ) ডায়াপ্‌সিড (ডাইনোসর); ঙ) সাইন্যাপ্‌সিড (স্তন্যপায়ী-সদৃশ সরীসৃপ)

প্রাচীন সরীসৃপের মধ্যে অনেক বর্গ ছিল। তার মধ্যে কয়েকটি বর্গের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো :

ক) Cotylosauria : এরা অ্যানাপ্‌সিড এবং অতি প্রাচীন সরীসৃপ। পা-গুলি দু'পাশে বেশি ছড়ানো। কার্বনিফেরাস কল্পে এদের উদ্ভব এবং এরা ট্রায়াসিক পর্যন্ত জীবিত ছিল।

খ) Chelonia : কচ্ছপ ও তার পূর্বপুরুষ এই বর্গের অন্তর্গত। এরা

অ্যানাপ্‌সিড এবং কটিলোসরের নিকট আত্মীয়। পার্মিয়ান থেকে ট্রায়াসিক কল্পের মধ্যে এই বর্গের উদ্ভব। ট্রায়াসিক কল্পের শেষে এদের মধ্যে এক জাতির কচ্ছপ সমুদ্রে গেল।

গ) Ichthyosauria : ট্রায়াসিক থেকে ক্রিটেশাস কল্প-পর্যন্ত এরা জীবিত ছিল। এই জলবাসী সরীসৃপের আকার শুশুকের (dolphin) মতো।

ঘ) Sauropterygia : এরা ইক্‌থিওসরের সমসাময়িক। এদের করোটিতে কোটরের অবস্থিতি ইক্‌থিওসরের থেকে একটু আলাদা ছিল এবং এদের ইউরিয়াপ্‌সিড বলা হয়ে থাকে। জলবাসী প্লিসিওসর এর মধ্যে অন্যতম।

ঙ) Protorosauria : এদের করোটিতেও চোখের পিছনে কোটর ছিল। কতকটা গিরগিটির মতো এই প্রাণীগুলি আকারে ছোট এবং ডাঙায় থাকত। এরা পার্মিয়ান ও ট্রায়াসিক কল্পে বাস করত।

চ) Thecodontia : ট্রায়াসিক কল্পে থেকোডণ্টের আবির্ভাব। এরা ডাইনোসর ও কুমিরের পূর্বপুরুষ। থেকোডণ্ট, ডাইনোসর ও কুমিরের সাধারণ নাম আর্কোসর।

ছ) Eosuchia : ছোট আকারের এই সরীসৃপগুলির করোটির দুই পাশে এক জোড়া করে কোটর ছিল। এরা বাস করতো পার্মিয়ান ও ট্রায়াসিক কল্পে।

জ) Squamata : এরা ইওসুকিয়ার জ্ঞাতি ; গিরগিটি ও সাপ এই বর্গের অন্তর্গত। ট্রায়াসিক কল্পে গিরগিটির পূর্বপুরুষের আবির্ভাব। আর গিরগিটি থেকে হয়েছিল সাপের উদ্ভব। মনে হয়, জুরাসিক কল্পে সাপের আবির্ভাব হয়েছিল। ইয়োরোপের বলকান অঞ্চলে ক্রিটেশাস কল্পের সাপের নিদর্শন (Pachyophis) আবিষ্কৃত হয়েছে।

ঝ) Pelycosauria : পেলিকোসরকে স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীসৃপ বলা হয়। এরা কার্বনিফেরাস ও পার্মিয়ান কল্পে জীবিত ছিল।

ঞ) Therapsida : সম্ভবত পেলিকোসর থেকে পামিয়ান কল্পে এই স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীসৃপের উদ্ভব হয়েছিল। ট্রায়াসিক কল্পে এরা বাস করতো।

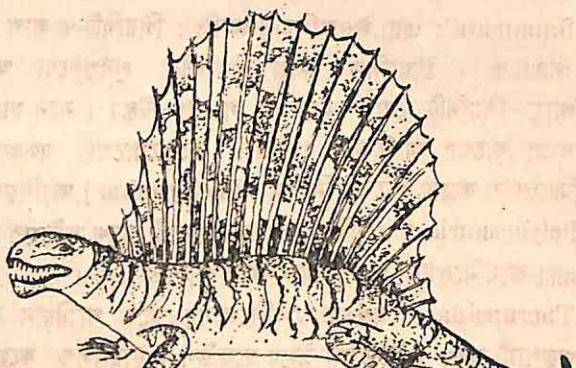
আদিম জলবাসী সরীসৃপগুলির মধ্যে মেসোসরের উদ্ভব আগে হয়েছিল। তারা সম্ভবত স্বাদু জলের বাসিন্দা ছিল ও মাছ খেত। তাদের আকার ছোট, গলা লম্বা, মুখে ধারালো দাঁত এবং পায়ের পাতা নৌকোর দাঁড়ের মতো। দক্ষিণ আফ্রিকা ও ব্রাজিল থেকে তাদের ফসিল পাওয়া গেছে।

পার্মিয়ান কল্পে নিরামিষভোজী সরীসৃপও ছিল। তাদের শরীর ভারি এবং

পেষকদণ্ড চ্যাপ্টা যাতে শক্ত গাছ খেতে পারে। আদিম সরীসৃপ থেকে তাদের উদ্ভব কিভাবে হয়েছিল তা এখনো জানা যায়নি।

পেলিকোসর বর্গের মধ্যে কেউ ছিল নিরামিষভোজী, কেউ মাংসাশী। ইডাফোসরাস নিরামিষাশী; লেজ সুদ্ধ এরা প্রায় ১১ ফুট লম্বা। আর মাংসাশী ডাইমেট্রোডনও দৈর্ঘ্যে প্রায় সমান। মাংসাশী সরীসৃপের দাঁতগুলি বিভিন্ন কাজের উপযোগী হয়ে ওঠার জন্যে বিভিন্ন আকার নিল; যেমন স্তন্যপায়ী পশুদের থাকে কর্তক দন্ত (incisor), ছেদক দন্ত (canine) ও পেষক দন্ত (molar)।

ডাইমেট্রোডন এবং ইডাফোসরাসের মেরুদণ্ড থেকে বড় বড় হাড় পিঠ বরাবর ওপর দিকে উঁচু হয়ে ছিল। হাড়গুলি এমনভাবে সাজানো এবং চামড়া দিয়ে ঢাকা যে নৌকোর পালের মতো দেখাত। এই পালের মতো অংশ তাদের শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করত বলে অনেক পণ্ডিতের বিশ্বাস। আকারে বড় হওয়ায় তারা নিজেদের গরম ও ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা করার জন্যে লুকিয়ে থাকতে পারত না। তাই মনে হয়, শরীর থেকে অতিরিক্ত তাপ বের করে দেওয়া অথবা রোদ পোহানোর মধ্য দিয়ে শরীর গরম করার কাজে এই অংশের একটা ভূমিকা ছিল। কেউ কেউ মনে করেন যে, তারা রাত্রিবেলায় এই পালের মতো অঙ্গে রক্ত সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে দেহকে বাইরের ঠাণ্ডা থেকে গরম করে রাখত। সম্ভবত এইভাবে দেহের তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আনতে পারার ফলে পেলিকোসরগুলির পক্ষে শিকার ধরার জন্যে শরীর চালু রাখা বা খাদ্য পরিপাকের কাজ আরো সহজ হয়েছিল।



পেলিকোসর

পার্মিয়ান কল্পের শেষভাগে থেরাপ্‌সিডের আবির্ভাব। এদের উদ্ভব হয়েছিল মাংসাশী পেলিকোসর থেকে। অল্পকালের মধ্যে এরা মাংসাশী ও নিরামিষভোজী —দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এদের বিভিন্ন কাজের উপযোগী কর্তক, ছেদক ও পেষক দন্ত ছিল। শ্বাস নেওয়ার পথ কিন্তু মুখগহ্বর থেকে পৃথক। তাই, এরা

খাবার চিবানোর কালেও শ্বাস নিতে পারত যা অধিকাংশ সরীসৃপের পক্ষে সম্ভব নয়। খাদ্য গ্রহণের সঙ্গে শ্বাসকাজ চালানো—দেহের এই যে বিবর্তন, তা পরবর্তীকালে আরো অনেকটা উন্নত স্তরে উঠলে শিশু স্তন্যপানে সমর্থ হয়। স্তন্যপায়ীদের নিচের চোয়ালে শুধু একটি হাড় থাকে, যার ওপরে দাঁত গজায় (dentary bone) ; থেরাপ্‌সিডের নিচের চোয়াল ঐরকম না হলেও তাতে সব হাড়ের মধ্যে এই 'ডেণ্টারি বোন' যে প্রধান হয়ে উঠেছিল, সেকথা অস্বীকার করা যায় না। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানীরা এই সরীসৃপের মুখের হাড়ে (snout) ছোট ছোট গুটি (follicle) দেখতে পেয়েছেন যা থেকে মনে হয়, সে জায়গায় গোঁফের মতো চুল (whisker) ছিল। এদের গায়েও হয়তো কিছু লোম ছিল।

কিরকম প্রাকৃতিক পরিবেশে পার্মিয়ান কল্পের জীবজন্তু বাস করত, তার কিছু নিদর্শন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখান থেকে চার রকমের প্রাকৃতিক পরিবেশের কথা জানা যায়, যেখানে বাস করত ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী—

ক) নদী ও হ্রদে ছিল হাঙর, ফুসফুস মাছ, রিপিডিস্টিয়ান এবং অন্যান্য অস্থিযুক্ত মাছ, আর জলবাসী উভচর।

খ) জলাভূমিতে থাকত ফুসফুস মাছ ও সেই সব উভচর, যারা আরো বেশি সময় ডাঙায় চলাফেরা করতে পারে।

গ) নিম্নভূমিতে যেখানে ঘন গাছপালা জন্মাত, সেখানে ছিল ইডাফোসরাসের মতো নিরামিষভোজী বড় বড় সরীসৃপ এবং তাদের শিকার করে খেত ডাইমেট্রোডনের মতো মাংসাশী প্রাণী। জল থেকে দূরে ছিল বলে তাপমাত্রার বেশি পরিবর্তন হওয়ায়, এরা নিজেদের পিঠে সেই পালের মতো অংশ দিয়ে সম্ভবত আত্মরক্ষা করত।

ঘ) ডাঙার আরো ভেতরে বনের মধ্যে পোকামাকড় খেত ছোট বড় নানা রকম সরীসৃপ, আর পোকামাকড়গুলির খাবার ছিল গাছপালা।

পুরাজীবীয় অধিকল্পের শেষ দিকে ভূত্বকে প্রচণ্ড আলোড়ন হতে থাকে। বড় বড় পর্বত ও মালভূমি মাথা তুলে দাঁড়ায়। এইভাবে ঘটে পুরাজীবীয় অধিকল্পের পরিসমাপ্তি।

১০

ট্রায়াসিক কল্প

(২২·৫ থেকে ১৮ কোটি বছর আগে)

পার্মিয়ান কল্পের শেষভাগে স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীসৃপের বৈচিত্র্য অর্থাৎ genus বা গণ-এর সংখ্যা অন্যান্য সরীসৃপের ১০ গুণের চেয়েও বেশি ছিল। কিন্তু ট্রায়াসিক কল্পের মধ্যে অন্যান্য সরীসৃপের বৈচিত্র্য অনেক বৃদ্ধি পায় এবং স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীসৃপের বৈচিত্র্য আশ্চর্য রকম কমে যায়। বস্তুত, ট্রায়াসিক কল্পের প্রায় শেষ দিকে স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ীদের মধ্যে গণ-এর সংখ্যা যা ছিল, অন্যান্য সরীসৃপের বৈচিত্র্য তার প্রায় ৫ গুণে এসে দাঁড়ায়। এই বিরাট পরিবর্তনের জন্যে দুটি কারণ দায়ী—জলবায়ু ও দেহবৈশিষ্ট্য। সম্ভবত এই দুয়ের সম্মিলিত প্রভাবে পরিবর্তন ঘটেছিল।

ইংল্যাণ্ডের পামেলা রবিনসন (Pamela Robinson) বলেছেন যে, ট্রায়াসিক কল্পের উষ্ণ ও শুষ্ক জলবায়ুর সঙ্গে গিরগিটির মতো সরীসৃপগুলি নিজেদের ভালোভাবে মানিয়ে নিতে পেরেছিল ; অপর পক্ষে, পার্মিয়ান কল্পের অপেক্ষাকৃত সহনশীল ও আর্দ্র জলবায়ু ছিল স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীসৃপের পক্ষে সুবিধাজনক। কিন্তু এই ব্যাখ্যা কোনো কোনো সরীসৃপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও সর্বত্র এ থেকে উত্তর মেলে না। পেলিকোসর প্রভৃতি স্তন্যপায়ীসদৃশ সরীসৃপগুলি দেহের তাপমান কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারত ; তবে, এই সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তারা কেন লোপ পেল ? সেজন্যে জলবায়ুগত কারণকে একমাত্র ব্যাখ্যা বলে ধরা যেতে পারে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রবার্ট ব্যাকার (Robert Bakker) বলেন, স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীসৃপের পা-গুলি শরীর থেকে দুই পাশের দিকে কিছুটা বেরিয়ে থাকত। তাই হাত-পা ছড়িয়ে হামাগুলি দেওয়ার মতো করে চলত, যাকে sprawling বলে। অর্থাৎ তারা দ্রুত চলাফেরা করতেপারত না; তাদের চলা ছিল জবুথবুভাবে যেমন উভচর প্রাণীর মধ্যে দেখা যায়। এরকম পা আজও যে প্রাণীদের আছে, তাদের দেহের তাপমাত্রা কম এবং জীবনধারণের গতি মন্থর। আর যেসব সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ীর পা যত ঋজু, তারা তত সক্রিয়। কুমির ও ডাইনোসরের পূর্বপুরুষ থেকোডণ্ট নামে যে সরীসৃপের উদ্ভব ট্রায়াসিক কল্পে হয়েছিল, তাদের পা-গুলি আরো ঋজু বলে তারা অনেক দ্রুতগামী। বর্তমান যুগের প্রাণীদের মধ্যেও দেখা যায়, যাদের পা ঋজু তাদের সক্রিয়তা, গতি ও দেহের তাপমাত্রা বেশি (যেমন, উষ্ণমণ্ডলে monitor বা গো-সাপ জাতীয় সরীসৃপের পা বেশ ঋজু ও তারা শিকারের কাজে সক্রিয়, এবং তাদের দেহের তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড

যা অনেক স্তন্যপায়ী জীবের সঙ্গে তুলনীয়)। থেকোডন্টের পায়ের গড়ন ছিল অনেকটা গো-সাপ জাতীয় সরীসৃপের মতো ; তবে পা-গুলি লম্বা থাকায় মনে হয় তারা আরো চটপটে। এইসব কারণে থেকোডন্টের কাছে স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীসৃপ জীবনযুদ্ধে পরাস্ত হলো যদিও স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীসৃপদের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি হতে লক্ষ-লক্ষ বছর সময় লেগেছিল।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের বিবর্তনের ইতিহাসে ট্রায়াসিক কল্পে হলো নতুন অধ্যায়ের স্বচনা। সমুদ্রবাসী সরীসৃপ ইক্‌থিওসর ও প্লিসিওসরের জন্ম হলো। থেকোডন্টের আবির্ভাব আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। খেচর সরীসৃপের উদ্ভব হলো এবং স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীসৃপ থেকে জন্ম নিল স্তন্যপায়ী জীব।

থেকোডন্টের আবির্ভাব ট্রায়াসিক কল্পের প্রথম দিকে । এরা মাংসাশী। থেকোডন্ট শব্দের অর্থ 'tooth-in-socket', কারণ এদের দাঁতগুলি কোটরে যুক্ত ছিল । যদিও এরা চতুষ্পদী, তবে এদের মধ্যে কোনো কোনো জাতীয় প্রাণী শুধু পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দৌড়াতে পারত এবং এদের পিছনের পা সামনের পায়ের চেয়ে লম্বা ও মজবুত । এদের মধ্যে ইউপারকেরিয়া প্রায় ৫ ফুট লম্বা, শরীর হালকা, এবং দৌড়াবার সময় লম্বা লেজ দিয়ে দেহের ভারসাম্য বজায় রাখত ; এর মুখে ছিল ধারালো দাঁতের সারি।

পরবর্তী যুগের কোনো কোনো জাতীয় থেকোডন্টের পিছনের পা আরো লম্বা, যা থেকে মনে হয় তারা অনেকটা সময় দু'পায়ে চলাফেরা করত । এদের মধ্যে সল্টোপোস্থকাস অন্যতম। তার সামনের দুটি পা অনেক ছোট, আর তা হাতের মতো কাজ করত বলে মনে হয়। শুধু তাই নয়, থেকোডন্ট জাতীয় সরীসৃপের পা-গুলি শরীরের অনেকটা সরাসরি নিচে থাকায় দৌড়ানো আরো সহজ হয়েছিল।

সরীসৃপগুলির মধ্যে সকলে কিন্তু দ্বিপদী নয় ; কেননা ম্যান্ডাস্থকাস, ডেস্‌ম্যাটোস্থকাস ও ফাইটোসর চলাফেরা করত চার পায়ে। তবে, ফাইটোসরের সামনের পা পিছনের পায়ের চেয়ে ছোট। শিকারী প্রাণী ফাইটোসর দেখতে অনেকটা কুমিরের মতো ছিল। তারা নদী ও হ্রদে থাকত, আর জলে শরীর ডুবিয়ে রেখে শ্বাস নিত বাতাস থেকে,যেমন কুমির করে। কিন্তু কুমিরের নাসারন্ধ্র যেমন লম্বা মুখের (snout) প্রান্তে থাকে,ফাইটোসরের নাসারন্ধ্র ছিল মাথার ওপর দিকে। কোনো কোনো ফাইটোসর দৈর্ঘ্যে প্রায় ২৫ ফুট।

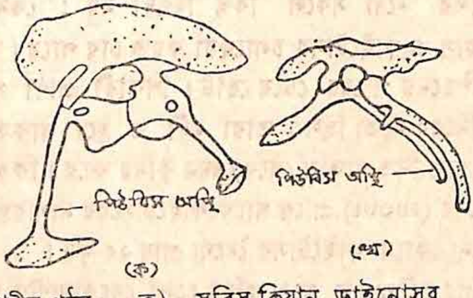
বর্তমান যুগের সরীসৃপের মধ্যে কুমির হলো থেকোডন্টের আত্মীয় । কুমিরের আবির্ভাব সম্ভবত জুরাসিক কল্পের গোড়ায় হয়েছিল । প্রথম যুগে এদের পা ডাঙায় চলাফেরার জন্যে অনেকটা সিধা ছিল মনে হয়। পরবর্তীকালে এদের শরীর জলবাসের আরো উপযোগী হয়ে ওঠে। আজও দেখা যায়, ডাঙায় কুমির জোরে দৌড়ালে তার পা অনেক সিধা হয়ে ওঠে এবং আর একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায়

যে চার পায়ে চললেও তার পিছনের পা সামনের পায়ের চেয়ে একটু বড়। সম্ভবত থেকোডণ্ট জাতীয় কোনো পূর্বপুরুষ থেকে এই বৈশিষ্ট্য কুমিরের মধ্যে এসেছে।

থেকোডণ্ট হতে যেমন কুমির ও খেচর সরীসৃপের উদ্ভব, তেমন দুই জাতীয় ডাইনোসরের উদ্ভব হয়েছিল থেকোডণ্ট হতে; এদের নাম সরিস্‌কিয়ান এবং অর্নিথিস্‌কিয়ান। এই দু-জাতীয় ডাইনোসরের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিপদী, কেউবা চতুষ্পদী। ট্রায়াসিক কল্পের শেষ পর্যায়ে ডাইনোসরের আবির্ভাব। প্রথম দিকের ডাইনোসর অনেকটা তাদের পূর্বপুরুষ থেকোডণ্ট সদৃশ ছিল; তাদের কাঠামো হালকা এবং পিছনের পায়ে ভর করে দৌড়াবার সময় লম্বা ও দৃঢ় লেজ শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখত। তবে, তাদের পা-গুলি অনেকটা সোজা ভাবে শরীরের ভার বহন করত– এদিক থেকে ডাইনোসরের দেহের গঠন থেকোডণ্টের চেয়ে উন্নততর।

পৃথিবীর বুকে প্রায় ১৩·৫ কোটি বছর ধরে ডাইনোসর রাজত্ব করেছিল। তাদের এই নাম দিয়েছিলেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার রিচার্ড ওয়েন (Sir Richard Owen)। গ্রীক 'deinos' শব্দের অর্থ 'ভয়ংকর', আর 'sauros' শব্দের অর্থ 'lizard' বা গিরগিটির মতো সরীসৃপ।

সরিস্‌কিয়ান এবং অর্নিথিস্‌কিয়ানের মধ্যে প্রধান পার্থক্য ছিল শ্রোণীর গঠনে। সরিস্‌কিয়ানদের শ্রোণীর অস্থি (illium, ischium ও pubis) এমন ভাবে ছড়িয়ে সাজানো যে, নিতম্বের কাঠামো (hip structure) ত্রিকোণাকার (একে বলে triradiate arrangement of bones) ছিল, যেমন কুমির প্রভৃতি সরীসৃপের হয়। এদের কঙ্কালে দেখা যায় যে, নিতম্বের মধ্যবর্তী পিউবিস অস্থিটি নিচের দিকে বিস্তৃত হয়ে সামনে এগিয়ে আছে। অপরপক্ষে, অর্নিথিস্‌কিয়ানদের



শ্রোণীর গঠন: ক) সরিস্‌কিয়ান্ ডাইনোসর
খ) অর্নিথিস্‌কিয়ান্ ডাইনোসর

শ্রোণীর অস্থিগুলি এমনভাবে সাজানো যে নিতম্বের কাঠামো চৌকো ধরনের (quadriradiate arrangement of bones) ছিল, যেমন পাখিদের হয় এবং পিউবিস অস্থি নিচের দিকে বিস্তৃত হয়ে পিছনে চলে গেছে।

করোটির গঠনেও সরিস্‌কিয়ান এবং অর্নিথিসকিয়ানের মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয় ; মাংসাশী সরিস্‌কিয়ানের দন্তকোটর বরাবর যদি একটা কাল্পনিক রেখা টানা যায়, তবে দেখা যাবে তা চোয়ালের সন্ধিস্থল (hinge) পর্যন্ত প্রসারিত। সেজন্যে এরা যখন মুখ বন্ধ করত তখন ওপর ও নিচের পাটির দাঁতগুলি কাঁচির ফলার মতো একটির পাশে একটি হড়কে যেত। কিন্তু অর্নিথিসকিয়ান ডাইনোসরের ক্ষেত্রে চোয়ালের সন্ধিস্থল সেই কাল্পনিক রেখার নিচে এবং সেজন্যে মুখ বন্ধ করার সময় এদের দাঁতগুলি পরস্পর আটকে যেত।

সরিস্‌কিয়ান ডাইনোসরের মধ্যে দুটি ভাগ—থেরোপড ও সরোপড। থেরোপড শব্দের অর্থ 'beast-footed', কারণ এদের পায়ের পাতা পশুর মতো। ট্রায়াসিক কল্পের শেষভাগে উত্তর আমেরিকার কোনো কোনো থেরোপড দৈর্ঘ্যে ছিল প্রায় ৮ ফুট। অনেক থেরোপডের মাথা ও চোয়াল বড় এবং মুখে ধারালো দাঁত। এদের জীবনযাত্রা অনেকটা থেকোডন্টের মতো ছিল মনে হয়। থেরোপডের পিছনের পা অনেক লম্বা ও শুধু তাতে ভর দিয়ে দৌড়াতে পারত। এই মাংসাশী প্রাণীগুলির পা দীর্ঘ নখর সংযুক্ত। জুরাসিক ও ক্রিটেশাস কল্পের বিরাটাকার থেরোপডের মধ্যে অ্যালোসরাস্ এবং টাইরানোসরাসের নাম উল্লেখযোগ্য। চোয়ালের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখে কোনো কোনো বিজ্ঞানী মনে করেন, এরা মাংসের বড় বড় টুকরোকে বেশি না চিবিয়ে গিলে ফেলত, যেমন কুমির করে থাকে। কুমিরের পাকস্থলির মধ্যে যে পাথর থাকে তা খাদ্যকে পেষণের মাধ্যমে মন্থন করে। কোনো কোনো ডাইনোসরের পাকস্থলিতেও যে এইরকম পাথর (gastrolith) ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। থেরোপডের মধ্যে আর এক রকম



ওভির্যাপটর

ডাইনোসর ছিল ছোট ও হালকা এবং দেখতে অনেকটা উটপাখির মতো দীর্ঘ গ্রীবাযুক্ত ; এদের সাধারণভাবে 'উটপাখি ডাইনোসর' বলে। এই প্রাণীগুলিরও

পিছনের পা লম্বা ও সামনের পা ছোট। এদের মধ্যে অর্নিথোলেস্টেস এবং ওভিরযাপটর অন্যতম। কোনো কোনো পণ্ডিত থেরোপডের মধ্যে দুটি প্রধানভাগের নাম করেছেন – কার্নোসর (যার মধ্যে আছে বিশালাকার অ্যালোসরাস, মেগালোসরাস, টাইরানোসরাস প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণী) এবং সিলুরোসর। সিলুরোসরগুলি আকারে অনেক ছোট এবং অনেক দ্রুতগামী মনে হয় ; এদের গলা আরো লম্বা । এদের মধ্যে ডাইনোনিকাস নামে প্রাণীটির মস্তিষ্ক অন্যান্য ডাইনোসরের তুলনায় বেশ বড় এবং তা ছিল শরীরের ১০০ ভাগের এক ভাগ । আবার অর্নিথোমিমাস বলে একরকম সিলুরোসর ছিল, যার মুখ সূক্ষ্মাগ্র চঞ্চুর মতো।

সরোপড ডাইনোসরের মধ্যে অধিকাংশ নিরামিষভোজী ; এদের চ্যাপ্টা ধরনের দাঁত থেকে একথা প্রমাণিত হয়। সরোপড শব্দের অর্থ 'lizard-footed', কারণ এদের পায়ের পাতা ও নখ গিরগিটি জাতীয় সরীসৃপের মতো । মধ্য-ট্রায়াসিক কল্পের আদিম সরোপড মেলানোসরাসের ফসিল দক্ষিণ আফ্রিকায় আবিষ্কৃত হয়েছে। সরোপডের মাথা ক্ষুদ্র হলেও, গ্রীবা ও লেজ দীর্ঘ। যদিও এরা সব সময় চার-পায়ে চলাফেরা করত ; তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিছনের পা সামনের পায়ের চেয়ে লম্বা ও মজবুত। পায়ের হাড় খুব পুরু। মেরুদণ্ডের অস্থি-সন্ধিগুলি ছিল হালকা কিন্তু দৃঢ়। পরবর্তী কল্পে (জুরাসিক) সরোপডেরা অতি বিশাল আকার ধারণ করে। কোলবার্ট (Colbert) মনে করেন, বাসস্থান ও খাদ্যের প্রাচুর্যই এর মূল কারণ। জুরাসিক কল্প সরোপড রাজত্বের শ্রেষ্ঠ সময় (তবে ক্রিটেশাস কল্পেও যে এদের অস্তিত্ব ছিল তার প্রমাণ দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে পাওয়া গেছে)। ডিপ্লোডকাস, ব্র্যাকিওসরাস, ব্রন্টোসরাস প্রভৃতি ডাইনোসরের মতো বিশাল স্থলচর প্রাণী পৃথিবীতে কখনো জন্মায় নি । কোনো কোনো বিজ্ঞানী সরোপডের মধ্যে দুটি প্রধান ভাগের নাম করেছেন – অ্যাটলান্টোসর (যেমন ডিপ্লোডকাস) এবং ক্যামারোসর। এদের পায়ের গঠনে পার্থক্য ছিল, যার ভিত্তিতে এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে।

ট্রায়াসিক কল্পের অর্নিথিস্কিয়ানের ফসিল বেশি আবিষ্কৃত হয়নি। সরো-পডের মতো বিশাল আয়তন এদের না থাকলেও নিরামিষভোজী ডাইনোসর রূপে এরা জীবনসংগ্রামে সবচেয়ে সফল এবং ক্রিটেশাস কল্পের শেষ পর্যন্ত বেঁচে ছিল । ফ্যাব্রোসরাস নামে ট্রায়াসিক কল্পের একরকম অর্নিথিস্কিয়ান পিছনের বড় বড় পায়ে ভর দিয়ে চলতো এবং সে সম্ভবত সর্বভুক ছিল ; তার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫ ফুট। জুরাসিক কল্পে অর্নিথিস্কিয়ানদের চোয়ালে ও দাঁতে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির ফলে নিরামিষ খাদ্য গ্রহণে আরো সুবিধা হলো। এদের চোয়াল ক্রমে বড় হলো এবং দাঁতগুলির বাইরের দিকে অনেকটা জায়গা নিয়ে তৈরি হলো গালের থলি অথবা এক আশ্চর্য খাদ্যভাণ্ডার, যার মধ্যে খাবার ভরে রেখে তাকে

পুনঃ চর্বণ করা যেত। দাঁতের উপরিপৃষ্ঠ প্রশস্ত থাকায় খাদ্য পেষণ সহজ ছিল। অর্নিথিস্কিয়ানের মধ্যে নানা বৈচিত্র্য। এক জাতীয় ডাইনোসরের নাম ছিল অর্নিথোপড। ঐ শব্দের অর্থ 'bird-footed', কারণ এদের পায়ের পাতা পাখির মতো; এর মধ্যে অন্যতম হলো ইগুয়ানোডন। এরা পিছনের পায়ে ভর দিয়ে চলতো। বিবর্তনের এই ধারায় এক রকম ডাইনোসরের উদ্ভব হয়, যাদের মুখ হংসচঞ্চুর মতো।

পরবর্তীকালে আর এক ধরনের অর্নিথিস্কিয়ানের আকার বৃদ্ধি পায় এবং তারা চতুষ্পদী হয় এবং পিঠের উপরে বর্ম গড়ে ওঠে। তাদের নাম অ্যাংকিলোসর। আর স্টিগোসরের মেরুদণ্ড বরাবর তৈরি হয় কাঁটার বড় বড় প্লেট। ক্রিটেশাস কল্পে আবির্ভূত হয় শিংওয়ালা ডাইনোসর বা সেরাটপ্‌সিয়ান। এদের মুখের প্রান্তভাগ চঞ্চুর মতো বক্র, মাথায় এক বা একাধিক শৃঙ্গ এবং ঘাড়ে 'কলার' বা 'ফ্রিল'। ট্রাইসেরাটপ্‌স্‌ এদের মধ্যে অন্যতম। অর্নিথিস্কিয়ানদের মধ্যে আরো কয়েক রকম ডাইনোসর ছিল, যাদের মাথায় চূড়া বা ঝুঁটির মতো অংশ দেখা যেত; নাক ও কপালের হাড় থেকে এই অংশ গঠিত। এই জাতির মধ্যে প্যারাসরোলোফাস ছিল লম্বায় ১২ ফুট ও তার মাথার চূড়াটি পিছনে বাঁকানো। কোরিথোসরাসের মাথায় ছিল মোরগঝুঁটির মতো অংশ। কোনো কোনো বিজ্ঞানী মনে করেন, এই চূড়া বা ঝুঁটির আকার পুরুষ, স্ত্রী ও শিশু বিশেষে বিভিন্ন ছিল। আবার, প্যাকিসেফালোসর নামে একরকম অর্নিথিস্কিয়ান ছিল যাদের করোটির হাড় খুব বেশি পুরু।

ডাইনোসর যে বিভিন্ন জলবায়ুতে বাস করত, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। শুধু আমেরিকায় নয়, মঙ্গোলিয়ার মরুভূমি, আফ্রিকার বিস্তীর্ণ সমভূমি, ইয়োরোপের অরণ্যে এবং ভারতবর্ষেও এদের ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে।

অতি বিশাল সরোপডেরা কিরকম প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করত, সে বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। এতদিন পর্যন্ত এদের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছে এরা ডাঙায় নিজেদের ভারি শরীর বেশি দূর বয়ে নিয়ে যেতে পারতো না, তাই জলায় বা হ্রদে থাকত; এদের পা-গুলি শরীর থেকে পাশের দিকে বেরিয়ে থাকত বলে অত ভারি শরীর নিয়ে ডাঙায় বেশি দূর যেতে এরা অক্ষম। তাই, এরা জলে শরীর ডুবিয়ে লম্বা গলা ও মুখ বের করে রাখতো। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে কোনো কোনো পণ্ডিত এদের দেহ পরীক্ষা করে বলেছেন, এদের পক্ষে জলের নিচে শরীর ডুবিয়ে শুধু মুখ বের করে শ্বাস নেওয়া সম্ভব নয়, কারণ ৩০ ফুটের মতো গভীর জলের নিচে শ্বাসকাজ চালাবার জন্যে বুকের খাঁচা কাজ করতে পারে না। কেউ কেউ বলেন যে, সরোপডের জলবাসের পক্ষে অন্য যুক্তিও খাটে না। কারণ, মাংসাশী ডাইনোসরগুলি সম্ভবত জলে সাঁতার

দিয়ে এসে এদের ধরতে পারতো (অর্থাৎ জলা জায়গা এদের পক্ষে নিরাপদ নয়)।

সেজন্যে কোনো কোনো বিজ্ঞানী মনে করেন, সরোপড জলের মধ্যে নিজের শরীরকে কিছুটা ডুবিয়ে রাখতো যাতে গলা ও বুক থাকে জলের উপরে। জলে এভাবে থাকলে, এদের ভারি শরীর নিয়ে চলাফেরা করা, শ্বাস নেওয়া এবং হ্রদের তীরবর্তী গাছপালা ছিঁড়ে খাওয়া সম্ভব হতে পারে ।

কিন্তু রবার্ট ব্যাকার প্রমুখ কোনো কোনো বিজ্ঞানী সরোপডের পায়ের পাতা, অস্থিসন্ধি ও গঠন পরীক্ষা করে বলেছেন, এগুলি ছিল হাতির মতো ; জল-হস্তীর মতো নয় । তাঁদের মতে, এই ডাইনোসরগুলির পা হাতি বা গণ্ডারের মতো ঋজু ছিল যা থেকে মনে হয়, এরা প্রধানত স্থলবাসী—এরা বনে থাকত এবং গলা লম্বা বলে জিরাফের মতো উঁচু গাছ থেকে পাতা ছিড়ে খেত । কেউ কেউ একথাও মনে করেন, এরা ডাঙায় দ্রুত দৌড়াতে পারত ; তবে একথা বিশ্বাস করা কঠিন, কারণ অত বিশাল শরীর নিয়ে দৌড়াতে গেলে দেহের ভারে পায়ের হাড় ভেঙ্গে যাওয়া সম্ভব।

ডাইনোসরের পায়ের যান্ত্রিক গঠন পরীক্ষা করে রবার্ট ব্যাকার বলেছেন যে, তা অনেকটা স্তন্যপায়ীদের মতো ; সরীসৃপের মতো শরীর হতে পাশের দিকে ঠেলে বেরিয়ে থাকা নয় । তিনি মনে করেন যে, ডাইনোসরের সামনের পা ছিল কাঁধের সন্ধি থেকে সোজাভাবে যুক্ত, যেমন স্তন্যপায়ীদের দেখা যায়। পা-গুলি সিধা থাকায় ডাইনোসরেরা সক্রিয় ছিল । তাই তাঁর অনুসরণকারী পণ্ডিতরা মনে করেন যে, ডাইনোসরের জীবনধারণে দ্রুততার সঙ্গে এদের শরীরে রাসায়নিক পরিবর্তন বা বিপাকের হার (metabolic rate) বেশি ও দেহের রক্ত উষ্ণ এবং এরা সম্ভবত দেহের তাপমাত্রাকে স্তন্যপায়ীদের মতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারত। তাঁদের মতের সমর্থনে অন্যতম যুক্তি এই যে, অনেক ডাইনোসরের কঙ্কালের ভেতরে (বিশেষত মেরুদণ্ডে) ফাঁপা জায়গা থাকে যেমন পাখিদের হয় । পাখির হাড়ে ফাঁপা জায়গা আছে বলে তার কাঠামো হালকা এবং অনেকক্ষণ ধরে ওড়ার সময় তা শরীরকে ঠাণ্ডা রাখতে সাহায্য করে। ডাইনোসরের অস্থির জালক (capillary) দেখে কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন, এদের রক্ত উষ্ণ ছিল।[২] তবে,এই নতুন মতবাদ আজও অনেক বিজ্ঞানীর সমর্থনপুষ্ট নয়। নতুন নতুন তথ্য ও ফসিল আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নের সমাধান অল্প কালের মধ্যে সম্ভব বলে আশা করা যায় ।

এখনো পর্যন্ত ডাইনোসরের চামড়া খুব কম পাওয়া গেছে । হাতি ও গণ্ডারের মতো এদের গা সম্ভবত লোমশূন্য ছিল (বস্তুত উষ্ণ রক্তের ছোট প্রাণীর ক্ষেত্রে লোমের প্রয়োজন বেশি কারণ তাদের ছোট শরীর হতে দ্রুত তাপ বের হয়ে যাওয়া থেকে লোম রক্ষা করে ।)

আফ্রিকার তৃণভূমিতে যেমন হায়না, বুনো কুকুর প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণীরা দল বেঁধে শিকার করে এবং প্রধানত ছোট ছোট উদ্ভিদভোজী অথবা বৃহদাকার উদ্ভিদভোজীদের অল্পবয়সী সন্তানকে আক্রমণ করে, মাংসাশী ডাইনোসরও সেইভাবে শিকার করত বলে মনে হয়। অতি বিরাটাকৃতি উদ্ভিদভোজী ডাইনোসরকে আক্রমণ করতে এরা সহজে চাইত না, যদি না সে অসুস্থ বা অপারগ হতো।

জীবনযুদ্ধে পরাস্ত হয়ে স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীসৃপগুলির আকার ট্রায়াসিক কল্পের শেষে ছোট হয়ে যায়। আকারে ছোট হওয়ায় এরা সহজে লুকিয়ে থাকতে এবং ট্রায়াসিক কল্পের উষ্ণ আবহাওয়ার মধ্যে তাপ থেকে বাঁচতে পারতো, কারণ ছোট প্রাণীর শরীরে আয়তনের তুলনায় উপরিপৃষ্ঠ (গা) বেশি বিস্তৃত হওয়ায় শরীর থেকে অতিরিক্ত তাপ আরো সহজে বের করে দেওয়া যায়। ট্রায়াসিক কল্পের শেষ দিকে অধিকাংশ স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীসৃপ সম্ভবত নিশাচর ছিল। মনে হয়, তারা গর্তে বা গাছের ফাটলে থাকতো আর পোকামাকড়, ছোট ছোট সরীসৃপ ও গাছপালা খেত।

সাইনোডন্ট্ নামে এক জাতীয় স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীসৃপ তখন বাস করতো। প্রাণীগুলি আকারে বড় নয়। স্তন্যপায়ী জীবের মুখের মধ্যে যেমন তালুর আনুষঙ্গিক একটা অংশ (secondary palate) থাকে এবং তার জন্যে এরা এরা খাদ্য চর্বণ ও শ্বাসকার্য একসঙ্গে চালাতে পারে সাইনোডন্টের মুখেও এরকম সেকেণ্ডারি প্যালেট ছিল। স্তন্যপায়ীদের মতো এর দাঁতগুলির আকারে বৈচিত্র্য ছিল। স্তন্যপায়ীর চোয়ালের যে হাড়ে দাঁতগুলি বসানো (dentary bone) সেই হাড়টি নিচের চোয়ালের সবচেয়ে বড় অংশ হয়ে গড়ে উঠেছে; সাইনোডন্টের চোয়ালেও প্রধান পেশীগুলি বড় ডেন্টারি বোনের সঙ্গে যুক্ত। কুকুরের মতো আকারের এক রকম মাংসাশী প্রাণী ছিল সাইনোডন্ট্ জাতির অন্তর্গত; তার নাম সাইনোগ্ন্যাথাস্। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সেই সরীসৃপের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। তাদের পায়ের গঠনে একটা বিশেষত্ব ছিল— পা-গুলি কুকুরের মতো অর্থাৎ সামনের পায়ের 'কনুই' পিছনে বাঁকানো এবং পিছনের পায়ের 'হাঁটু' সামনে বাঁকনো; পা-গুলি শরীরের নিচে। বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি মাংসাশীদের মতো তার ছেদকদন্ত দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ ছিল। কোলবার্ট বলেছেন যে, তাদের গায়ে সম্ভবত লোম ছিল এবং কান ছিল বাইরের দিকে (external ears)।

থেরাপ্সিড বা স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীসৃপগুলির মধ্যে নিরামিষভোজী ও মাংসাশী দু-রকমের প্রাণী ছিল। মাংসাশী থেরাপ্সিডের মধ্যে কোনো জাতি থেকে ট্রায়াসিক কল্পে হলো স্তন্যপায়ীর উদ্ভব। ট্রায়াসিক ও জুরাসিক কল্পে স্তন্যপায়ীর পা কিন্তু ঋজু ছিল না; ক্রিটেশাস কল্পে এদের পা ঋজু হয়। আদিম

স্তন্যপায়ীরা আকারে ছোট এবং এদের তাপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কম ছিল। এরা তখন সম্ভবত নিশাচর ছিল এবং ঘ্রাণ, শ্রবণ ও স্পর্শশক্তির ওপরে নির্ভর করতো, কারণ এই ক্ষমতা সরীসৃপের চেয়ে স্তন্যপায়ীদের বেশি। মধ্যজীবীয় অধিকল্পের স্তন্যপায়ীদের কথায় আমরা পরে আসছি।

মেরুদণ্ডীদের মধ্যে খেচর জীবের আবির্ভাব ট্রায়াসিক কল্পের আগে হয়নি। ট্রায়াসিক কল্পে গিরগিটির মতো এক রকম সরীসৃপের আবির্ভাব হয় যারা শূন্যে ভেসে যেতে পারে (যাকে gliding বলে)। বর্তমান যুগেও বিষুবরেখা অঞ্চলের ঘন বনে এমন গিরগিটি, টিকটিকি, ব্যাং ও কাঠবিড়াল আছে যারা শূন্যে ভেসে যায়। এদের মধ্যে অনেকের পায়ের মাঝে চামড়া আছে এবং সেই চামড়াকে টান করে ছড়িয়ে দিয়ে এরা ভাসতে পারে। মনে হয়, যারা প্রায়ই গাছে ওঠে অথবা শাখায় শাখায় বিচরণশীল, তাদের মধ্যে কিছু জীবের দেহে এমন পরিবর্তন হয়, যার ফলে তারা শূন্যে ভেসে যেতে পারে (অর্থাৎ দূরে বা উঁচু থেকে লাফাবার ধাক্কা তাদের লাগে না)।

অতি আদিম খেচর সরীসৃপের নিদর্শন আমেরিকার নিউ জার্সি থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। তার নাম ইকারোসরাস। প্রাণীটি ট্রায়াসিক কল্পের শেষভাগে বাস করতো। সব প্রাণীর পঞ্জর যেমন বুকের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে বাঁকানো থাকে, এর কিন্তু সেরকম নয়; এর পঞ্জরগুলি দুই পাশের দিকে অনেকটা বেরিয়ে ছিল। পঞ্জরগুলি চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকায় ডানার আকার নিয়ে ছিল। সেগুলির মাঝে যে পেশা ও তন্তু (ligament) ছিল, তা সম্ভবত শূন্যে ভেসে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণের কাজে সাহায্য করতো। বিশ্রামের সময় সে পঞ্জরশুদ্ধ ডানা দুটিকে মুড়ে নিত মনে হয়। শূন্যে ভেসে যেতে পারলেও এর পা কিন্তু মাটিতে চলা, ওঠা বা কোনো কিছু ধরে রাখার উপযোগী ছিল। ট্রায়াসিক কল্পের খেচর সরীসৃপগুলি আকারে কাঠবিড়ালের মতো ছোট। এদের উত্তরসূরীর কোনো নিদর্শন এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

উভচরের ইতিহাসেও ট্রায়াসিক কল্পের একটা গুরুত্ব আছে। মাদাগাস্কারে ট্রায়াসিক কল্পের একটি উভচরের নিদর্শন পাওয়া গেছে, যার করোটি অনেকটা ব্যাঙের মতো (যদিও তার লেজ ছিল এবং দেহের অন্যান্য অংশে পার্থক্য ছিল)। তবে জুরাসিক কল্পে ব্যাঙের আদিপুরুষ যে বর্তমান ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, পার্মিয়ান কল্পের শেষে সমুদ্রের ব্র্যাকিওপড, ক্রিনয়েড ইত্যাদি সাস্‌পেন্‌শন্‌-ফিডার প্রাণীগুলি প্রায় লোপ পেয়েছিল। ট্রায়াসিক কল্পে হলো ডিপোজিট-ফিডার প্রাণীদের প্রাধান্য (যেমন হয়েছিল ক্যাম্ব্রিয়ান কল্পে একই কারণে)। পুরাজীবীয় অধিকল্পে যে প্রাণীরা জলের ওপর দিকে বাস

করতো (surface dwellers), তাদের মধ্যে কোনো কোনো জীব ট্রায়াসিক কল্পে গহ্বরবাসী হলো । দুই খোলা যুক্ত মোলাস্ক্ বা ঝিনুকের মধ্যে অনেকের শরীর গহ্বরবাসের উপযোগী হয়ে গড়ে উঠেছিল ।

উল্লেখপঞ্জি

১. 'Loch Ness : The Legend is True', by Hugh & Colleen Gantzer ; published in *The Indian Express* (Delhi edition, 21-11-1982)

১১

জুরাসিক কল্প

জুরাসিক কল্প (১৮ থেকে ১৩·৬ কোটি বছর আগে) এবং

ক্রিটেশাস কল্প

ক্রিটেশাস কল্প (১৩·৬ থেকে ৬·৫ কোটি বছর আগে)

পৃথিবীর সব মহাদেশগুলি ট্রায়াসিক কল্পে পরস্পর যুক্ত ছিল। সেই অতি বিশাল ভূভাগ প্যান্‌গিয়ার মধ্যে দুটি অংশ লাউরেশিয়া ও গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড পশ্চিম প্রান্তে যুক্ত এবং পূর্ব দিকে তাদের মাঝে ছিল টেথিজ সাগরের ব্যবধান।

বিশাল প্যান্‌গিয়ায় ট্রায়াসিক কল্পে চিড় খায়। এখন যেখানে আটলান্টিক মহাসাগর, তার ধারে অনেক জায়গায় বড় বড় ফাটল ধরে ও আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ হতে থাকে।

জুরাসিক কল্পে আফ্রিকা নিয়ে একটা বড় ভূখণ্ড উত্তর আমেরিকার ভূভাগ থেকে পৃথক হয়ে যায় সেই সঙ্গে তৈরি হয় উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর। সেই বৃহৎ ভূখণ্ড ভেঙ্গে তিনটি অংশ পরস্পর থেকে একটু দূরে সরে যায়।

ভূভাগে সবচেয়ে বড় ভাঙ্গন ধরে ক্রিটেশাস কল্পের মধ্যভাগে। আটলান্টিক মহাসাগর উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত প্রায় সবটা খুলে গেল। গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড আরো ভেঙ্গে ভেঙ্গে তৈরি হলো দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, মাদাগাস্কার, ভারতবর্ষ, এবং অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ মেরু নিয়ে যুক্ত আর একটি ভূখণ্ড।

এই বিরাট পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর জলবায়ু আরো সামুদ্রিক ভাবাপন্ন হলো। এই পরিবর্তন জীবজগতকেও প্রভাবিত করে।

জীবজগতের ইতিহাসে জুরাসিক ও ক্রিটেশাস কল্পকে বলা যায় বিশাল প্রাণীর যুগ। জলে, স্থলে ও আকাশে তখন বিরাট প্রাণীদের রাজত্ব।

ডাইনোসরের শ্রেণীবিভাগ ও দৈহিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কতকগুলি প্রাণীর বর্ণনা এখানে দেওয়া হলো।

সরিস্‌কিয়ান :

ক) **থেরোপড**॥ অ্যালোসরাস ও টাইরানোসরাস যথাক্রমে জুরাসিক এবং ক্রিটেশাস কল্পের মাংসাশী প্রাণী। উভয়ের দাঁত লম্বা (প্রায় ৩ থেকে ৬ ইঞ্চি), মজবুত ও ধারালো। শিকারের সুবিধার্থে সকলের পায়ে তীক্ষ্ণ নখর। এরা প্রধানত দ্বিপদী, সামনের তুলনায় পিছনের পা অস্বাভাবিক লম্বা।

দৌড়াবার সময় এরা বড় লেজকে মাটির সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল ভাবে উঠিয়ে দিয়ে শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করতো। অ্যালোসরাসের দৈর্ঘ্য এবং ওজন প্রায় ৩৫ ফুট ও ১৬ হাজার পাউণ্ড, টাইরানোসরাসের প্রায় ৫০ ফুট ও ২০ হাজার পাউণ্ড। টাইরানোসরাস পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালে মাটি থেকে প্রায় ১৯-২০ ফুট উঁচু হতো, অর্থাৎ ভাবা যেতে পারে—ঘাড় ঘুরিয়ে এরা দোতলা বাড়ির ছাদ থেকে অনায়াসে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারত।

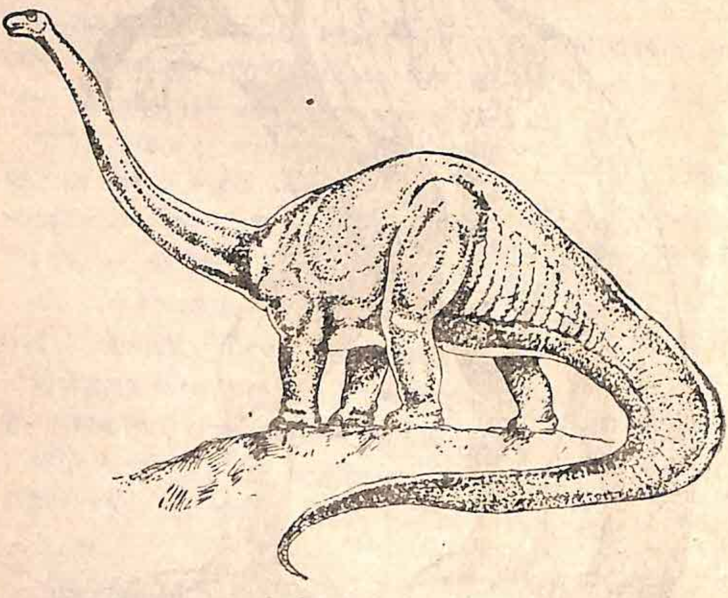


টাইরানোসরাস

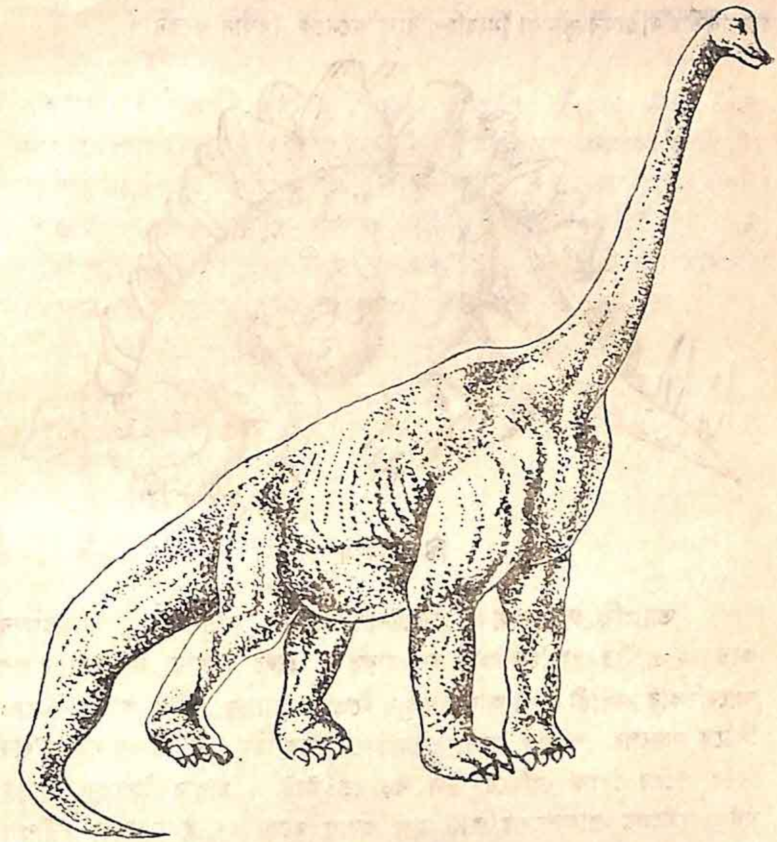
ট্রায়াসিক কল্পে সিলোফাইসিস নামক সরীসৃপ থেকে সিলুরোসরের উদ্ভব। এরা আকারে অনেক ছোট, ওজনেও কম; উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে,

কম্প্‌সোগ্‌ন্যাথাস লম্বায় মাত্র ৩ ফুট, ওজনে প্রায় ১৫ পাউণ্ড। প্রায় সবাই দ্রুতগামী ও দীর্ঘ গ্রীবা যুক্ত। মজার প্রাণী ছিল অর্নিথোমিমাস, যার গড়ন উটপাখি সদৃশ এবং মুখ অনেকটা চঞ্চুর মতো।

খ) **সরোপড**॥ এদের মধ্যে ব্রন্টোসরাস (অ্যাপাটোসরাস), ডিপ্লোডকাস ও ব্র্যাকিওসরাস জুরাসিক কল্পের অন্তর্গত। এই তিনটি প্রাণীরই দৈর্ঘ্য ছিল বিশাল, বিশেষত ডিপ্লোডকাস ছিল দীর্ঘতম—প্রায় ৯০ ফুটের মতো। এদের দৈহিক ওজনও বিশাল এবং ব্র্যাকিওসরাসের ওজন সবচেয়ে বেশি—প্রায় ১,১০,০০০ পাউণ্ড। এরা সবাই ছিল অতি দীর্ঘ-গ্রীবাযুক্ত উদ্ভিদভোজী, প্রত্যেকেই চতুষ্পদী। অধিকাংশ ডাইনোসরের যেমন পিছনের পা বেশি বড়, ব্র্যাকিওসরাসের কিন্তু সামনের পা ছিল বড়। সাদৃশ্যের মধ্যে এদের সকলের মাথা দেহের অনুপাতে ছোট। ব্র্যাকিওসরাসের ফসিল উত্তর আমেরিকা ও আফ্রিকার টানজানিয়া থেকে পাওয়া গেছে, যা থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, সরোপডের বিচরণ ক্ষেত্র ছিল কী বিশাল ও বিস্তৃত।



ডিপ্লোডকাস

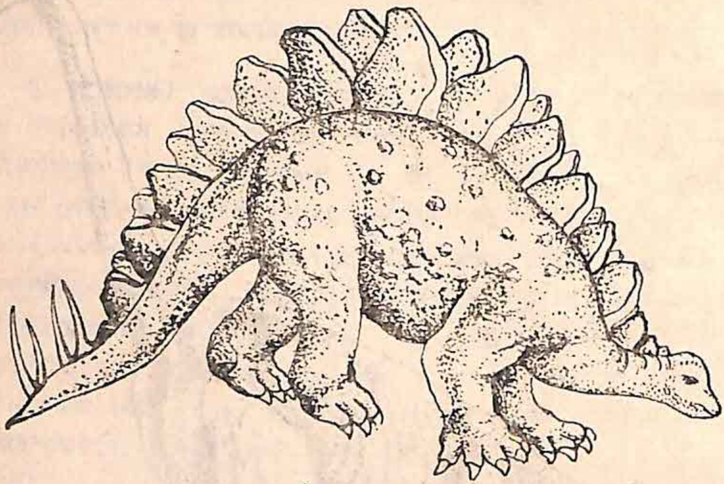


ব্র্যাকিওসরাস

অর্নিথিসকিয়ান :

ক) **স্টিগোসরাস**।। জুরাসিক কল্পের এই ডাইনোসরের মাথার পিছন থেকে লেজ পর্যন্ত পিঠ বরাবর দুই সারিতে ত্রিভুজাকৃতি হাড়ের বড় বড় প্লেট ছিল এবং লেজের আগায় ৪টি লম্বা ও ধারালো কাঁটা। এগুলি আত্মরক্ষায় সহায়ক। এদের দৈর্ঘ্য প্রায় ২০ ফুট, উচ্চতা ১১ ফুট এবং ওজন ৭ হাজার পাউণ্ড। চার পায়ে চললেও স্টিগোসরাসের পিছনের পা একটু বেশি বড়, তাই চলার সময় কোমর উঁচু হয়ে থাকতো। এই প্রাণীদের দাঁত শুকনো গাছপালা চিবিয়ে খাওয়ার উপযোগী ছিল বলে মনে হয়। এদের মস্তিষ্ক খুব ছোট—মানুষের মুঠির চেয়ে বড় ছিল না। এত ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের সাহায্যে পিছনের পা ও লেজের পেশীকে পরিচালনা করা সম্ভব বলে মনে হয় না। পিছনের এই অংশগুলিকে

পরিচালনার জন্যে স্টিগোসরাসের লেজের গোড়ায় spinal cord-এর অংশ বড় হয়ে দ্বিতীয় মস্তিষ্কের ভূমিকা নিয়েছিল বলে অনেকে বিশ্বাস করেন।



স্টিগোসরাস

খ) **অ্যাংকিলোসরাস**॥ ক্রিটেশাস কল্পের আবির্ভাব। আত্মরক্ষার জন্যে এই প্রাণীর দেহ ছিল বর্ম দ্বারা আবৃত। এদের চেহারা কতকটা দক্ষিণ আমেরিকার বর্মধারী প্রাণী আর্মাডিলোর মতো। হাড়ের কঠিন আবরণ এদের পিঠকে কচ্ছপের খোলার মতো গোলভাবে ঢেকে ছিল, ঐ আবরণের দু'ধার থেকে পাশের দিকে বেরিয়ে ছিল বড় বড় কাঁটা। মাথার উপরেও হাড়ের বর্ম। লেজের প্রান্তভাগের হাড় স্থূল গদার মতো। এই চতুষ্পদী সরীসৃপ দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৫ ফুট, উচ্চতায় ৫ ফুট। এরাও উদ্ভিদভোজী।



অ্যাংকিলোসরাস

গ) **হ্যাড্রোসর**॥ এই জাতির আদিপুরুষ ক্যাম্প্‌টোসরাস বাস করতো জুরাসিক কল্পে। ক্যাম্প্‌টোরাস পিছনের লম্বা পায়ে ভর দিয়ে হাঁটলেও এরা চার পায়ে চলতে পারতো। গাছপালা এদের খাদ্য। মুখ চঞ্চুর মতো ও

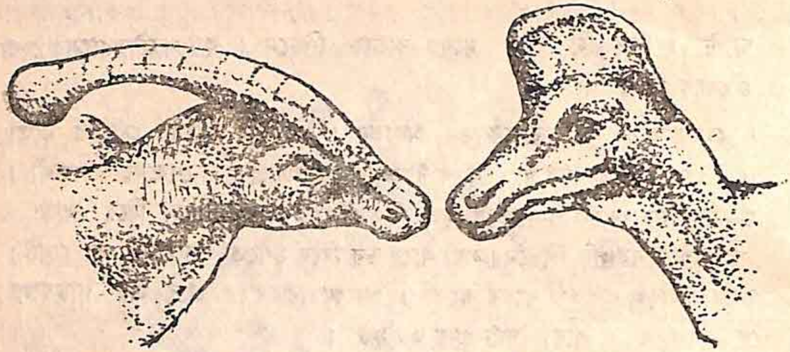
চ্যাপ্টা। দাঁতগুলি ছিল মুখের অনেক পিছনে। ক্যাম্পটোসরাসের দৈর্ঘ্য ৪ থেকে ১৫ ফুট।

হ্যাড্রোসরের মধ্যে ট্র্যাকোডন অন্যতম। এর মুখ হাঁসের ঠোঁটের মতো এবং মুখে প্রায় হাজার দাঁত, তবে দাঁতগুলি কেবলমাত্র খাদ্য-পেষণের উপযোগী। শুধু তাই নয়, এদের পায়ের আঙ্গুল ছিল হাঁসের মতো চামড়া দিয়ে জোড়া। এই ডাইনোসরগুলি পিছনের লম্বা পায়ে ভর দিয়ে চলতো, সামনের পা ছোট; পায়ের আঙ্গুল কতকটা খুরের মতো। জলকাদার ধারে ধারে এরা গাছপালা খেত মনে হয়। এদের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০ ফুট।



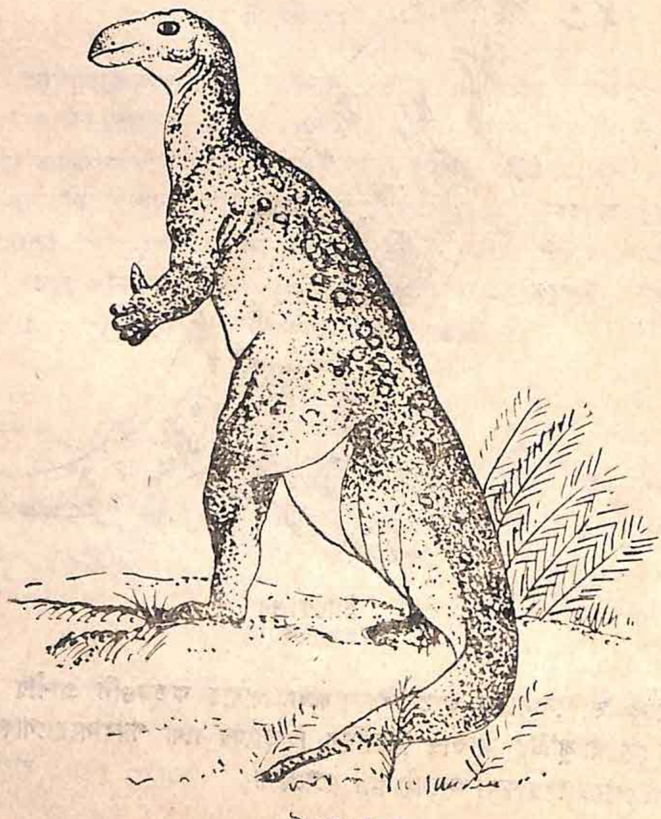
ট্র্যাকোডন

হংসচঞ্চু ডাইনোসরের জাতভাইদের মধ্যে আবার কতকগুলি প্রাণীর মাথার হাড় চূড়া বা ঝুঁটির আকার নিয়েছিল। তাদের মধ্যে প্যারাসরোলোফাস ও কোরিথোসরাসের কথা আগেই বলা হয়েছে।



প্যারাসরোলোফাস কোরিথোসরাস

ঘ) **ইগুয়ানোডন :** ক্রিটেশাস কল্পে এই ডাইনোসর বাস করতো। সামনের পায়ে বুড়ো আঙ্গুলের নখ খুব বড় ও ধারালো। ইগুয়ানোডন ছিল অর্নিথোপড এবং এরও আদিপুরুষ সম্ভবত ক্যাম্প্‌টোসরাস। বেলজিয়ামের এক খনিতে ৩১টি ইগুয়ানোডনের কঙ্কাল পাওয়া যায়।

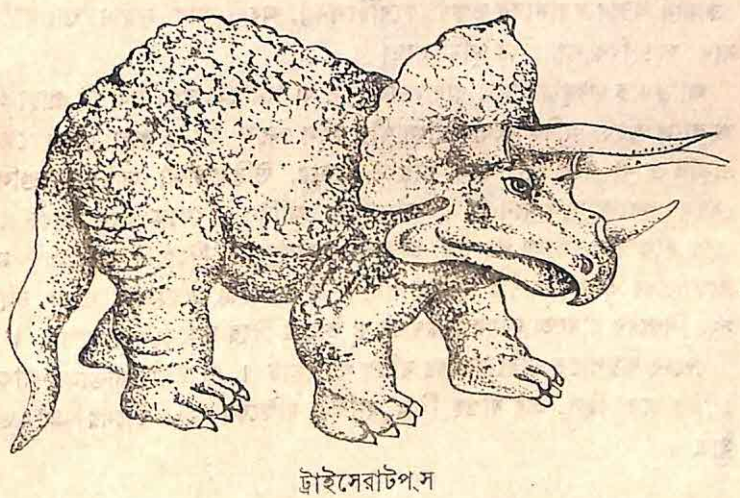


ইগুয়ানোডন

ঙ) **সেরাটপ্‌সিয়ান** ॥ এই জাতীয় প্রাণীদের মুখের অগ্রভাগ শুকচঞ্চুর মতো বক্র । সম্ভবত সিট্টাকোসরাস এদের পূর্বপুরুষ ছিল, কারণ তার মুখের অগ্রভাগ টিয়াপাখির মতো বক্র বলে প্রাণীটির নাম 'Parrot lizard' (এ যেন সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল'-এর সেই 'টিয়ামুখো গিরগিটি' ।) সিট্টাকোসরাস চলতো পিছনের লম্বা পায়ে ভর দিয়ে । দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ৪ থেকে ৫ ফুট ।

পরবর্তীকালের সব সেরাটপ্‌সিয়ান হলো চতুষ্পদী । তাদের মধ্যে প্রোটোসেরাটপ্‌স অন্যতম । এর দৈর্ঘ্য ৬ থেকে ৮ ফুট । পিছনের পা সামনের পায়ের চেয়ে কিছুটা বড় । মুখের অগ্রভাগ শুকচঞ্চুর মতো । তার পিছনে একটা অংশ নাকের ওপরে কুঁজের মতো হয়ে উঠেছে । (পরবর্তী-কালের ট্রাইসেরাটপ্‌স-এর নাকের ওপরের এই অংশ নিল শিঙের আকার ।) ঘাড়ের পিছনে ও কাঁধের ওপর দিয়ে ছিল হাড়ের তৈরি 'কলার' বা 'ফ্রিল' ।

শিংওয়ালা ডাইনোসরের মধ্যে ট্রাইসেরাটপ্‌স্‌ বৃহত্তম—দৈর্ঘ্য ছিল ৩০ থেকে ৩৬ ফুট, কোমরের কাছে উচ্চতা প্রায় ৮ ফুট, ওজন ২০ হাজার পাউণ্ড । এই সুবিশাল প্রাণীর পা খুব মোটা ও মাথা খুব বড় । ঘাড়ের পিছনে বিরাট 'কলার' এবং মাথায় দুটি ও নাকের ওপরে একটি শিং ; মাথার বিরাট শিং দুটি ছিল সামনের দিকে তলোয়ারের মতো এগিয়ে । ট্রাইসেরাটপ্‌স ছিল যেন তার সমসাময়িক টাইরানোসরাসের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ।



ট্রাইসেরাটপ্‌স

এখন যেমন আফ্রিকার সাভানা তৃণভূমিতে জিরাফ উঁচু গাছের পাতা খায়, ইল্যাণ্ড অ্যান্টিলোপ ('নীলগাই'-এর মতো প্রাণী) খায় মাঝারি গাছের পাতা, আর ডিকডিক প্রভৃতি খুব ছোট অ্যান্টিলোপ খায় ঝোপের পাতা, তেমন ডাইনো-সরের মধ্যে বিভিন্ন উদ্ভিদভোজীর খাদ্য বিভিন্ন ছিল মনে হয় । ব্রন্টোসরাসের

মতো অতি দীর্ঘ গ্রীবাযুক্ত প্রাণী বেশি উঁচু ডাল থেকে পাতা খেত। ক্যাম্প্‌টোসরাস খেত মাঝারি গাছের পাতা, আর অ্যাংকিলোসরাস হয়তো নিচু ঝোপ থেকে পাতা ছিঁড়ে খেত।

প্যাকিসেফালোসর জাতীয় অর্নিথিস্‌কিয়ানের মাথার খুলির উপরিদেশ গম্বুজ-সদৃশ এবং তা প্রায় ১০ ইঞ্চি পুরু। সম্ভবত মিলনের পূর্বে এদের পুরুষেরা মাথা ঠুকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হতো, যেমন পাহাড়ি ভেড়াদের মধ্যে আজও দেখা যায়। এরা যে যূথচারী ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। দলের মধ্যে সদস্যদের স্থান বোধ হয় মাথার 'গম্বুজের' ওপরে নির্ভর করতো।

ডাইনোসরের জীবনযাত্রা সম্পর্কে আর এক চিত্তাকর্ষক আবিষ্কার হলো মঙ্গোলিয়ার গোবি মরুভূমিতে প্রোটোসেরাটপ্‌সের ডিম। আট ইঞ্চি লম্বা ডিমগুলি এমন সুনির্দিষ্টভাবে সাজানো ছিল যে মনে হয়, এরা ডিম পাড়ার সময় একতাবদ্ধ হয়ে বাস করতো (যেমন সমুদ্রের gull পাখিরা প্রায় এক সময়ে ডিম পাড়ে ও দলবদ্ধ হয়ে থাকে)। ডিম পাড়া হয়ে গেলে এরা তা বালি চাপা দিত, যাতে ডিমগুলি আপনি ফুটতে পারে।

আমেরিকার নিউ-মেক্সিকোতে সিলোফাইসিসের কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে, যাদের কারো কারো পেটের ভেতরে শিশু ছিল। এর দুটি কারণ হতে পারে: সিলোফাইসিস আপন শিশুকেও ভক্ষণ করতো (যেমন গ্রীক পুরাণ বর্ণিত ক্রোনাস আপন সন্তানদের ভক্ষণ করেছিলেন), অথবা তার সন্তান স্তন্যপায়ীর মতো স্বাভাবিক রূপ নিয়ে ভূমিষ্ঠ হতো।

আফ্রিকার তৃণভূমির মধ্যে খাদ্যাভাব হলে বা অনাবৃষ্টি, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক আকালে অথবা অধিক সংখ্যক মাংসাশীর কবল থেকে বাঁচার জন্যে যেমন জেব্রা প্রভৃতি প্রাণী দলে দলে স্থান পরিবর্তন করে, উদ্ভিদভোজী ডাইনোসরগুলিও সেরকম করতো বলে মনে হয়। সাম্প্রতিক আবিষ্কার থেকে জানা গেছে যে, তারা দলে দলে সোজা পথ ধরে চলতো গন্তব্যস্থানের দিকে। শুধু তাই নয়, ব্রন্টোসরের একদল প্রাণীর পদচিহ্ন পরীক্ষা করে বোঝা গেছে যে, তারা চলার সময় শিশুদের রাখতো দলের মাঝখানে ও তাদের ঘিরে চলতো পূর্ণবয়স্কেরা।

দেহের অনুপাতে ডাইনোসরের মস্তিষ্ক খুব ছোট। যে ইগুয়ানোডনের আকার হাতির মতো ছিল, তার মস্তিষ্ক কিন্তু হাতির মস্তিষ্কের ২০ ভাগের এক ভাগ মাত্র।

থেকোডন্ট্‌ হতে জুরাসিক কল্পের প্রথমে হলো টেরোসর জাতীয় খেচর সরীসৃপের আবির্ভাব। তাদের হাত-পায়ের মাঝে ঝিল্লির মতো চামড়া ছিল, যেমন বাদুড়ের থাকে। কিন্তু বাদুড়ের সামনের পা বা হাতের সব আঙ্গুল যেমন ঐ ঝিল্লির সঙ্গে জোড়া, টেরোসরের হাতের শুধু একটি আঙ্গুল লম্বা হয়ে ডানার

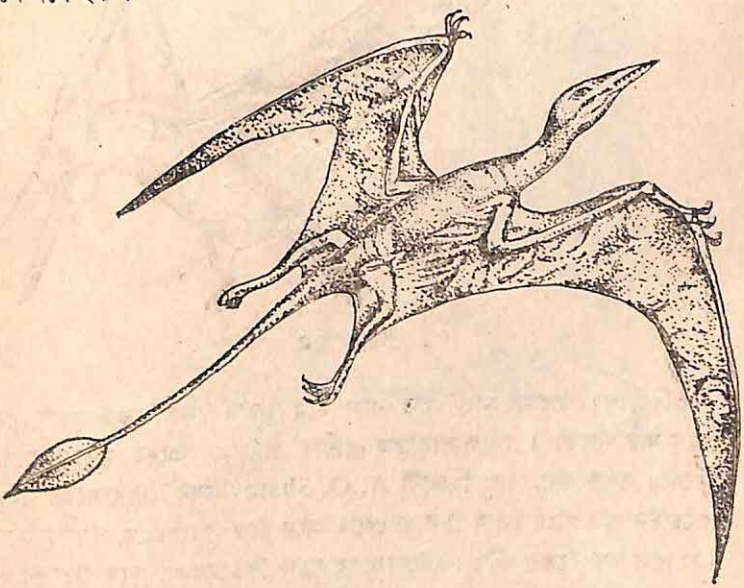
সামনের দিকে জোড়া, বাকি সব আঙ্গুল স্বাভাবিক। তাই, টেরোসরের অপর নাম 'টেরোড্যাক্‌টিল' যার অর্থ 'wing finger'। এদের হাতের আঙ্গুল নখর যুক্ত। এরা ডানা গুটাতে পারতো বলে মনে হয়।

নানা আকারের টেরোসর ছিল – ডানা ছড়ালে কেউ মাত্র কয়েক ইঞ্চি, কেউবা প্রায় ২৭ ফুট। এদের মধ্যে বৃহত্তম ছিল টেরানোডন।

খেচর সরীসৃপগুলির কাঠামো হালকা ও হাড় ফাঁপা বলে শূন্যে ভাসা সহজ ছিল। এদের মাথা লম্বা ও মুখে অনেক দাঁত, তবে টেরানোডন দন্তহীন।

টেরোসরের মধ্যে দু'রকম প্রাণী ছিল: এক জাতির লম্বা লেজ, অন্য জাতি লেজবিহীন। এদের লেজ বোধ হয় ওড়ার সময় 'রাডার'-এর কাজ করতো। ক্রমে ওড়ার নিয়ন্ত্রণক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে লেজের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়।

রাম্‌ফোরিন্‌কাস নামে জুরাসিক কল্পের একরকম টেরোসর ছিল মাত্র দেড় ফুট লম্বা, ডানা ছড়ালে হতো ৪ ফুট। এর লেজ বেশি লম্বা ও লেজের আগা পাতার মতো। মুখে ধারালো দাঁত। হাতের (সামনের পা) ৩টি ছোট আঙ্গুল ডানার সঙ্গে জোড়া ছিল না, মনে হয় তা কোনো কিছু ধরার কাজে সাহায্য করতো। ডালে ওঠার সময় এরা নখর দিয়ে গাছের গা আঁকড়ে উঠতো বলে মনে হয়।



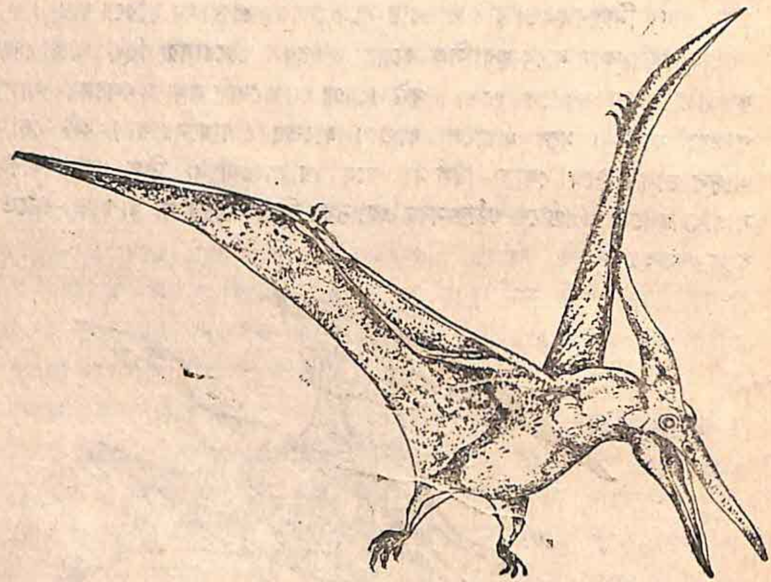
রাম্‌ফোরিন্‌কাস

টেরোসর কিন্তু ঠিক উড়ত না, চামড়ায় ছাওয়া ডানা মেলে এরা শূন্যে ভেসে যেত, যাকে 'gliding' বলা হয়। ডানার চামড়া বেশি ছিঁড়ে গেলে এদের পক্ষে

শূন্যে ভাসা সম্ভব হতো না এবং এরা নিচে পড়ে যেত। এরা ভেসে যেত হালকা হাওয়ায়; হাওয়ার বেগ বেশি হলে এরা ভাসতে পারতো না।

অনেক সামুদ্রিক পাখি যেমন পাহাড়ের ধারে ধারে দল বেঁধে থাকে, টেরোসরও তেমনভাবে বাস করতো বলে কেউ কেউ মনে করেন।

লেজবিহীন টেরানোডনের উদ্ভব ক্রিটেশাস কল্পে। তার মাথার পিছন দিকে হাড় লম্বা হয়ে বেরিয়ে ছিল। মনে হয়, এই হাড়ের 'ঝুঁটি' তার লম্বা ও সূক্ষ্মাগ্র চঞ্চুর ভারসাম্য রাখতো। কোনো কোনো বিজ্ঞানী বলেছেন যে, এর শূন্যে ভেসে যাওয়ার গতি ঘণ্টায় ১৭ থেকে ৩০ মাইল হতে পারে।



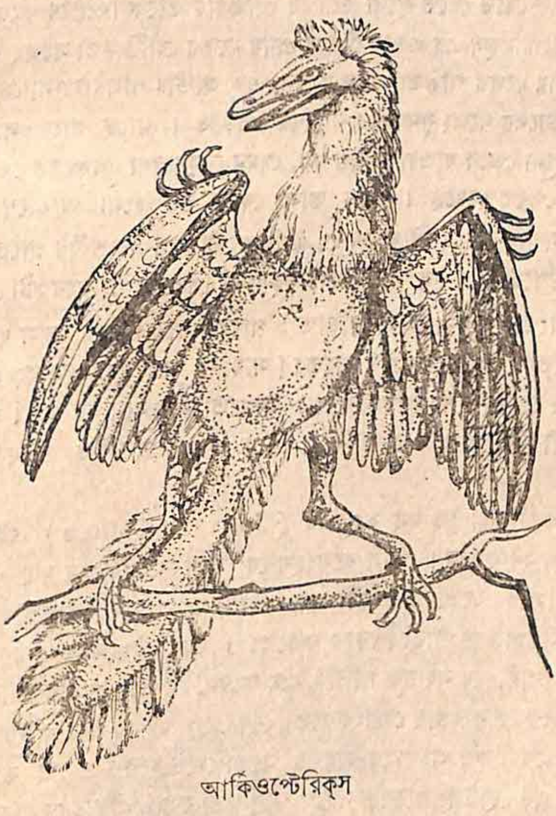
টেরানোডন

অধিকাংশ টেরোসর মাছ খেত বলে মনে হয়। কেউ কেউ জলে ভেসে থেকে মাছ ধরতো। হিংস্র সামুদ্রিক প্রাণীর আক্রমণে এদের মৃত্যুও হতো। সবচেয়ে অদ্ভুত কথা, রুশ বিজ্ঞানী A. G. Sharov এমন টেরোসরের নিদর্শন পেয়েছেন যার গায়ে লোম ছিল যা থেকে মনে হতে পারে যে, পাখির মতোই এরা ছিল উষ্ণ রক্তের জীব। টেরোসরের পক্ষে পিছনের পা দিয়ে বাদুড়ের মতো গাছ থেকে মাথা নিচু করে ঝুলে থাকা সম্ভব ছিল।

ক্রিটেশাস কল্পের শেষে পৃথিবী থেকে টেরোসর লুপ্ত হয়ে যায়। কেউ কেউ বলেছেন, আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে বাতাসের গতি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এদের যে জীবনসমস্যা দেখা দেয়, তা এই অবলুপ্তির অন্যতম সম্ভাব্য কারণ।

সবথেকে আশ্চর্যের কথা, পাখির উদ্ভব কিন্তু খেচর সরীসৃপ থেকে হয়নি, এক রকম ক্ষুদ্রাকৃতি ডাইনোসর থেকে পাখির উদ্ভব হয়েছিল বলে অনেকের বিশ্বাস। পাখিদের রক্ত উষ্ণ এবং গায়ে পালখ থাকে। ক্ষুদ্রাকৃতি জীবের পক্ষে রক্তের উষ্ণতা বজায় রাখা কঠিন, কারণ আকার ছোট হলে শরীর থেকে তাপ সহজে বের হয়ে যায়। যদি ডাইনোসরের রক্ত উষ্ণ হয়, তবে ক্ষুদ্রাকৃতি ডাইনোসরের গায়ে পালখ তৈরি হলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব, কারণ পালখের মধ্য দিয়ে তাপ সহজে বেরিয়ে যেতে পারে না। অনেকে বলেন যে, সরীসৃপের আঁশ থেকে পাখিদের পালখ এবং সামনের পা (হাত) থেকে ডানা হয়েছে।

অদ্যাবধি আবিষ্কৃত পাখির আদিমতম ফসিল হলো আর্কিওপ্টেরিক্স। জার্মানির ব্যাভেরিয়া অঞ্চলে আবিষ্কৃত প্রাণীটির ফসিল জুরাসিক কল্পের শেষ ভাগের।



আর্কিওপ্টেরিক্স

বস্তুত পালখ বাদ দিলে আর্কিওপ্টেরিক্স-কে দেখতে অনেকটা সরীসৃপের মতো —চঞ্চুবিহীন এবং বহুদন্তী। লেজের দৈর্ঘ্য বরাবর দুই পাশে পালখগুলি জোড়ায় জোড়ায় সাজানো। এর করোটি পাখির মতো। সে যুগের সরীসৃপের

চেয়ে আর্কিওপ্টেরিক্স-এর মস্তিষ্ক বড় । হাড়গুলি ফাঁপা । ফসিলে বুকের হাড় দেখে মনে হয়, যে পেশীগুলি ওড়ার কাজে সাহায্য করতো তা বেশি বড় ছিল না ; তাই সম্ভবত এরা খুব বেশি সময় ধরে উড়তে পারতো না ।

পাখিদের মধ্যে কেমন করে আকাশে ওড়া আরম্ভ হয়েছিল, সে বিষয়ে বিজ্ঞানী-দের তিনটি মত ।

প্রথম মত অনুসারে—এক রকম ক্ষুদ্রাকৃতি ও দ্রুতগামী ডাইনোসরের (সিলুরোসর) শরীরে পালখ তৈরি হয়েছিল । এই মতের সমর্থকরা বলেন যে, মাঠের মতো খোলা জায়গায় দ্রুত দৌড়ানো থেকে এরা বড় বড় লাফ দিতে, ভেসে যেতে এবং উড়তে শিখেছিল । আর্কিওপ্টেরিক্স-এর শ্রোণীর কাঠামো থেকে মনে হয়, এরা ছু'পায়ে দ্রুত দৌড়াতে পারতো । তবে, এরোপ্লেন 'রান্‌ওয়ে'-র মাটি দিয়ে দ্রুত যেতে যেতে শূন্যে ওঠে যে প্রক্রিয়ায় তাকে বিশ্লেষণ করে বুঝতে গেলে আর্কিওপ্টেরিক্স-এর ওড়ার বিষয়ে প্রথম মতের যৌক্তিকতা সন্দেহ জাগায় ।

দ্বিতীয় দলের পণ্ডিতরা মনে করেন, এক জাতীয় পালখওয়ালা ছোট ডাইনোসর কাঠবিড়ালের মতো বৃক্ষান্তরে লাফিয়ে বেড়াত । গাছে গাছে লাফানো থেকে ক্রমে শূন্যে ভেসে যাওয়া আরম্ভ হয়, যেমন বিষুবরেখা অঞ্চলের কোনো কোনো প্রাণীর ক্ষেত্রে হয়েছে । শূন্যে ভাসা থেকে শুরু হলো আকাশে ওড়া । এই মতের সমর্থকরাধরে নিয়েছেন যে,আর্কিওপ্টেরিক্স-এর শরীর গাছে ওঠা বা ডাল ধরার উপযোগী । কিন্তু আর্কিওপ্টেরিক্স-এর পিছনের পা অনেকটা ছোট ডাইনো-সরের মতো, যারা মাটিতে দৌড়াত ; পায়ের নখর গাছের ডাল ধরা বা ডালে চলার তেমন উপযোগী নয় । হাতের (সামনের পা) নখর এত বড় যে, গাছে ওঠা বা ডাল ধরায় বিশেষ স্থবিধা করতে পারতো বলে মনে হয় না । হয়তো বা সে বৃক্ষবাসী ছিল, তবে তার কাঠামো থেকে একথা স্থনিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হয় না ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন অস্‌ট্রোম (John D. Ostrom) এই বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেছেন যে, আর্কিওপ্টেরিক্স ক্ষুদ্রাকৃতি থেরোপড ডাইনোসরের মতো দ্রুতগামী এবং দৌড়ে তাড়া করে পোকামাকড়, গিরগিটি ও ছোট ছোট স্তন্যপায়ী শিকার করতো । তার তীক্ষ্ণ নখর ও দাঁত ছিল শিকার ধরা ও প্রাণীবধে সহায়ক । তিনি মনে করেন, সে তার ডানার জোরালো ঝাপটায় শিকারকে কাবু করার চেষ্টা করতো, যেমন সাপ মারার সময় বাজপাখি করে থাকে আর্কিওপ্টেরিক্স আকারে কাকের মতো ছোট হলেও ডানার ঝাপট ঠিক মতো হলে ছোট ছোট শিকারকে সহজে কাবু করা যায় । আবার ডানা ঝাপটিয়ে ওপরে ওঠাও সম্ভব ; আর্কিওপ্টেরিক্স যদি দাঁড়ানো অবস্থা থেকে ওপরে লাফিয়ে উঠে শিকার ধরতো, তবে তার ডানার ঝাপট এতে সাহায্য করতো বলে মনে হয় । সম্ভবত এইভাবে তাদের মধ্যে আকাশে ওড়া আরম্ভ হয়েছিল । পাখির ক্রম-

বিবর্তনে বৃক্ষবাসের গুরুত্বকে অস্‌ট্রোম অস্বীকার করেন না। তবে তিনি মনে করেন যে, পাখির বৃক্ষবাস শুরু হয়েছিল আর্কিওপ্টেরিক্স আবির্ভাবের পরে।

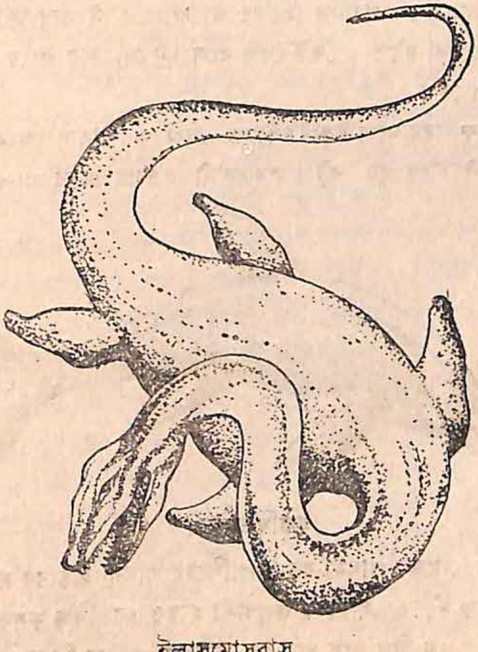
আর্কিওপ্টেরিক্স ও তার পরবর্তী যুগের পাখির ফসিলের মধ্যে প্রায় পাঁচ কোটি বছরের ব্যবধান। আদিম পাখিদের বিষয়ে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

ক্রিটেশাস কল্পের শেষে ডাইনোসরের অবলুপ্তির পরে পাখিদের বিস্তারের পথ আরো খুলে যায়। পাখির মস্তিষ্ক বড় ও রক্ত উষ্ণ বলে, সে জীবনসংগ্রামে জয়ী হয়।

মধ্যজীবীয় অধিকল্পের জলবাসী প্রাণীদের মধ্যে সরীসৃপরা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। সামুদ্রিক সরীসৃপের মধ্যে কচ্ছপ অন্যতম। জলে থাকলেও ডিম পাড়ার সময় তারা ডাঙায় উঠে আসে। ট্রায়াসিক কল্পের পরে তারা আকারে বৃদ্ধি পেল। আর্কিলন নামে এক বিরাট কচ্ছপ ক্রিটেশাস কল্পে সমুদ্রে বাস করতো; সে লম্বায় প্রায় ১১ ফুট, পাখনা ছড়ালে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ১২ ফুটের মতো।

বর্তমান যুগের কুমিরের পূর্বপুরুষ ক্রিটেশাস কল্পে বাস করতো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে যে সুবিশাল কুমিরের ফসিল পাওয়া গেছে, তার মাথা ৬ ফুট লম্বা, শরীর সম্ভবত ৪০-৫০ ফুট।

অনেক সামুদ্রিক সরীসৃপ মধ্যজীবীয় অধিকল্পের শেষে পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে



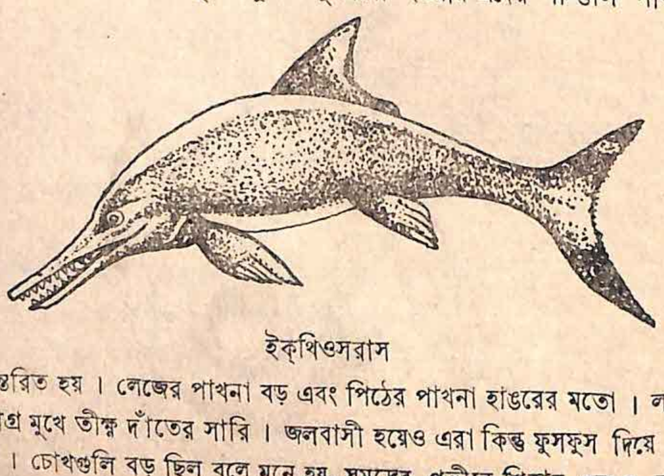
ইলাস্‌মোসরাস

যায়। এদের মধ্যে প্লিসিওসর অন্যতম। প্লিসিওসরের পা-গুলি নৌকোর দাঁড়ের মতো। সাঁতারের কাজে এদের লম্বা লেজ কিন্তু তেমন সাহায্য করতো বলে মনে হয় না; নৌকোর দাঁড় যেমন করে টানা হয় সেভাবে পা চালিয়ে এরা সাঁতার দিত। পা-গুলি দাঁড়ের মতো বলে এরা সহজে শরীর ঘোরাতে-বাঁকাতে পারতো না যেমন মাছ পারে; তবে এদের গলা লম্বা বলে শিকার ধরার কাজে সুবিধা ছিল। শরীর চ্যাপ্টা ধরনের ও প্রায় ১০ ফুট। মাংসাশী প্রাণীগুলির মুখে তীক্ষ্ণ দাঁতের সারি। প্লিসিওসরের পাকস্থলিতে পাথর ছিল; এরা পাথর গিলে ফেলত ও সেই পাথর খাবারকে পিষে ভাঙ্গার কাজে সাহায্য করতো (gastrolith)। ক্রিটেশাস কল্পের ইলাস্‌মোসরাস লম্বায় ৫০ ফুট এবং তার বিরাট লম্বা গলা ছিল শরীরের প্রায় অর্ধেক। ক্রোনোসরাস নামে আর এক রকম প্লিসিওসরের গলা কিন্তু লম্বা ছিল না। তার দৈর্ঘ্য ৪০-৫০ ফুট, মাথা প্রায় ৯ ফুট।

আকারে ও গঠনে কতকটা সিন্ধুঘোটকের মতো এক সামুদ্রিক সরীসৃপ ছিল, যার নাম প্ল্যাকোডাস। দাঁতগুলি চ্যাপ্টা বলে মনে হয়, সে ঝিনুকের খোলা ভেঙ্গে খেত। সে সম্ভবত তার শরীর টেনে ডাঙাতেও আসত, যেমন সিন্ধুঘোটক করে থাকে।

সেই যুগের সমুদ্রে মোসাসর বা টাইলোসর নামে গিরগিটির মতো সরীসৃপ বাস করতো। তাদের মধ্যে টাইলোসরাস প্রায় ৩০ ফুট লম্বা। বুক ও পেটের নিচে পাখনা থাকলেও সে প্রধানত লেজের আন্দোলনে সাঁতার দিত। মাংসাশী প্রাণীটির মুখে ধারালো দাঁত। কেউ কেউ বলেছেন যে, তার গায়ে সাপের মতো আঁশ থাকতেও পারে।

জলবাসী সরীসৃপদের মধ্যে ইক্‌থিওসরের লেজ ও পাখনা অনেকটা মাছের মতো বলে এরা সাঁতারে খুব পটু। সমুদ্রগামী হওয়ায় এদের পা-গুলি পাখনায়



ইক্‌থিওসরাস

রূপান্তরিত হয়। লেজের পাখনা বড় এবং পিঠের পাখনা হাঙরের মতো। লম্বা ও সূক্ষ্মাগ্র মুখে তীক্ষ্ণ দাঁতের সারি। জলবাসী হয়েও এরা কিন্তু ফুসফুস দিয়ে শ্বাস নিত। চোখগুলি বড় ছিল বলে মনে হয়, সমুদ্রের গভীরে শিকার ধরতে সুবিধা

হতো। ইক্‌থিওসর সাধারণত ১০-১৫ ফুট লম্বা, তবে আমেরিকার নেভাডা থেকে ৪০ ফুটের চেয়েও বড় প্রাণীর ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে।

ডাইনোসরের রাজত্বকালে নানা রকম পতঙ্গ ছিল। উই (termite), ফড়িং ও গুবরেপোকা (beetle) জাতীয় পতঙ্গের নিদর্শনও পাওয়া গেছে।

জুরাসিক ও ক্রিটেশাস কল্পে প্যান্‌গিয়া ভেঙ্গে গেলে জলবায়ুতে ঋতুর প্রভাব হ্রাস পায়। তখন সমুদ্রে সাস্‌পেন্‌শন-ফিডার প্রাণীদের মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। বহু পূর্বে অর্ডোভিশিয়ান কল্পে ভূখণ্ড ভাঙ্গনের সময় যেসব সাসপেন্‌শন-ফিডারের আবির্ভাব হয়েছিল, এই নতুন প্রাণীগুলি কিন্তু ঠিক তাদের মতো নয়। যদিও এদের মধ্যে ব্র্যাকিওপড ও ক্রিনয়েড ছিল, তবে দুই-খোলা যুক্ত মোলাস্ক্‌ বা ঝিনুক জাতীয় প্রাণী হলো সর্বপ্রধান। ঝিনুকের মধ্যে নানারকম প্রাণী নানাভাবে—থাকে কোনো কোনো clam থাকে বালি বা কাদার মধ্যে, mussell বা oyster নিজ দেহের একরকম চটচটে সুতা বা আঠালো জিনিস দিয়ে সমুদ্রের নিচে মেঝেতে (sea floor) আটকে থাকে, আর scallop জলের মধ্যে থাকে স্বাধীনভাবে।

কম্বোজ বা মোলাস্ক্‌দের ভেতরে মৃতদেহ-ভক্ষক এবং শিকারী প্রাণীও ছিল। গ্যাস্ট্রোপড বা শামুকদের (এক-খোলা যুক্ত মোলাস্ক্‌) মধ্যে কেউ নিরামিষ-ভোজী, কেউ মাংসাশী, কেউবা শবভূক। মাংসাশী ও শবভুক কম্বোজের ভেতরে নানারকম সেফালোপড (শিরস্পদী) ছিল, যারা সমুদ্রের একেবারে নিচে খাদ্য-সন্ধানে বিচরণ করতো। সেফালোপডের মধ্যে নানারকম অ্যামোনাইট প্রাণীর ফসিল পাওয়া গেছে। অ্যামোনাইটের কঠিন দেহাবরণ ছিল বর্তুলাকার বা আবর্তের মতো (spiral)। প্রকৃতির এক অদ্ভুত সৃষ্টি এর দেহাবরণ। কলকাতার যাদুঘরে রাখা অ্যামোনাইটের ফসিল দেখে ঘূর্ণিঝড় বা মহাকাশের ঘূর্ণি-নীহারিকার (spiral nebula) কথা মনে পড়ে। প্রকৃতিদেবী এখানে একই আবর্তের মধ্য দিয়ে বৃহৎ ও ক্ষুদ্রকে রূপ দিয়েছেন।

ক্রিটেশাস কল্পের শেষে বিরাটাকার সামুদ্রিক সরীসৃপ ও নানারকম জলজ প্রাণী পৃথিবীর বুক থেকে মুছে গেল। পরবর্তীকালে অর্থাৎ নরজীবীয় অধিকল্পের সমুদ্রজগতে মাছেরা প্রধান হয়ে ওঠে, আর জলজ সরীসৃপদের স্থান নেয় সীল, সিন্ধুঘোটক, তিমি ও শুশুক প্রভৃতি স্তন্যপায়ী জীব।

উদ্ভিদজগতের ইতিহাসে দেখা যায় যে, পুরাজীবীয় অধিকল্প থেকে বহু কাল পর্যন্ত গাছেরা বংশবিস্তারের জন্যে 'রেণু' (spore) ছড়াত, অথবা বীজ ফেলতো। বীজওয়ালা গাছ উন্নত হলেও সেই যুগে তার বংশবিস্তার হতো আদিম প্রক্রিয়ায়—শরীরের এক জায়গা থেকে পুং-পরাগ (male pollen) হাওয়ায় ভেসে গিয়ে শরীরের অন্য অংশে স্ত্রী-ডিম্বাণুর (female egg cell) সঙ্গে মিলিত হতো। অর্থাৎ তখন গাছের বংশবিস্তার নির্ভর করতো হাওয়ার ওপরে। কিন্তু ক্রিটেশাস কল্পে জন্ম নিল এক নতুন রকম গাছ। এর শরীরে এমন বিশেষ অংশ

তৈরি হলো যার মধ্যে পরাগ ও ডিম্বাণু কাছাকাছি থাকে। তাই বীজের সহজে পরাগিত হওয়া সম্ভব। গাছের এই বিশেষ অংশগুলি হলো ফুল। ফুলের পাপড়ি হাওয়ায় একটু তুললে বা পতঙ্গ বসলে, তার সাহায্যে পরাগমিলন হতো। বর্তমান যুগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পতঙ্গের সাহায্যে পরাগমিলন হয়; একই ফুলের মধ্যে পরাগমিলনের দৃষ্টান্ত কম। তাই, পতঙ্গকে প্রলুব্ধ করার জন্যে ফুলের নানা বর্ণ ও গন্ধ এবং অনেক ফুলের মধ্যে মধু থাকে। তবে, পৃথিবীতে প্রথমে যে ফুলের জন্ম হয়েছিল, তা বোধ হয় গন্ধহীন এবং তার রং সম্ভবত শুধু সবুজ, হলুদ বা শাদা ছিল। অল্পকালের মধ্যে তাদের বর্ণে ও গন্ধে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হলো। তাই আমরা বলতে পারি যে রূপ, বর্ণ ও গন্ধ সৃষ্টির পিছনে ছিল প্রয়োজনের তাগিদ এবং সেই প্রয়োজন হলো বংশবিস্তার। নিজের জন্যে ঐ একই প্রয়োজনের কথা (multiplication of plant and animal species) প্রাচীন মানুষ ও বর্তমান যুগের কোনো কোনো আদিবাসী প্রকাশ করেছে যক্ষ-যক্ষীর মূর্তি অথবা লিঙ্গ-রূপ প্রতীকের মাধ্যমে।

সমস্ত জীবজগতে এক বিরাট বিপর্যয় ঘটে ক্রিটেশাস কল্পের শেষে। সমুদ্রে সরীসৃপ ও সেফালোপড প্রভৃতি বহু প্রাণী লুপ্ত হয়ে যায়। স্থলে এবং অন্তরীক্ষে প্রায় একই সময় ডাইনোসর ও টেরোসর লোপ পায়। এই বিরাট বিপর্যয়ের কারণ সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেছেন যে, স্তন্যপায়ী প্রাণীরা ডাইনোসরের ডিম খেয়ে নিত, কারো মতে জলবায়ুর পরিবর্তনে ডাইনোসরের সন্তান-উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়। আবার কারো মতে, কোনো সংক্রামক ব্যাধি এর জন্যে দায়ী। কতকগুলি মত সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

ডাইনোসর অবলুপ্তির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন যে, স্তন্যপায়ী প্রাণীরা তাদের ডিম খেয়ে নিত, যার ফলে তাদের বংশবৃদ্ধির হার কমে গিয়েছিল। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন যে, তারা নিজেদের ডিমকে অনেক সময় বালি চাপা দিলেও, পাখি তার ডিমের ওপরে যতটা যত্নশীল, তারা সেই যত্ন নিত না। কিন্তু ঐ যুগে স্তন্যপায়ীরা এত ছোট ও নগণ্য ছিল যে, তারা ডাইনোসরের ডিম নষ্ট করার জন্যে কতটা দায়ী, সে বিষয়ে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

অনেক বিজ্ঞানী মধ্যজীবীয় অধিকল্পের শেষে জলবায়ু জনিত উদ্ভিদজগতের পরিবর্তনকে ডাইনোসরের অবলুপ্তির জন্যে দায়ী করেছেন।

আবহাওয়ার পরিবর্তনে জলাভূমি ও হ্রদ শুকিয়ে যায়, এবং বাতাস আরো ঠাণ্ডা হয়। জলা ও হ্রদ শুকিয়ে যাওয়ায় বিরাটাকার উদ্ভিদভোজী ডাইনোসরগুলির বিবরণ ক্ষেত্র আর রইল না। উদ্ভিদভোজীদের ক্রম অবলুপ্তির ফলে খাদ্যাভাবে মাংসাশী ডাইনোসরগুলির অস্তিত্ব হ্রাস পেল।

অন্য মতানুসারে, ডাইনোসরের রক্ত শীতল বলে জলবায়ু ঠাণ্ডা হওয়ায় তাদের জীবনসমস্যা দেখা দিয়েছিল। বৃহদাকার বলে তারা গর্তে বা গুহায় লুকিয়ে

থাকতে পারতো না। বেশি ঠাণ্ডায় সরীসৃপ কাবু হয়ে পড়ে এবং আত্মরক্ষা করতে পারে না। ডাইনোসরের ডিমগুলিও সম্ভবত বেশি ঠাণ্ডার জন্যে ফুটত না, এবং প্রায়ই ঠাণ্ডা পড়ার জন্যে ডিমের খোলা পাতলা হয়ে গিয়েছিল, যার ফলে ডিম নষ্ট হয়ে যেত।

জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে নতুন রকম গাছপালার উদ্ভব হয়েছিল। এই নতুন গাছগুলির গোড়া ও পাতা আরো শক্ত হওয়ায়, উদ্ভিদভোজী ডাইনোসর তা খেতে পারতো না বলে কোনো কোনো বিজ্ঞানীর বিশ্বাস। খাদ্য সরবরাহে বিপর্যয়ের ফলে উদ্ভিদভোজী ও মাংসাশীরা ক্রমে ক্রমে লোপ পেয়েছিল। ফুল-গাছের উদ্ভব এর একটা কারণ ছিল বলে, কেউ কেউ মনে করেন (তাহলে কি 'beauty'-র কাছে 'beast'-এর পরাজয় হয়েছিল) ! তাঁরা বলেন যে, নতুন গাছ খেতে গিয়ে ডাইনোসরের দাঁত ক্ষয়ে যায় বা তাদের নানা রোগ হয়। কিন্তু এর কোনো প্রমাণ আজ পর্যন্ত আমরা পাইনি। বরং লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে ফুলগাছ খেয়ে উদ্ভিদভোজী ডাইনোসরগুলির মধ্যে যে বিরাট বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছিল, সেকথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে ? তাই ফুলওয়ালা গাছের জন্যে ডাইনোসর অবলুপ্তির ব্যাখ্যাকে মানতে দ্বিধা হয়।

শুধুমাত্র ডাঙার ঘটনা বলে জীবজগতের এই বিরাট বিপর্যয়ের ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না, কারণ ক্রিটেশাস কল্পের শেষে শুধু ডাইনোসর নয়, বহু সামুদ্রিক প্রাণীও পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় নিয়েছিল।

প্যান্‌গিয়ার অংশগুলি যখন ক্রিটেশাস কল্পের শেষে তাড়াতাড়ি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে গেল, তখন সাগরজল উপকূল প্লাবিত করলো এবং জলবায়ু হলো আরো সামুদ্রিক ভাবাপন্ন। কিন্তু এই ভূখণ্ড-ভাঙ্গনের গতি ক্রিটেশাস কল্পের শেষে মন্দীভূত হলো। ফলে জলবায়ুতে ঋতুর প্রভাব তীব্রতর হলো।

সাম্প্রতিক কালে কোনো কোনো বিজ্ঞানী মনে করেন যে, পৃথিবীর আবহাওয়ায় কোনো স্বল্পস্থায়ী কিন্তু ভয়ংকর পরিবর্তন জীবজগতের বিপর্যয়ের জন্যে দায়ী।

জলবায়ুর এরকম পরিবর্তন মহাকাশের কোনো রশ্মির আকস্মিক বিকিরণের ফলে হয়েছিল বলে, কয়েকজন বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন। ক্যানাডার ডেল রাসেল (Dale Russell) বলেছেন যে, মহাবিশ্বে কোনো সুপারনোভার (Supernova) বিস্ফোরণ এর জন্যে দায়ী হতে পারে।

গত চার হাজার বছর ধরে কমপক্ষে ৭ বার আকাশে অদ্ভুত উজ্জ্বল তারকার আকস্মিক আবির্ভাব লক্ষ্য করা গেছে। ঐ তারকা এত উজ্জ্বল যে, দিবালোকেও দৃশ্যমান। এদের নাম সুপারনোভা এবং এদের সৃষ্টির কারণ—তারকার বিস্ফোরণ। কোনো বিরাট তারকার অভ্যন্তরভাগের (core) ঘনত্ব (density) ও তাপমাত্রা যদি অত্যধিক হয়ে ওঠে, তবে ঐ তারকার বিস্ফোরণ ঘটে। ফলে, সেখান থেকে মহাজাগতিক রশ্মি (cosmic ray), 'গামা' রশ্মি এবং রঞ্জন-রশ্মি বা এক্স্‌-রে

বিচ্ছুরিত হয়। পৃথিবীর বুকে গামা-রশ্মির বিকিরণ খুব বেশি হলে, তার ফল হয় মারাত্মক। আর রঞ্জন-রশ্মি যদি খুব বেশি আসে, তবে বায়ুমণ্ডলে বিপর্যয় হতে পারে। রাসেল মনে করেন যে, তার ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপধারণ শক্তি বিপর্যস্ত হয়, ঝড় হতে থাকে, ও জলবাহী মেঘ খুব ওপরে উঠে জমে গিয়ে হয় বরফের মেঘ। ফলে, সারা পৃথিবীর তাপমাত্রা হ্রাস পায় ও বহু প্রাণীর অবলুপ্তি ঘটে। তবে, তাঁর এই ব্যাখ্যার স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক পণ্ডিত ওয়ালটার আলভারেজ (Walter Alvarez) ইটালির গুব্বিও-র নিকট একটি সামুদ্রিক গিরিখাতে (ocean canyon) পরীক্ষাকার্য চালাবার সময় চুনাপাথরের স্তরে ইরিডিয়ামের পরিমাণ খুব বেশি পেয়েছেন। ডাইনোসর-অবলুপ্তির যুগের সেই পাথরে ইরিডিয়ামের পরিমাণ আকস্মিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই উপাদানের পরিমাণ পৃথিবীর চেয়ে মহাকাশের বস্তুপিণ্ডে বহুগুণ বেশি। স্তরটি পরীক্ষা করে আলভারেজ বলেছেন যে, সেই যুগে পৃথিবীর চৌম্বক-ক্ষেত্রে (magnetic field) অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছিল। চৌম্বকক্ষেত্রে পরিবর্তনের ফলে জলবায়ুতে পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক।[১] তাই কেউ কেউ মনে করেন যে, মহাকাশ থেকে আগত কোনো কিছুর প্রভাবে জলবায়ুতে পরিবর্তনের ফলে বহু প্রাণীর অবলুপ্তি হয়েছিল।

জীবজগতের এই বিরাট বিপর্যয়ের সঠিক কারণ নির্ণয় আজও সম্ভব হয়নি।

উল্লেখপঞ্জি

১. 'Doomed Dino' – published in TIME, July 16, 1979.

১২

নবজীবীয় অধিকল্প

প্যালিওসিন (৬.৫ থেকে ৫.৩/৫.৪ কোটি বছর আগে)
ইওসিন (৫.৩/৫.৪ থেকে ৩.৭/৩.৮ কোটি বছর আগে)
অলিগোসিন (৩.৭/৩.৮ থেকে ২.২৫ কোটি বছর আগে)
মায়োসিন (২.২৫ কোটি থেকে ৫৬ লক্ষ বছর আগে)
প্লায়োসিন (৫৫ লক্ষ থেকে ১৮.৭ লক্ষ বছর আগে)
প্লিস্টোসিন (১৮.৭ লক্ষ থেকে ১০ হাজার বছর আগে)

মধ্যজীবীয় অধিকল্পের শেষে জীবজগতে যে বিরাট পরিবর্তন হয়েছিল, তা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। প্রধানত, আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে পৃথিবী থেকে ডাইনোসর এবং বিরাটাকার জলচর ও খেচর সরীসৃপ লুপ্ত হয়ে যায়। সরীসৃপ-দের অবলুপ্তির পরে নবজীবীয় অধিকল্পে হয় স্তন্যপায়ীদের অগ্রগতি। নবজীবীয় অধিকল্পে ডাঙায় হলো স্তন্যপায়ীদের প্রাধান্য

সদ্যোজাত স্তন্যপায়ী ও ডিম ফোটা সরীসৃপ শাবকের মধ্যে স্তন্যপায়ীর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা আরো বেশি। আদিম স্তন্যপায়ী জীব ছোট হলেও তারা সন্তানের লালনপালনে যে যত্ন নিত সরীসৃপ তা করে না। অধিকাংশ সরীসৃপ ডিম পাড়ার পরে ডিম ছেড়ে চলে যায়। তাই, সরীসৃপ শাবককে প্রথম থেকে আত্মনির্ভর হতে হয়। মধ্যজীবীয় অধিকল্পের শেষে শীতল জলবায়ুতে সদ্যোজাত সরীসৃপ-শাবকদের প্রাণধারণে বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছিল এবং তাদের অনেকেই বড় হওয়ার আগে মরে গেল। কিন্তু স্তন্যপায়ীর ক্ষেত্রে মা নিজের সন্তানকে রক্ষা করে যতদিন পর্যন্ত সে আত্মনির্ভর না হয়। সদ্যোজাত আদিম স্তন্যপায়ীশাবক মায়ের দুধ খেত এবং মা তার শরীর গরম করে রাখতো বলে তাদের একটা বড় সুবিধা ছিল। স্তন্যপায়ীর আর একটা সুবিধা এই যে, সবরকম আবহাওয়ার মধ্যে তার রক্তের তাপমাত্রা থাকে সমান। কিন্তু সাপ, গিরগিটি প্রভৃতি সরীসৃপের রক্ত শীতে এত ঠাণ্ডা হয়ে যায় যে, তারা কাবু হয়ে পড়ে এবং আত্মরক্ষা করতে পারে না ; তাই, অনেক সরীসৃপ সারা শীতকাল গর্তে ঘুমিয়ে কাটায়। স্তন্যপায়ীর গায়ে লোম থাকে বলে তা শরীরের উত্তাপকে রক্ষা করে (তিমি বা হাতির গায়ে লোম না থাকলেও চর্বির পুরু স্তর তাপকে দেহ ছেড়ে বাইরে যেতে দেয় না)। স্তন্যপায়ীর বুদ্ধিও সরীসৃপের চেয়ে বেশি। আদিম স্তন্যপায়ীদের প্রস্তরীভূত করোটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাদের মস্তিষ্ক সরীসৃপের চেয়ে উন্নত ছিল।

দেহগত দিক থেকে স্তন্যপায়ী ও সরীসৃপের মধ্যে অনেকগুলি পার্থক্য আছে। স্তন্যপায়ীদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো চোয়াল; সমস্ত নিচের চোয়াল একটি হাড় দিয়ে তৈরি এবং এই হাড়ের ওপরে দাঁতগুলি যুক্ত বলে এর নাম 'dentary bone'। চোয়ালের অন্য হাড়গুলি রূপান্তরিত হয়ে কানের ভেতরের অঙ্গ বা 'middle ear' হয়েছে। শুধু তাই নয়, এদের দাঁতগুলি বিভিন্ন কাজের উপযোগী হতে গিয়ে বিভিন্ন আকার নিয়েছে। মুখের সামনে থাকে কর্তকদন্ত (incisor) – খাদ্যবস্তু কর্তন করার জন্যে স্তন্যপায়ীরা এই দাঁত ব্যবহার করে। কর্তকদন্তের দুই পাশের দিকে সাধারণত থাকে ছেদকদন্ত বা শ্বদন্ত (canine) যা লম্বা ও সূক্ষ্মাগ্র – খাদ্যবস্তু ছেদনের কাজে এর ব্যবহার করা হয়, মাংসাশী প্রাণীরা শিকারের সময় এই দাঁতের সাহায্য নেয়। স্তন্যপায়ীদের গালের ভেতর দিকে একেবারে পিছনে থাকে পেষকদন্ত (molar) যা খাদ্য পেষণে বা চর্বণে সাহায্য করে। পেষকদন্ত ও ছেদকদন্তের মাঝে থাকে পুরঃপেষকদন্ত (premolar)।

স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ীর উদ্ভব। তবে, স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীসৃপগুলির দেহের উষ্ণতা বেশি ছিল মনে হয় না। ব্যাকার (Robert Bakker) বলেছেন, তাদের উষ্ণতা ছিল সম্ভবত ২৮ থেকে ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে।

প্রাচীনতম স্তন্যপায়ীদের যে নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলির দাঁত ও চোয়ালের গড়ন থেকে বোঝা যায় যে, তারা স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীসৃপের চেয়ে ছোট ছিল। স্তন্যপায়ী জীব ছোট হলে তার গায়ে তাপমাত্রা রক্ষার জন্যে লোম থাকা দরকার, কারণ ক্ষুদ্রাকৃতি দেহের তাপধারণ ক্ষমতা কম।

সেই আদিযুগের স্তন্যপায়ীরা সম্ভবত ডিম প্রসব করতো, যেমন অস্ট্রেলিয়ার হংসচঞ্চু প্লাটিপাসের মধ্যে আজও দেখা যায়। ডিমগুলি ছিল খুব ছোট। ডিম ফুটতো কম সময়ের মধ্যে, আর সদ্যোজাত শাবকগুলি ছিল অসহায়।

আদিম স্তন্যপায়ীর ক্ষুদ্রাকৃতি শাবকদের দেহ উষ্ণ রাখা একটা সমস্যা। মনে হয় এরা শরীর উষ্ণ রাখতে পক্ষীশাবকের মতো মায়ের ওপর নির্ভরশীল ছিল। ডিম ও শাবকের আকার ছোট বলে মায়ের পক্ষে তার জন্যে প্রয়োজনীয় উষ্ণ ও আর্দ্র পরিবেশ সৃষ্টি করা সহজ।

যদি সেই আদিম স্তন্যপায়ী শাবকের জীবন সমস্যা পক্ষীশাবকের মতো হয়, তবে তার সমাধান হয়েছিল সম্ভবত একভাবে। ডিমে তা' দিয়ে ফোটানো এবং সন্তানের দেহ উষ্ণ রাখার জন্যে পাখিদের পেটের কাছে পাতলা পালখে ঢাকা একটা চাপড়ার মতো অংশ থাকে, যার নাম 'brood patch'; এই ব্রুড-প্যাচকে একটা আশ্রয় বলা চলে। স্তন্যপায়ী সদৃশ কোনো কোনো সরীসৃপের পেটে এরকম তা' দেবার চাপড়া (incubation patch) ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। মনে হয়, ইনকিউবেশন-প্যাচ থেকে হয়েছিল স্তন্যপানের উৎপত্তি। যদি কোনো গ্রন্থি (gland) থেকে নির্গত তরল পদার্থ ইনকিউবেশন-প্যাচকে

ভিজিয়ে উষ্ণ করে তোলে, তবে সেই তরল বস্তুকে লেহন করে ক্ষুদ্র শাবক নিজ দেহ উষ্ণ রাখতে পারে। বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ গ্রন্থি যদি উন্নত হয়ে ওঠে ও সেখান থেকে খাদ্যগুণে পূর্ণ তরল পদার্থ নির্গত হয়, তবে সন্তানের পক্ষে আরো সুবিধা। এই যুক্তির ভিত্তিতে অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যে, ইনকিউবেশন-প্যাচ্ থেকে ক্রমে ক্রমে বুকের দুধ খাওয়ানো আরম্ভ হয়েছিল।

স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীসৃপ সাইনোডন্টের মুখে তালুর আনুষঙ্গিক যে অতিরিক্ত অংশ বা সেকেণ্ডারি প্যালেট ছিল (যেমন স্তন্যপায়ী জীবের থাকে), তার জন্যে সে খাদ্য চর্বণের সময়েও শ্বাস নিতে পারতো।

নবজীবীয় অধিকল্পে জীব বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনার আগে স্তন্যপায়ীদের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যে মোনোট্রিম বর্গ হলো অতি আদিম। সরীসৃপের মতো এরা ডিম প্রসব করে। ডিম হতে জাত শিশু খুব ছোট। মোনোট্রিমের দুগ্ধ গ্রন্থিতে (mammary gland) বৃন্ত নেই। গায়ের চামড়ার কিছু অংশ থেকে দুধ আসে। এদের মল-নিষ্কাশনপথ এবং পুং-জননকোষ বা স্ত্রী-ডিম্বকোষের গমনপথ একই জায়গায় এসে খুলেছে, যার নাম cloaca (এরকম cloaca থাকে সরীসৃপ ও পাখিদের)। এজন্যে এই স্তন্যপায়ীদের সাধারণ নাম মোনোট্রিম। ট্রায়াসিক কল্পের আদিম স্তন্যপায়ীদের জন্ম ও লালনপালন অনেকটা মোনোট্রিম জাতির মতো ছিল বলে মনে হয়। অস্ট্রেলিয়ার হংসচঞ্চু প্লাটিপাস ও কাঁটাওয়ালা পিপীলিকাভুক (একিড্না) মোনোট্রিম জাতির অন্তর্গত।

ক্যাঙ্গারু প্রভৃতি যে প্রাণীগুলির তলপেটে থলি (marsupiam) থাকে, তাদের বলে মারস্যুপিয়্যাল্। এক সময় এই মারস্যুপিয়্যাল্ বর্গের প্রাণীরা ছিল স্তন্যপায়ী বিবর্তনের প্রধান ধারা। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যে, প্রথম স্তন্যপায়ী আবির্ভাবের কিছুকাল পরে মোনোট্রিম বর্গ সেই বিবর্তনের প্রধান ধারা থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল। প্রথম দিকে মোনোট্রিম প্রাণীর সঙ্গে মারস্যুপিয়্যাল্দের সম্ভবত একটা সম্বন্ধ ছিল, কারণ প্রসবের আগে একিড্নার দেহে আদিম থলির মতো একটা অংশ তৈরি হয়।

মারস্যুপিয়্যাল্রা ডিম পাড়ে না। কিন্তু এদের শাবক জন্মের সময় খুব ছোট থাকে। তখন সে এত অসহায় যে, তাকে মাতৃগর্ভের মতো অন্য কোনো নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিতে হয়; তাই ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মা তাকে তলপেটের থলির মধ্যে রেখে দেয়। থলির মধ্যে স্তনবৃন্ত থাকে এবং সেখান থেকে সে দুগ্ধপান করে ও ক্রমে বড় হয়।

তলপেটের থলি সামনের দিকে অথবা পিছনের দিকে খোলা। যারা লাফিয়ে চলে বা গাছে ওঠে, তাদের থলি সাধারণত সামনের দিকে খোলা, যেমন ক্যাঙ্গারু-দের হয়। আর যারা খাদ্যসন্ধানে দৌড়াদৌড়ি করে অথবা গর্তে থাকে, তাদের

থলি পিছন দিকে খোলা, যেমন টাসমানিয়ার মাংসাশী জীব (Tasmanian Devil) ও অস্ট্রেলিয়ার গর্তবাসী প্রাণী উম্‌ব্যাট ; তবে এর ব্যতিক্রমও আছে, যেমন ছোট ভালুকের মতো কোয়ালা গাছে থাকলেও তার থলি পিছন দিকে খোলা ।

বর্তমান যুগে মারস্যুপিয়্যাল পাওয়া যায় প্রধানত অস্ট্রেলিয়ায় । তবে, দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকাতেও আপোসাম বলে মারস্যুপিয়্যাল বাস করে ।

অতি প্রাচীনকালে ডাইনোসরের যুগেও মারস্যুপিয়্যাল ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে । পরে উন্নত জাতির স্তন্যপায়ীদের সঙ্গে জীবনযুদ্ধের প্রতিযোগিতায় তারা পরাজিত হয় এবং প্রায় সব মহাদেশ থেকে লুপ্ত হয়ে যায় । এখন শুধু অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকায় তারা টিকে আছে ।

সবচেয়ে উন্নত যে স্তন্যপায়ী তাদের বলে প্ল্যাসেন্টাল (Placental) জাতি । এই প্রাণীগুলির সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গর্ভের মধ্য থেকে প্ল্যাসেন্টা (গর্ভের ফুল) বলে এক রকম বিশেষ টিস্যুর সাহায্যে মাতৃদেহ হতে সরাসরি খাদ্য গ্রহণ করে। এই স্তন্যপায়ীদের ভূমিষ্ঠ সন্তান মোনোট্রিম বা মারস্যুপিয়্যাল শাবকের মতো অতি ক্ষুদ্র হয় না ।

প্ল্যাসেন্টাযুক্ত স্তন্যপায়ীদের আবির্ভাব হয় মারস্যুপিয়্যালের পরে। মারস্যুপিয়্যাল ও প্ল্যাসেন্টাযুক্ত স্তন্যপায়ী এক সাধারণ আদিপুরুষ থেকে উদ্ভূত বলে কোনো কোনো বিজ্ঞানী মনে করেন । সম্ভবত ক্রিটেশাস কল্পে প্ল্যাসেন্টাযুক্ত প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছিল । এদের মধ্যে আছে নানা বর্গের প্রাণী। প্রধান প্রধান বর্গ সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ।

Insectivora বা কীটভুক ॥ এই বর্গের প্রাণীদের মধ্যে ছুঁচো, মোল্ ও কাঁটাচুয়া (hedgehog) অন্যতম । এই বর্গের প্রাণীদের মুখ সরু ; অনেকের নাক এত লম্বা যে প্রায় শুঁড়ের মতো দেখায় । এদের সব রকম দাঁতই আছে, যেমন থাকে মাংসাশী জীবের এবং সব দাঁত ধারালো । ছুঁচো ও মোলের চোখ খুবই ছোট । মোলের বড় বড় নখযুক্ত পা কোদালের মতো বলে মাটিতে গর্ত করতে সাহায্য করে । কীটভুক প্রাণীরা প্রধানত নিশাচর । দৃষ্টিশক্তি কম থাকায় শ্রবণশক্তির ওপর নির্ভর করে । পণ্ডিতরা মনে করেন যে, কীটভুকদের সঙ্গে বর্তমান যুগের অন্য বর্গের প্রাণীদের যতটা সম্বন্ধ আছে, তার চেয়েও বেশি সম্বন্ধ ছিল অতি আদিম যুগের কয়েক জাতীয় স্তন্যপায়ীর সঙ্গে, যারা আজ লুপ্ত হয়ে গেছে ।

Chiroptera বা করপক্ষ বর্গ ॥ বাদুড় হলো এই বর্গের অন্তর্গত। বাদুড়ের ডানা চামড়ার ঝিল্লি দিয়ে তৈরি । দুটি ডানা হাত থেকে পা পর্যন্ত বিস্তৃত, আর হাতের চারটি আঙুল এই চামড়ার সঙ্গে জোড়া । মধ্যজীবীয় অধিকল্পের খেচর সরীসৃপ টেরোসর যেমন ডানা ছড়িয়ে শূন্যে ভেসে যেত (gliding), বাদুড় কিন্তু ডানা নেড়ে শূন্যে উড়ে যায় (flying) ।

Edentata বা অদন্ত বর্গ ॥ দক্ষিণ আমেরিকার পিপীলিকাভুক, বৃক্ষবাসী শ্লথ ও বর্মযুক্ত প্রাণী আর্মাডিলো এই বর্গের মধ্যে পড়ে। পিপীলিকাভূকের কোনো দন্ত নেই। শ্লথ এবং আর্মাডিলোর পেষকদন্ত থাকলেও তাতে এনামেল নেই। সেগুলি শুধু ডেণ্টাইনের খণ্ড।

Rodentia বা তীক্ষ্ণ-দন্ত বর্গ ॥ এই প্রাণীগুলি Rodent নামে সাধারণভাবে পরিচিত ; রোডেণ্টদের ওপর ও নিচের পাটিতে এক জোড়া করে লম্বা কর্তক দন্ত থাকে যা বাটালির মতো ধারালো। দাঁতগুলির সামনের দিকে এনামেল খুব বেশি। কর্তকদন্ত ব্যবহার করতে করতে পিছন দিকটা বেশি ক্ষয়ে যায় বলে, এই দাঁত সব সময় খুব তীক্ষ্ণ থাকে।

এই বর্গের প্রাণীদের মধ্যে ইঁদুর, কাঠবিড়াল, সজারু, মরুভূমির লাফানে ইদুর বা জারবোয়া, বিভার (উত্তর আমেরিকা এবং উত্তর ইয়োরোপ) এবং দক্ষিণ আমেরিকার ক্যাপিবরা, কেভি বা গিনিপিগ, চিঞ্চিলা প্রভৃতি অন্যতম। আবার, উত্তর এশিয়া ও উত্তর আমেরিকার মার্মোট্ বা উড্চাক, চিপ্মুঙ্ক্ প্রভৃতি কাঠ-বিড়াল সদৃশ রোডেণ্টদের মধ্যে অনেকের গালে থলি আছে ; ইয়োরোপের হ্যাম্স্টারদেরও গালে আছে থলি। চিঞ্চিলার নরম লোম দিয়ে কোট, কেপ্ ইত্যাদি দামী পোশাক তৈরি হয়।

রোডেণ্ট প্রাণীগুলি সব সময় কর্তকদন্ত দিয়ে ঘাস, পাতা, গাছের গা, কাঠ, শস্যের থলি প্রভৃতি কোনো-না কোনো জিনিস কাটে, কারণ তা না হলে এই দাঁত ক্রমাগত বড় হতে হতে এত বিরাট হয়ে যাবে যে, এরা আর মুখ বন্ধ করতে পারবে না ; কিন্তু এদের কোনো ছেদকদন্ত নেই। অধিকাংশ রোডেণ্টের পায়ে পাচটি আঙ্গুল।

Langomorph বা শশকবর্গ ॥ রোডেণ্টের সঙ্গে এই বর্গের প্রাণী খরগোশ ও পাইকার অনেক সাদৃশ্য আছে। কিন্তু রোডেণ্টদের ওপর ও নিচের পাটিতে যেমন এক জোড়া করে লম্বা কর্তকদন্ত থাকে, এই প্রাণীগুলির ওপর পাটিতে প্রথম জোড়ার পিছনে থাকে আর এক জোড়া অতিরিক্ত কর্তকদন্ত।

Carnivora : স্থলচর মাংসাশী প্রাণীদের ভেতর প্রধান গোত্র (family) হলো বিড়াল (Felidae), কুকুর (Canidae) ও ভালুক (Ursidae)। আর জলচর মাংসাশীদের মধ্যে আছে সীল।

মাংসাশী জীবের ছেদকদন্ত লম্বা ও সূক্ষ্মাগ্র এবং শিকারের কাজে তা সাহায্য করে। ছেদকদন্তের পিছনে যে পুরঃপেষকদন্ত ও পেষকদন্ত থাকে, তাদের সাধারণত cheek tooth বা কষের দাঁত বলে। ওপর ও নিচের পাটির কষের দাঁতগুলির মধ্যে প্রত্যেক পাশে একটি করে দাঁত বেশি বড় এবং বেশি তীক্ষ্ণ। এই চারটি দাঁতের নাম carnassial।

তৃণভোজীরা ঘাসপাতা চিবিয়ে বা পিষে খায় বলে, এদের কষের দাঁত চ্যাপ্টা

ধরনের অর্থাৎ তা খাদ্য পেষণের উপযোগী । কিন্তু মাংসাশীরা খাবার না চিবিয়ে শুধু টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে । তাই, মাংসাশীদের কার্নাসিয়াল দাঁতগুলি কাঁচির ফলার মতো ধারালো। সাধারণত তৃণভোজী পশুদের পাকস্থলি বড় এবং পেট মোটা, কিন্তু মাংসাশীদের পেট এত মোটা হয় না । মাংসাশীদের আঙ্গুলে খুরের বদলে তীক্ষ্ণ নখর ।

মাংসাশীদের প্রধান প্রধান গোত্র বা বংশ সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ।—

Felidae বা বিড়াল বংশ ॥ এদের সকলের মুখে আছে ৩০টি দাঁত ; ৪টি ছেদকদন্ত খুব লম্বা ও তীক্ষ্ণ, তাছাড়া দুই পাটিতে আছে মোট ১২টি কর্তকদন্ত এবং ১৪টি কষের দাঁত । বিড়াল বংশীয় প্রাণীদের মাথা গোল ধরনের ।

অধিকাংশ প্রাণী রাত্রে, সন্ধ্যায় বা প্রদোষে শিকার করে এবং সেজন্যে এদের চোখ অল্প আলোয় দেখার উপযোগী । চোখের তারায় লম্বালম্বি কাটা (slit) মতো আছে । আলো যত কমে আসে, এই ফাঁক তত বড় ও গোলাকার হয় । শুধু তাই নয়, বিড়ালের চোখের মধ্যে গুয়ানিন (Guanin) বলে এক রকম কণিকা থাকে, যার গায়ে আলো পড়লে তা আরো উজ্জ্বল হয়, ফলে কম আলোতেও অক্ষিপটে প্রতিবিম্ব বেশ উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে ।

বিড়ালদের জিভে থাকে খুব ছোট ছোট কাঁটা । তাই, এরা হাড় থেকে সহজে মাংস চেঁছে খেতে বা নিজেদের গায়ের লোম চেটে বুরুশের মতো পরিষ্কার করতে পারে ।

শিকারের সময় এরা সাধারণত আত্মগোপন করে এগিয়ে চলে এবং তারপর শিকারের ওপর লাফিয়ে পড়ে তাকে তীক্ষ্ণ নখর দিয়ে আঁকড়ে ধরে । পশু বধের সময় বিড়াল তার থাবা ও দাঁতকে কাজে লাগায় ।

থাবার নিচে নরম মাংসপিণ্ড অনেকটা স্পর্শেন্দ্রিয়ের মতো কার্যকরী এবং চর্বির কুশন থাকায়, তাকে ঠাণ্ডা থেকেও রক্ষা করে । নরম মাংসপিণ্ড থাকার জন্যে বিড়ালের চলার সময় কোনো শব্দ হয় না । একমাত্র চিতা ছাড়া সিংহ, বাঘ, চিতাবাঘ (leopard), জাগুয়ার প্রভৃতি সকলেই ইচ্ছামতো নখ গুটাতে ও বের করতে পারে । সামনের পায়ের থাবায় ৫টি ও পিছনের পায়ের থাবায় আছে ৪টি করে নখযুক্ত আঙ্গুল ।

বিড়ালবংশীয় প্রাণীদের গলার আওয়াজেও পার্থক্য আছে । সিংহ, বাঘ, চিতাবাঘ, জাগুয়ার ও পুমা গর্জন করে, কিন্তু চিতা ও লিঙ্কস্ গর্জন করতে পারে না ।

বিড়াল জাতির শরীরের মাংসপেশীগুলি এমনভাবে তৈরি, যাতে তারা দেহকে কুঞ্চিত করে অল্প জায়গায় লুকিয়ে থাকতে পারে ।

Viverridae বা নকুল বংশ ।। বেজী, ভাম, বিন্টুরং, খট্টাস বা civet cat প্রভৃতি প্রাণীরা এই বংশের অন্তর্গত । এদের গড়ন লম্বাটে, পা ছোট, লেজ বড় এবং মুখ লম্বা ও সরু ধরনের । বিড়ালের সঙ্গে এদের কিছুটা মিল লক্ষ্য করা যায় । পায়ের আঙুলের সংখ্যা পাঁচ এবং থাবার নিচে আছে কোমল মাংসপিণ্ড। বেজী ছাড়া আর সব প্রাণী নখ গুটাতে পারে । আফ্রিকার জেনেট বিড়ালের মতো লুকিয়ে শিকার করে । ভারতবর্ষের বিন্টুরং-এর লেজ অনেকটা হাতের মতো এবং তা দিয়ে কোনো জিনিস ধরে এরা ঝুলতে পারে । নকুল বংশের মধ্যে অনেকের গ্রন্থি নিঃসারিত পদার্থ থেকে ঔষধ ও গন্ধদ্রব্য তৈরি করা হয় ।

Hyaenidae ।। বিড়াল বংশীয় পশুদের সঙ্গে হায়নার সম্পর্ক আছে, যদিও এদের আপাতদৃষ্টিতে কুকুরের মতো দেখতে লাগে । তবে হায়নার মুখে আরো চারটি দাঁত বেশি এবং কষের দাঁত খুব মজবুত । কষের দাঁত দিয়ে এরা মোটা মোটা হাড় ভাঙতে পারে । দাঁতের পাটি একটু লম্বা । কিন্তু হায়নার মুখ কুকুরের চেয়ে ভোঁতা এবং মাথা বড় । হায়নার সামনের পা পিছনের পায়ের চেয়ে লম্বা । বিড়াল যেমন নখ গুটাতে পারে, হায়না পারে না ।

Canidae বা কুকুর বংশ ।। নেকড়ে, শেয়াল, বুনো কুকুর প্রভৃতি মাংসাশী জীব এর মধ্যে পড়ে । কুকুর বংশীয় প্রাণীগুলির দাঁতের সংখ্যা ৪২ – তার মধ্যে ১২টি কর্তকদন্ত, ৪টি ছেদকদন্ত এবং ২৬টি কষের দাঁত । এদের মুখ লম্বাটে ।

কুকুরবংশীয় প্রাণীদের সামনের পায়ে ৫টি ও পিছনের পায়ে ৪টি আঙুল । কিন্তু এরা নখ গুটাতে পারে না ।

সকলের পা লম্বা এবং বিড়াল জাতীয় প্রাণীদের চেয়ে অনেক বেশি সময় ধরে এরা শিকারের পিছনে দৌড়াতে পারে ; নখগুলি বের হয়ে থাকে বলে দ্রুত দৌড়াবার সময় মাটি আঁচড়ে যাওয়ার জন্যে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম । বিড়ালের মতো লুকিয়ে শিকার ধরা এদের মধ্যে দেখা যায় না । তবে, বিড়াল জাতীয় অনেক প্রাণী যেমন গাছে উঠতে পারে, এরা তা পারে না । কুকুর জাতীয় অধিকাংশ প্রাণী শিকার করে ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে । অনেকে শিকার করে দলবদ্ধ হয়ে ।

Ursidae বা ভালুক বংশ ।। ভালুকদের দাঁতের সংখ্যা ৪২, যেমন কুকুরের থাকে । তবে, এরা তৃণভোজীদের মতো আশেপাশে চোয়াল নেড়ে খাবার চিবিয়ে খায় বলে, এদের কষের দাঁতগুলি খাদ্য পেষণের উপযোগী চ্যাপ্টা ধরনের ।

চলার সময় ভালুক তার সমস্ত পায়ের পাতার ওপর ভর রাখে ; কুকুর-বিড়ালের মতো শুধু আঙুলের ওপর ভর দেয় না । এদের পায়ের পাতা চেটালো ও খুব চওড়া, তাই এরা পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে । প্রতি পায়ে ৫টি আঙুল ।

Procyonidae ॥ এই বংশের প্রাণীদের সঙ্গে ভালুকের নিকট সম্পর্ক। নেপালের পাণ্ডা, উত্তর আমেরিকার রেকুন এবং দক্ষিণ আমেরিকার কোয়াটিমুণ্ডির লেজে থাকে গাঢ় রঙের আংটার মতো দাগ। দক্ষিণ আমেরিকার কিংকাজুর লেজ এমন যে তা দিয়ে গাছের ডাল ধরে এরা ঝুলে থাকতে পারে।

Mustelidae ॥ উত্তর এশিয়া, ইয়োরোপ ও উত্তর আমেরিকার উইসেল, আরমাইন, মিংক্ প্রভৃতি নেউলের মতো প্রাণী, উল্‌ভারাইন বা গ্লটন, স্কাংক্ এবং ভোঁদড় এই বংশের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত এদের গড়ন লম্বাটে, মুখ সরু, লেজ বড়, পা ছোট। শরীর নমনীয় বলে তাকে সহজে কুঞ্চিত করতে ও ঘোরাতে-বাঁকাতে পারে। আরমাইন ও মিংকের লোমে দামী পোশাক তৈরি হয়। স্কাংকের পিছনের গ্রন্থি থেকে নিঃসারিত তৈলাক্ত এবং দুর্গন্ধযুক্ত তরল পদার্থ তার আত্মরক্ষায় সাহায্য করে। এই জাতীয় প্রাণীদের পায়ে আঙুলের সংখ্যা পাঁচ।

Pinnipedia ॥ জলবাসী মাংসাশী জীব সীল এই বংশের প্রাণী। তাদের মধ্যে আছে কর্ণহীন সীল, কর্ণযুক্ত সীল ও সিন্ধুঘোটক। জলে থাকার উপযোগী হতে গিয়ে এদের পা-গুলি পাখনায় রূপান্তরিত হয়েছে। শরীরের গড়ন টর্পেডোর মতো বলে সাঁতারের কাজে সাহায্য করে। কর্ণহীন সীলের পিছনের পাখনা এমন যে তারা ডাঙায় কোনোক্রমে জবুথবুভাবে চলে। কর্ণযুক্ত সীল পিছনের পাখনাকে সামনের দিকে ঘুরিয়ে ডাঙায় বেশ কিছুটা চলতে ও শরীরকে মাটি থেকে ওঠাতে পারে। সিন্ধুঘোটকের ওপর পাটির ছেদকদন্ত দুটি এত বড় যে, মুখ থেকে অনেকটা বেরিয়ে থাকে।

Catacea ॥ তিমি এবং ডলফিন বা শুশুক এই বর্গের অন্তর্গত। সব প্রাণীদের মধ্যে তিমি বৃহত্তম, এমনকি ডাইনোসরের চেয়েও সে বড়। এই বর্গের স্তন্যপায়ী প্রাণীগুলির পা জলবাসের উপযোগী পাখনায় রূপান্তরিত হয়েছে। তিমিদের মধ্যে আছে দন্তহীন ও দন্তবিশিষ্ট তিমি। দন্তহীন তিমির মুখে সারি সারি নরম হাড় দিয়ে তৈরি পর্দার মতো অংশ থাকে, যার নিচের দিক চিরুনির মতো দেখতে; এর নাম baleen। বিরাট হাঁ করে সমুদ্রের জল মুখে ভরে নিয়ে প্ল্যাঙ্ক্‌টন খাওয়ার সময় এই বেলিন ছাঁকনির কাজ করে। দন্তবিশিষ্ট তিমি এবং ডলফিন মাংসাশী প্রাণী।

খুরযুক্ত পশু ॥ যে স্তন্যপায়ী পশুদের পায়ে খুর থাকে, তাদের নাম Ungulate। খুরযুক্ত প্রাণীদের মধ্যে আছে অযুগ্মখুরী (Perissodactyla), যুগ্মখুরী (Artiodactyla) ও শুণ্ডধারী (Proboscidea) বর্গ।

সাধারণত এই জাতীয় সব জীবের কর্তকদন্ত ঘাসপাতা ছিঁড়ে খাওয়ার এবং পেষকদন্ত খাদ্য চর্বণের জন্যে বিশেষ আকারে গঠিত। কষের দাঁতের ওপর দিক চ্যাপ্টা বা দাঁতের গা খাঁজ কাটা (ridged) মতো, যাতে খাবারকে পিষতে পারে।

চোয়ালকে আশেপাশে নেড়ে এরা ঘাসপাতা চিবিয়ে খায়। হরিণ প্রভৃতি অনেক প্রাণীর মুখে ওপর পাটিতে কর্তকদন্ত নেই; নিচের দাঁত এবং ওপরের মাঢ়ির মধ্যে চাপ দিয়ে খাবারকে টুকরো করা হয়।

উদ্ভিদে খাদ্যগুণ কম (low calorie) বলে এদের বেশি পরিমাণে খেতে হয়। তাই এদের পাকস্থলি বড়। অনেকের পাকস্থলিতে কয়েকটি কোটর থাকে এবং পরিপাকতন্ত্র এমন যে, খাবার গিলে তাকে আবার উগরে নিয়ে চিবিয়ে খায় বা জাবর কাটে—এরই নাম রোমন্থন।

মাংসাশীরা উদ্ভিদভোজী বা তৃণভোজীদের শিকার করে বলে, এদের অনেকের খুর দ্রুত দৌড়াবার উপযোগী। কেউ কেউ আত্মরক্ষার জন্যে লাথি মারে, কেউ শিং ব্যবহার করে, কেউ বিরাট কর্তকদন্ত (হাতির গজদাঁত) অথবা ছেদকদন্ত (বন্য শূকর) ব্যবহার করে।

Perissodactyla ॥ ঘোড়া, জেব্রা, গণ্ডার ও তাপিরের পায়ে খুরের সংখ্যা এক বা তিন। ঘোড়া ও জেব্রার প্রতি পায়ে একটি খুর। গণ্ডারের পায়ে তিনটি করে খুরযুক্ত আঙ্গুল এবং মাঝের আঙ্গুল বড়। মালয় ও দক্ষিণ আমেরিকার তাপিরের সামনের পায়ে ৪টি করে এবং পিছনের পায়ে ৩টি করে খুরযুক্ত আঙ্গুল থাকে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে অযুগ্মখুরী প্রাণীদের পূর্বপুরুষের পায়ে ৫টি আঙ্গুল ছিল এবং পরে তা কমে তিন বা একে দাঁড়ায়। তাপির সম্ভবত এই বর্গের প্রাচীনতম জীব। অযুগ্মখুরী পশুরা খাদ্য রোমন্থন করে না।

Artiodáctyla ॥ গোরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, অ্যান্টিলোপ, হরিণ, উট ও জিরাফের পায়ে খুরযুক্ত আঙ্গুলের সংখ্যা দুই এবং শূকর ও জলহস্তীর প্রতি পায়ে থাকে ৪টি করে খুর। দুই-খুরযুক্ত জন্তুরা পায়ের তৃতীয় এবং চতুর্থ আঙ্গুলের ওপর ভর দিয়ে চলে। এদের পায়ের পিছনে দ্বিতীয় এবং পঞ্চম আঙ্গুলের চিহ্ন লক্ষ্য করা যায় তবে সেগুলি চলার সময় মাটি স্পর্শ করে না। দুই খুরযুক্ত প্রাণীদের খুর দেখে মনে হয় যেন সমান দুই ভাগে চেরা। দ্রুতগামী প্রাণী অ্যান্টিলোপ ও হরিণের পায়ে মাঝের দুটি আঙ্গুল বড়। উট ও জিরাফের পাশের আঙ্গুল নেই বলে আঙ্গুলের সংখ্যা দুই। জলহস্তীর চারটি আঙ্গুল প্রায় সমান আকারের; শূকরের মাঝের দুটি আঙ্গুল বড়, পিছনের দুটি অনেক ছোট বলে মাটি স্পর্শ করে না।

দুই-খুরবিশিষ্ট অধিকাংশ প্রাণী জাবর কাটে বলে, এদের রোমন্থক বলা হয়। রোমন্থক জীবের মধ্যে সকলের পাকস্থলিতে থাকে চারটি কোটর; শুধু উটের পাকস্থলি তিনটি কোটরে বিভক্ত। শূকর ও জলহস্তী খাদ্য রোমন্থন করে না।

গোরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল এবং অ্যান্টিলোপের শিং তাদের করোটি থেকে আলাদা অথচ করোটির সঙ্গে যুক্ত হাড়ের ওপরে তৈরি। নখের মতো শৃঙ্গীয় পদার্থ (horny material) দিয়ে শিং তৈরি হয়েছে। শিংগুলি ফাঁপা

ও ডালপালাহীন এবং স্থায়ী। পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই শিংযুক্ত। অ্যান্টিলোপের শিংয়ের বৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশি—কারো শিং লম্বা ও একেবারে সোজা, কারো শিং তরোয়ালের মতো বাঁকানো, কারো বা স্ক্রুর মতো পাকানো। ভারতবর্ষের নীলগাই ও কৃষ্ণসার অ্যান্টিলোপ জাতির অন্তর্গত, তবে অ্যান্টিলোপের বৈচিত্র্য আফ্রিকায় সর্বাধিক; তাদের মধ্যে বিরাটাকার ইল্যাণ্ড, কুডু এবং অরিক্স থেকে আরম্ভ করে নু, হার্টবীস্ট ইম্পালা ও নানা রকম গ্যাজেল এবং ক্ষুদ্রাকৃতি ডুইকার ও ডিকডিক পর্যন্ত আছে।

হরিণের মাথার খুলি থেকে হাড় গজিয়ে শিং হয়েছে এবং ঐ শিং ভরাট। শিংগুলি ডালপালাওয়ালা। প্রতি বছর শিং খসে পড়ে ও নতুন করে গজায়। পুরনো শিং পড়ে গেলে তার মূলে চামড়া ঢাকা দুটি ছোট হাড় উঁচু হয়ে থাকে। হাড়ের ওপরে ক্রমে ক্রমে গুটি জন্মায়, আর ঐ গুটি বড় হয়ে নেয় শিংয়ের আকার। যতদিন শিং নরম থাকে, ততদিন মখমলের মতো কোমল চামড়া দিয়ে তা ঢাকা থাকে। শিং শক্ত হয়ে উঠলে এই 'ভেলভেট' শুকিয়ে শিথিল হয়ে যায়। হরিণ তখন ডালপালায় শিং ঘসে ওপরের ভেলভেট একেবারে তুলে ফেলে। সাধারণত হরিণীর শিং থাকে না, তবে বল্গা-হরিণের স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই শিংযুক্ত।

Proboscidea ॥ আফ্রিকা এবং এশিয়ার হাতি এই বর্গের প্রধান প্রাণী। হাতিদের পা-কে ঘিরে আঙুলগুলি বোতামের মতো খুর দিয়ে ঢাকা। গাছপাতা পিষে খাওয়ার জন্যে কষের দাঁতগুলির ওপরে খাঁজ কাটা এবং ওপর পাটির দুটি কর্তকদন্ত বিরাট হয়ে গজদন্তের আকার নিয়েছে।

Sirenia বা সিন্ধু-গব বর্গ ॥ আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরের উপকূল-বর্তী অঞ্চলে এবং অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে থাকে মানাটি ও ডুগং। জলে বাস করে বলে, এদের শরীর টর্পেডোর মতো সন্তরণের উপযোগী। সামনের দুটি পা হয়েছে পাখনায় রূপান্তরিত, যেমন তিমির ক্ষেত্রে দেখা যায়। তিমির মতো এদেরও চামড়া প্রায় লোমশূন্য এবং তার নিচে থাকে চর্বির পুরু স্তর। ডুগং ও মানাটির খাদ্য জলজ উদ্ভিদ। খাদ্য চর্বণের উপযোগী কষের দাঁতে খাঁজ কাটা। ডুগং-এর ওপর পাটির কর্তকদন্ত গজদন্তের মতো বড়।

Primate ॥ ল্যাটিন Primus শব্দের অর্থ 'প্রথম', কারণ এই বর্গের প্রাণীরা সবচেয়ে উন্নত। বৃক্ষবাসী টারসিয়ার, গ্যালাগো, লোরিস ও লেমুর থেকে আরম্ভ করে বানর, গিবন, শিম্পাঞ্জি, ওরাং-উটান, গরিলা ও মানুষ এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এদের হাত-পায়ের লম্বা আঙুলের নখগুলি চ্যাপ্টা ধরনের। হাতের বুড়ো আঙুল অন্য আঙুলের থেকে একটু দূরে বলে, গাছের ডালপালা বা জিনিসপত্র ধরতে সাহায্য করে। মানুষ বাদে অন্যান্যদের পায়ের বুড়ো আঙুলও হাতের মতো অন্য আঙুল থেকে একটু দূরে থাকে। প্রাইমেটদের

মস্তিষ্ক উন্নত। চোখ সামনের দিকে পাশাপাশি থাকে। সেজন্যে এরা দুই চোখের ফোকাস একসঙ্গে মিলিয়ে সব জিনিসকে তার স্বাভাবিক ত্রৈমাত্রিক রূপে (অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ বা গভীরতা) দেখতে পায়; এবং এরই নাম Stereoscopic vision।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং ভারতবর্ষের টারসিয়ার ও লোরিস, আফ্রিকা ও মাদাগাস্কারের গ্যালাগো ('বুশ-বেবি') ও লেমুর হলো সবচেয়ে আদিম প্রাইমেট। সেজন্যে এই জাতির নাম Prosimian (অর্থাৎ প্রাক-বানর)।

পূর্ব গোলার্ধ (এশিয়া ও আফ্রিকা) এবং পশ্চিম গোলার্ধের (আমেরিকা) বানরের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। এশিয়া ও আফ্রিকার বানরগুলির নাকের গর্ত বেশি কাছাকাছি। অনেকের লেজ নেই; আর মর্কট, হনুমান প্রভৃতির লেজ থাকলেও তা কিন্তু হাতের মতো কাজ করতে পারে না। পিছনে কড়া থাকে অনেক বানরের, অনেকের গালে আছে থলি। দাঁতের সংখ্যা মানুষের মতো ৩২টি। এশিয়া ও আফ্রিকার বানরদের মধ্যে মর্কট (Macaque), হনুমান (Langur) ও বেবুন (Papio) অন্যতম। মর্কটের পায়ের চেয়ে হাত লম্বা, কিন্তু হনুমানের হাতের চেয়ে পা লম্বা। বেবুনদের মুখ কুকুরের মতো লম্বাটে।

খাদ্যের দিক থেকে বিচার করলে এশিয়া ও আফ্রিকার বানরেরা দুই জাতিতে বিভক্ত। হনুমান ও আফ্রিকার কলোবাস বানর প্রধানত গাছের পাতা খায় ও গাছে থাকে। দ্বিতীয় জাতির বানরেরা ফল ও শাকসবজি থেকে পোকামাকড়, কাঁকড়া, ডিম ও ছোট পাখি পর্যন্ত খায়; এরা হলো মর্কট ও বেবুন। অনেকে গাছে থাকলেও বেবুন প্রভৃতি কোনো কোনো জাতীয় বড় বানর মাটিতেও স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে।

আমেরিকার বানরগুলি ছোট এবং তাদের বুদ্ধি সাধারণত এশিয়া ও আফ্রিকার বানরদের চেয়ে কম। মুখ চেটালো মতো এবং নাকের উভয় গর্তের ব্যবধান বেশি। অনেকে লেজ দিয়ে জিনিস ধরতে পারে ও গাছের ডাল জড়িয়ে হাত-পা ছেড়ে দোল খেতে পারে; এরকম লেজকে বলে prehensile tail। আমেরিকার বানরদের গালে থলি বা পিছনে কড়া নেই। দক্ষিণ আমেরিকার মারমোসেট ছাড়া আর সকলের দন্ত সংখ্যা ৩৬টি।

প্রাইমেটদের মধ্যে মানুষ বাদে সবচেয়ে উন্নত হলো এপ্ জাতি। এপ্ জাতির মধ্যে আছে ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গিবন আর ওরাং-উটান এবং আফ্রিকার শিম্পাঞ্জি ও গরিলা। মানুষের মতো এপের দন্ত সংখ্যা ৩২টি। এদের লেজ বা গালে থলি নেই। এপ্‌কে সাধারণভাবে বনমানুষ বলা যেতে পারে। (এই অধ্যায়ের পরে মানুষের বিষয়ে আলোচনার সময় আমরা বনমানুষের কথায় আসবো।)

মধ্যজীবীয় অধিকল্পে বা সরীসৃপ-যুগে স্তন্যপায়ীরা ছিল আকারে ছোট এবং নিশাচর। দাঁত ও চোয়াল দেখে মনে হয়, কোনো কোনো পশু ছিল মাংসাশী অথবা সর্বভুক। আবার, কিছু প্রাণীর পেষকদন্ত দেখে মনে হয়, তারা ছিল উদ্ভিদভোজী।

সরীসৃপ-যুগের ছোট ছোট স্তন্যপায়ী জীবের যে নিদর্শনগুলি পাওয়া গেছে, তার মধ্যে টিলোডাস আকারে উডচাক জাতীয় রোডেণ্টের চেয়ে বড় নয়; সে ছিল উদ্ভিদভোজী।

পেষকদন্তের গঠন থেকে মধ্যজীবীয় অধিকল্পের কতকগুলি স্তন্যপায়ীর নামকরণ হয়েছে। পেষকদন্তের উপরিপৃষ্ঠে চূড়া থাকে, যেগুলিকে ইংরেজিতে cusp বলে; এইগুলি তীক্ষ্ণ অথবা গোলাকার হয়। মাল্টি-টিউবারকুলেট নামে উদ্ভিদভোজী জীবের কষের দাঁতে দুইটি সমান্তরাল সারিতে চূড়া ছিল; এর মাথার খুলি রোডেণ্টের মতো। আর এক প্রাণীর পেষকদন্তে ৩টি করে সূক্ষ্মাগ্র চূড়া এক লাইনে সাজানো—মাঝের চূড়া বড় এবং তার সামনের ও পিছনের চূড়া ছোট। এজন্যে প্রাণীটির নাম ট্রাইকোনোডণ্ট। এরা মাংসাশী ছিল বলে মনে হয়। আবার একরকম প্রাণী ছিল যার কষের দাঁতে ৩টি সূক্ষ্মাগ্র চূড়া সমভাবে ও ত্রিভূজাকারে সাজানো—এর নাম দেওয়া হয়েছে সিমেট্রোডণ্ট। সিমেট্রোডণ্ট আকারে বিড়ালের মতো বড় এবং সেও মাংসাশী হতে পারে। মাল্টি-টিউবারকুলেট, ট্রাইকোনোডণ্ট ও সিমেট্রোডণ্ট বাস করতো জুরাসিক কল্পে।

কীটভুক প্রাণীদের মধ্যে কারো মুখ ছিল ছুঁচোর মতো বেশি সরু, কারো বা ইঁদুরের মতো। টিনাকোডন কীটভুক ছিল। মঙ্গোলিয়ায় জালাম্ব্‌ডালেস্টেস নামে আর এক কীটভুকের ফসিল পাওয়া গেছে; সে ক্রিটেশাস কল্পে বাস করতো।

আদিম স্তন্যপায়ীদের মধ্যে প্যাণ্টোথেরের নাম উল্লেখযোগ্য। তার কষের দাঁত ত্রিভূজাকৃতি (triangular outline) এবং চূড়াগুলিও ত্রিভূজাকারে সাজানো। ওপর ও নিচের পাটির পেষকদন্তের বিন্যাসে একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। ওপর পাটির কষের দাঁতগুলিতে ত্রিভূজের মাথা ভেতর দিকে ঠেলা এবং নিচের পাটিতে এগুলি বাইরের দিকে ঠেলা। তাই, মুখ বন্ধ করলে এই দাঁতগুলি একসঙ্গে খাবার কাটা ও পেষার কাজে সাহায্য করতো। পরবর্তীকালের কিছু স্তন্যপায়ীর মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল বলে, কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন যে, প্যাণ্টোথের হতে মারস্যুপিয়াল ও প্ল্যাসেণ্টাযুক্ত স্তন্যপায়ীর উদ্ভব হয়েছিল (বর্তমান যুগে ক্যাঙ্গারু এবং অপোসামের পেষকদন্তের চূড়াগুলির ত্রিভূজাকার বিন্যাসের সঙ্গে প্যাণ্টোথেরের একটা সাদৃশ্য চোখে পড়ে)।৫

ক্রিটেশাস কল্পের স্তন্যপায়ীরা ছোট ছিল, কিন্তু নবজীবীয় অধিকল্পের প্রথম দেড়-কোটি বছরের মধ্যে তাদের আকার বড় হয়ে ওঠে।

বর্তমান যুগের খুরযুক্ত প্রাণীদের দাঁত যেমন বিভিন্ন কাজের উপযোগী হয়ে বিভিন্ন রূপে তৈরি হয়েছে (অর্থাৎ যাকে specialization বলে), তাদের আদিমতম পূর্বপুরুষের দাঁত কিন্তু অত specialized ছিল না। সেই পূর্বপুরুষদের পায়ে নখ ছিল (খুর নয়)।

প্যালিওসিন অধিযুগের মধ্যে নানারকম খুরযুক্ত প্রাণীর উদ্ভব হয়। ঐ যুগের মধ্যভাগে ছিল প্যান্টোল্যাম্ডা নামে আকারে ভেড়ার মতো এক প্রাণী। লম্বাটে মুখে ছেদকদন্তগুলি বড় এবং ওপর পাটির ছেদকদন্ত নিচের চোয়ালের ধার দিয়ে বেরিয়ে থাকতো। পা-গুলি স্থূল ও সব আঙুল খুরযুক্ত। তারা সম্ভবত উদ্ভিদভোজী।

ভেড়ার চেয়ে একটু বড় ও লম্বা লেজওয়ালা আর এক জীব ছিল প্যালিওসিন কালের শেষ ভাগে, যার নাম ফেনাকোডাস। এরা বর্তমান যুগের খুরযুক্ত প্রাণীদের আদিপুরুষের মধ্যে অন্যতম। ফেনাকোডাসের লম্বাটে মুখে ওপরের ঠোঁট তাপিরের মতো ঝুলে থাকতো। পা-গুলি মোটা ও লেজ সরু। পায়ের পাঁচ আঙুলে খুর ছিল। বাইসন, নু ও জেব্রার মতো ফেনাকোডাস দলবদ্ধ হয়ে সমভূমিতে চরে বেড়াতো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উইয়োমিং থেকে এদের ফসিল পাওয়া গেছে।

প্যান্টোল্যাম্ডা জাতীয় জীবের উত্তরসূরী ব্যারিল্যামডা বাস করতো প্যালিওসিন অধিযুগের শেষ দিকে। ব্যারিল্যাম্ডা প্রায় ৪ ফুট উঁচু ও ৮ ফুট লম্বা। এদের গাত্রাবরণ সম্ভবত লোমশূন্য। পা-গুলি মোটা এবং পিছনের পা সামনের পায়ের চেয়ে একটু বড়। চার পায়ের ২০টি আঙুলের প্রান্তে খুরের মতো ভারি নখ। মুখ একটু ভোঁতা এবং দাঁত দেখে মনে হয়, শূকরের মতো তারা মাটি খুঁড়ে গাছের মূল ভক্ষণ করতো।

লম্বা ছেদকদন্ত বিশিষ্ট টেট্রাক্লিনোডন ছিল প্যান্টোল্যাম্ডার প্রায় সমসাময়িক। এরা আকারে টেরিয়ার কুকুরের মতো ছোট।

আদিম মাংসাশী পশুদের মধ্যে ক্রিওডন্ট্ প্যালিওসিন অধিযুগে বাস করতো। কেউ কেউ মনে করেন যে, ক্রিওডন্টের আবির্ভাব হয়েছিল ক্রিটেশাস কল্পের শেষে, যদিও তখন এরা আকারে ছোট ছিল। পা-গুলি মোটা ও ছোট বলে মনে হয়, এরা বেশি জোরে দৌড়াতে পারতো না। এরা সম্ভবত হায়নার মতো নিজে শিকার করতো, অথবা মৃত প্রাণী বা অন্য জন্তুর শিকারের বর্জিতাংশ ভক্ষণ করতো। ছোট ছোট উদ্ভিদভোজী প্রাণী এদের খাদ্য ছিল মনে হয়। ক্রিওডন্টের মধ্যে নানা বৈচিত্র্য—কোনো জাতি কুকুরের মতো, কোনো জাতি বিড়ালের মতো, কেউবা হায়নার মতো। কেউ কেউ শিকার করতো দল বেঁধে, কেউবা

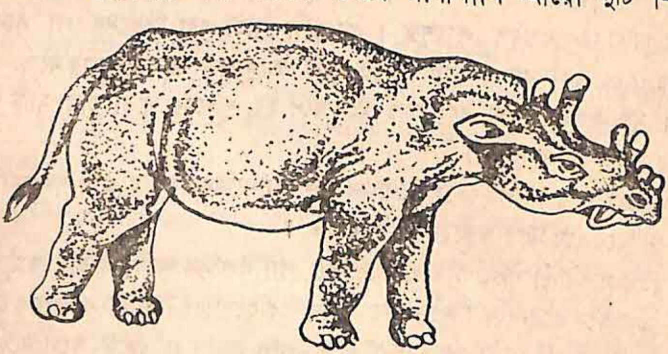
বিড়ালের মতো অলক্ষ্যে শিকারের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তো। কোনো কোনো পশুর দাঁত তীক্ষ্ণ, কারও বা একটু ভোঁতা ; কারও নখ ধারালো, কারও বা চ্যাপ্টা। এদের মস্তিষ্ক কিন্তু বর্তমান যুগের মাংসাশীদের চেয়ে ছিল অনেক ছোট।

রোডেন্টের নিদর্শনও প্যালিওসিন কালের ফসিলে আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রথম থেকে তাদের সামনের দাঁত ছিল বড় ও বাটালির মতো তীক্ষ্ণ। তারা আকারে কাঠবিড়ালের চেয়ে বড় নয়। অল্পকালের ভেতরে তাদের মধ্যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হলো। শুধু তাই নয়, আদিম খরগোশ জাতীয় প্রাণীও যে তখন ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

প্যালিওসিন অধিযুগে প্রোসিমিয়ান জাতীয় প্রাইমেটের আবির্ভাব এক উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। আদিম প্রাইমেট আকারে ছিল বিড়ালের মতো ; সে বৃক্ষবাসী। বৃক্ষবাসের জন্যে সে অনেকটা নিরাপদ এবং মনে হয়, এই নিরাপত্তা ছিল তার বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ। কোনো কোনো বিজ্ঞানী বলেন যে, প্রাইমেটের আদি পুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল আরো আগে অর্থাৎ ক্রিটেশাস কল্পের শেষ দিকে।

জলবায়ু শীতল ছিল প্যালিওসিন অধিযুগের গোড়ায় এবং পরে ক্রমে উষ্ণ হতে থাকে। ঐ যুগের শেষ ভাগে বীজযুক্ত বৃক্ষের বিস্তার আরো ব্যাপক হয়।

খুরযুক্ত প্রাণীদের মধ্যে ইউন্টাথেরিয়াম বিশাল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমে ইউটা অঞ্চলের ইউন্টা পাহাড়ে তার ফসিল পাওয়া গিয়েছিল বলে এই নামকরণ। ইউন্টাথেরিয়াম লম্বায় ১২ ফুট ও কাঁধের কাছে ৭ ফুট উঁচু। শরীর গণ্ডারের মতো, পা-গুলি মোটা। মাথায় ৬টি শিং—চোখের পিছনে দুটি, চোখের ওপরের হাড় থেকে উঠেছিল দুটি এবং নাকের ওপরে পাশাপাশি আরো দুটি শিং।



ইউন্টাথেরিয়াম

শিংগুলি করোটির হাড় থেকে গঠিত। ওপরের চোয়াল থেকে দুটি লম্বা ও তীক্ষ্ণ ছেদকদন্ত নিচু দিক করে মুখের বাইরে বেরিয়ে থাকতো। সেজন্যে মনে হয়, তার মতো বৃহৎ ও শক্তিশালী জীবকে ক্রিওডন্ট প্রভৃতি মাংসাশীরা দল বেঁধে আক্রমণ করতে সাহস পেত না, যদিনা সে রোগগ্রস্ত বা আহত হয়ে থাকে।

এখনকার খুরযুক্ত প্রাণীদের মধ্যে ঘোড়া এবং উটের আদিপুরুষের আবির্ভাব ইউসিন অধিযুগে। ঘোড়ার পূর্বপুরুষ হাইরাকোথেরিয়ামের প্রাচীনতম ফসিল প্যালিওসিন অধিযুগের পাথরে পাওয়া গেলেও তার বিস্তার ইওসিন কালে আরো বেশি হয়েছিল। উটের আদিপুরুষ প্রোটিলোপাস। ঘোড়া এবং উটের ক্রম-বিবর্তন আলোচনার সময় এদের কথা বলা হবে।

জলবাসী স্তন্যপায়ীও ছিল ইওসিন কালে। জিউগ্লোডন নামে তিমি দৈর্ঘ্যে ৬৫ ফুট—তার মধ্যে মাথা ৫ ফুট, শরীর ১০ ফুট, বাকি ৫০ ফুট লম্বা লেজ। দাঁত-গুলি তীক্ষ্ণ—সংখ্যায় ৪৪। বড় বড় মাছ এদের খাদ্য। মাথার পিছনে এক জোড়া ছোট পাখনা, যেমন তিমিদের সামনের পা-গুলি পাখনায় রূপান্তরিত হয়েছে।

ইউসিন অধিযুগের ফসিল থেকে বাদুড়ের আদিম নিদর্শন পাওয়া গেছে। প্রাণী-টির শরীরে বাদুড়ের সব বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট ছিল।

মাংসাশী পশুদের বিবর্তনের ইতিহাসে মাইয়াকিস্‌ নামটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সে বাস করতো আজ থেকে প্রায় চার কোটি বছর আগে। নেউল বা উইসেলের মতো এই ক্ষুদ্র প্রাণী থেকে পরে সব মাংসাশী পশুর উদ্ভব হয়, যাদের মধ্যে আছে বিড়াল, কুকুর ও ভালুক জাতি, রেকুন ও পাণ্ডা এবং উইসেল বা ভোঁদড় প্রভৃতি প্রাণী। মাইয়াকিসের গড়ন কাঠবিড়ালের মতো। তার মাথা ও কান বড়, লেজ লম্বা, প্রতি পায়ে ৫টি করে নখরযুক্ত আঙুল, এবং দাঁতগুলি মাংস কাটার উপযোগী।

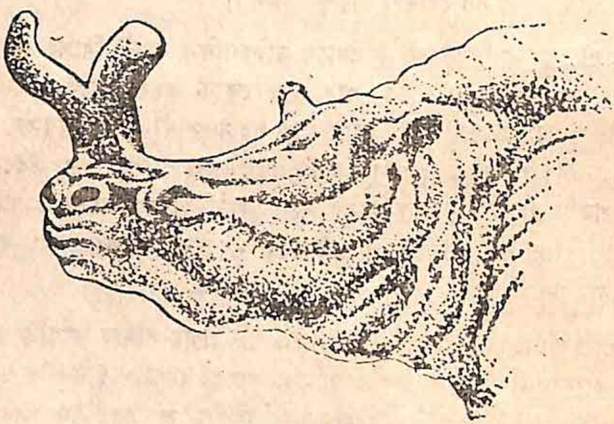
মাইয়াকিস থেকে আদিম বিড়াল বংশের দুটি প্রধান শাখার উৎপত্তি। প্রথম জাতিকে বলে 'biting cat' এবং তার মধ্যে অন্যতম হলো ডাইনিকৃটিস ও বাঘ-সিংহ-চিতাবাঘ প্রভৃতি প্রাণীর পূর্বপুরুষ। দ্বিতীয় জাতির নাম 'stabbing cat' এবং তার মধ্যে ছিল হপ্‌লোফোনিয়াস। এই দুই জাতীয় বিড়ালের ওপর পাটির ছেদকদন্ত নিচের পাটির ছেদকদন্তের চেয়ে দীর্ঘ। হপ্‌লোফোনিয়াসের ওপর পাটির ছেদকদন্ত আকারে ডাইনিকৃটিসের দ্বিগুণ। হপ্‌লোফোনিয়াসের বিরাট ও তীক্ষ্ণ ছেদকদন্ত পশুবধের কাজে তরোয়ালের মতো কার্যকর; আর ডাইনিকৃটিস তার শিকারকে কামড়ে ধরতো। তরোয়ালের মতো দাঁত দিয়ে পশুবধের সময় হপলোফোনিয়াসকে বিকট মুখব্যাদান করতে হতো—নিচের চোয়া-লের অস্থিসন্ধি এমনভাবে তৈরি যে, বিরাট হাঁ করলে এই চোয়াল সোজা নেমে যেত। ডাইনিকৃটিস্‌ এত অস্বাভাবিক বড় হাঁ করতে পারতো না, তবে এর নিচের চোয়ালের পুরু হাড় আরো দৃঢ়ভাবে ওপরের চোয়ালে সংযুক্ত। চোয়ালের এরকম হাড় ও সন্ধি থাকায় মনে হয়, ডাইনিকৃটিসের গালের মাংসপেশী দৃঢ় ছিল যাতে শিকারকে মারাত্মক জোরে কামড়ানো যায়। হপ্‌লোফোনিয়াস জাগুয়ারের

মতো বড় ; ডাইনিক্টিস ছোট, তার শরীর হালকা, কিন্তু সে আরো চটপটে ও দ্রুতগামী।

প্রোসিমিয়ান জাতীয় প্রাইমেটের অগ্রগতি হয়েছিল ইওসিন কালে। মাদাগাস্কারে যে শিয়ালের মতো মুখওয়ালা লেমুর এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিরাট চোখের টারসিয়ার দেখা যায়, তাদের পূর্বপুরুষরা ইওসিন অধিযুগে বাস করতো।

অলিগোসিন অধিযুগে জলবায়ু সমাভবাপন্ন ছিল বলে জানা যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ডাকোটা থেকে অলিগোসিন কালের উদ্ভিদভোজী বিশাল প্রাণীর হাড় পাওয়া গেছে, যার নাম ব্রণ্টোথেরিয়াম—লম্বায় ১৫ ফুট, কাঁধের কাছে ৮ ফুট উঁচু। শরীরের গড়ন এবং পায়ের পাতা হাতির মতো। নাকের প্রান্তে ইংরেজি V-অক্ষরের আকারে তৈরি বিরাট শিং।

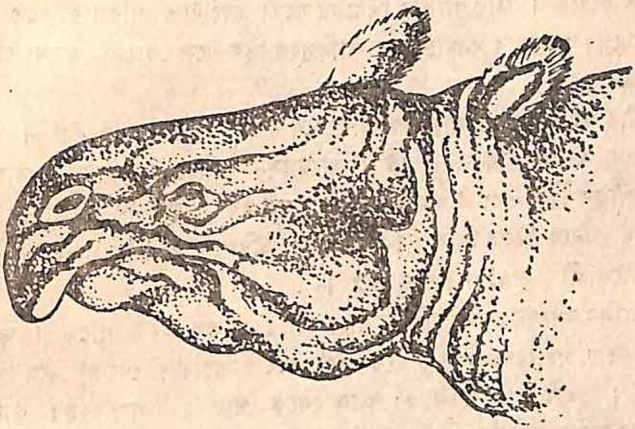


ব্রণ্টোথেরিয়াম

মিশরের সাহারা মরুভূমিতে ফায়ুম অঞ্চলে প্রায় সাড়ে-তিন কোটি বছর আগে বাস করতো আর এক জীব। আরসিনোথেরিয়াম নামে এই উদ্ভিদভোজী প্রাণী ১০ ফুট লম্বা ও কাঁধের কাছে ৬ ফুট উঁচু। তার শরীর হাতির মতো, মাথা গণ্ডারের মতো। মাথায় ৪টি শিং—চোখের ওপরের শিং দুটি অনেক ছোট কিন্তু নাকের দুটি প্রকাণ্ড শিং পাশাপাশি ছিল তরোয়ালের মতো এগিয়ে।

অলিগোসিন অধিযুগে হাইরাকোডন নামে একরকম খড়্গবিহীন গণ্ডার ছিল। তবে, সব গণ্ডার এবং এমনকি ডাঙায় সব স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যে বৃহত্তম বালুচিথেরিয়াম। বালুচিস্তানে ১৯২৪ সনে তার ফসিল আবিষ্কৃত হয়। বালুচিথেরিয়াম লম্বায় ২৫ ফুট, কাঁধের কাছে ১৮ ফুট উঁচু। সেও খড়্গবিহীন। গণ্ডারদের মধ্যে ভারতবর্ষের হিমালয়ের শিবালিক পর্বতাঞ্চলে মায়োসিন থেকে প্লিস্টোসিন কাল পর্যন্ত নানারকম প্রাণীর ফসিল পাওয়া গেছে, যার মধ্যে আছে

অ্যাসেরাথেরিয়াম (খড়্গবিহীন), ডাইসেরাথেরিয়াম (দ্বি-খড়্গযুক্ত), মেটামাই-নোডন (acquatic বা জলবাসী গণ্ডার) প্রভৃতি ।



বালুচিথেরিয়াম

হাতির আদিপুরুষের ফসিল মিশরের প্রাচীন মিরিস হ্রদ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে ; সেজন্যে তার নাম মিরিথেরিয়াম। কেউ কেউ মনে করেন, মিরিথিয়ামের আবির্ভাব আরো পূর্বে ইওসিন কালে হয়েছিল । (হাতির ক্রমবিবর্তনের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ।)

আর এক প্রাণী অরিওডন্ট দক্ষিণ ডাকোটা অঞ্চলে অলিগোসিন অধিযুগে বাস করতো । এদের শরীর অনেকটা শূকরের মতো এবং প্রতি পায়ে চারটি আঙুল । স্বরযন্ত্র (larynx) বড় বলে মনে হয়, এরা জোরে আওয়াজ করতে পারতো ।

অরিওডন্টের সমসাময়িক ছিল সাইনোডিক্টিস নামে এক প্রাণী । মাইয়াকিসের অন্যতম উত্তরসূরী এই মাংসাশী জীব সম্ভবত কুকুর, ভালুক, রেকুন এবং উইসেলের পূর্বপুরুষ । ক্রিওডন্টের চেয়ে এদের মস্তিষ্ক বড় ।

সাইনোডিক্টিসের এক বংশধর উত্তর আমেরিকার পশ্চিমাংশে বাস করতো—তার নাম ড্যাফিনোডন । সাড়ে-চার ফুট লম্বা এই জন্তুর পা বিড়ালের মতো ছোট এবং শরীর বিড়ালের মতো নিচু ও লম্বাটে । কিন্তু মাথার গড়ন নেকড়ে বাঘের মতো । সে ভালুক ও কুকুরের অন্যতম পূর্বপুরুষ হতে পারে ।

পাকানো শিংওয়ালা একরকম অ্যান্টিলোপ ইলিংগোসেরাস ছিল ড্যাফিনোডনের শিকার । এছাড়া, ড্যাফিনোডন হরিণসদৃশ প্রাণী প্রোসিন্থেটোসেরাসকেও শিকার করতো বলে মনে হয় । হরিণসদৃশ প্রাণীটির মাথায় দুই শিং সামনের দিকে বাঁকানো এবং নাকের ওপরে দুই ডালওয়ালা একটি শিং ।

সম্ভবত অলিগোসিন কালে প্রথম বানর ও বনমানুষের আবির্ভাব হয়েছিল। মিশরের ফায়ুম অঞ্চলে একরকম আদিম প্রাইমেট ইজিপ্টোপিথেকাসের ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে। তার আকার গিবনের মতো এবং দাঁত গরিলার মতো। সে বর্তমান যুগের বৃহদাকার বনমানুষদের আদিপুরুষ ছিল বলে কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন।

পৃথিবীর জলবায়ুতে ও প্রাকৃতিক পরিবেশে মায়োসিন থেকে প্লিস্টোসিন অধি-যুগের মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটে। মায়োসিন অধিযুগের জলবায়ু পর্যায়ক্রমে উষ্ণ ও শীতল ছিল এবং ঐ সময়ে তৃণভূমির সৃষ্টি হয়। তৃণভূমির বিস্তারের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে গিয়ে অনেক প্রাণী উদ্ভিদভোজী (browser) থেকে ক্রমে তৃণভোজী (grazer) হয়ে ওঠে।

প্লায়োসিন অধিযুগ থেকে পৃথিবী ধীরে ধীরে শীতল হতে থাকে। ভূত্বকে ভাঁজ হওয়ায়, মহাদেশগুলি উঁচু হয়ে ওঠে এবং উত্তরাঞ্চল থেকে নেমে আসে হিমবাহ। তুষার-যুগের সূচনা হয় আজ থেকে প্রায় ২০ লক্ষ বছর আগে। উত্তর গোলার্ধের হিমবাহগুলি প্লিস্টোসিন অধিযুগে দক্ষিণ দিকে অনেকটা নেমে আসে। শুধু উষ্ণমণ্ডল (tropics) ছাড়া আর সব অঞ্চলে আবহাওয়া শীতল হয়। চার বার এই বরফ এগিয়ে আসে ও চার বার পিছিয়ে যায়। সবশেষে বরফ পিছিয়ে যেতে শুরু করে প্রায় ১২ হাজার বছর আগে এবং তা আজও ধীরে ধীরে যাচ্ছে পিছিয়ে।

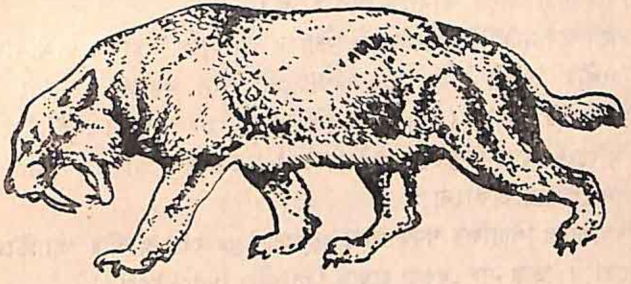
মায়োসিন অধিযুগে বন্য বরাহের মতো এক প্রাণী বাস করতো, যার নাম ডাইনোহাইয়াস। সে ১১ ফুট লম্বা এবং কাঁধের কাছে ৬ ফুট উঁচু। করোটি প্রায় ৩ ফুট এবং ওপর পাটির লম্বা ছেদকদন্ত মুখের পাশ দিয়ে বেরিয়ে থাকতো।

স্তন্যপায়ীদের মধ্যে অনেকের আকার প্লায়োসিন অধিযুগে বিরাট হয়ে ওঠে। ক্যাস্টোরয়ডিস নামে একরকম বিভার ছিল ১০ ফুট লম্বা এবং তার মধ্যে লেজ ৩ ফুট। লম্বা ও তীক্ষ্ণ কর্তকদন্ত দিয়ে সে বড় বড় গাছের গোড়া কাটতে পারতো।

অদ্ভুত চেহারার আর একরকম রোডেন্ট ছিল—তার নাম সেরাটোগলাস। প্রায় ২ ফুট লম্বা প্রাণীটির দু-চোখের মাঝে কপাল থেকে উঠেছিল পাশাপাশি দুটি শিং। শিংগুলি কি কাজে লাগতো তা এখনো জানা যায়নি।

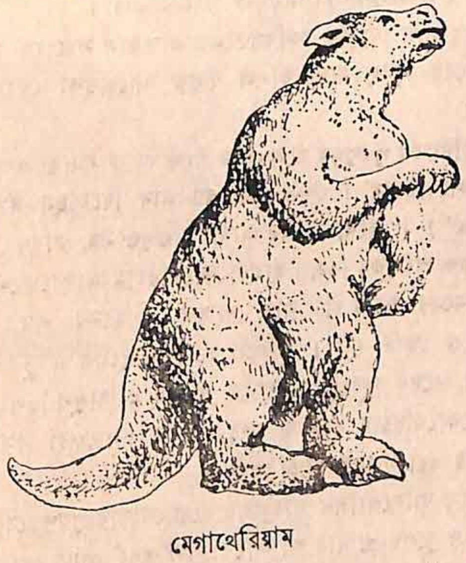
হপ্‌লোফোনিয়াসের স্বজাতির মধ্যে প্লায়োসিন কালের স্মাইলোডন বোধ হয় বৃহত্তম। স্মাইলোডনের সাধারণ নাম 'খড়্গদন্তী বাঘ', যদিও এরা কখনো বাঘের পূর্বপুরুষ ছিল না। লম্বায় সিংহের চেয়ে ছোট হলেও এর শরীর আরো ভারি; পা-গুলি খুব মজবুত ও কাঁধ পেশীবহুল। ওপর পাটিতে ছেদকদন্ত প্রায় ৯ ইঞ্চি লম্বা ও খুব তীক্ষ্ণ। নাসারন্ধ্র মুখের প্রান্ত থেকে একটু পিছনে, যাতে শিকারের পুরু লোমের মধ্যে তার নাকসুদ্ধ মুখের প্রান্তভাগ (muzzle) প্রবেশ করলেও

শ্বাসকষ্ট না হয়। স্মাইলোডন আজ থেকে মাত্র ৮ হাজার বছর আগে পর্যন্ত জীবিত ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।



খড়্গদন্তী 'বাঘ'

প্লিস্টোসিন কালের গোড়ায় উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় মেগাথেরিয়াম নামে অতি বিশাল শ্লথ বাস করতো। এখন দক্ষিণ আমেরিকার শ্লথ যেমন গাছে উঠতে পারে, তারা কিন্তু পারতো না, তাই মাটিতেই থাকতো। পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালে মেগাথেরিয়ামের উচ্চতা হতো ১৮ ফুট। এই বিশাল প্রাণী



মেগাথেরিয়াম

এত শক্তিধর ছিল যে বড় বড় গাছ ভেঙ্গে পাতা খেতে পারতো। লম্বা জিভ ঘুরিয়ে ছিঁড়ে নিত সবুজ পাতা। বিরাট ও তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ে ফেলতো গাছের মূলের সন্ধানে। আজ থেকে প্রায় ১০ হাজার বছর আগে মেগাথেরিয়ামের অবলুপ্তি ঘটে।

আর এক প্রাণী প্লিস্টোসিন কালে দক্ষিণ আমেরিকায় বাস করতো। গ্লিপ্টোডন নামে এই প্রাণীটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৫ ফুট। আত্মরক্ষার তাগিদে এদের গাত্রাবরণ ছিল বর্ম দ্বারা আবৃত আর্মাডিলোর মতো।

ভারতবর্ষে নর্মদা উপত্যকায় প্লিস্টোসিন অধিযুগে বিরাট মাথা ও লম্বা শিংযুক্ত গো-বংশীয় প্রাণী (Bos namadicus) বাস করতো। নর্মদা উপত্যকায় মহিষ জাতীয় প্রাণীও (Bubalus palacindicus) ছিল। সেই বিরাট প্রাণীর শিং মহিষের মতো কিছুটা চ্যাপ্টা ধরনের ও কোণের আকারে (angulated) পিছনে হেলিয়ে বাঁকানো।

হিমালয়ের শিবালিক পর্বতাঞ্চলে কুরঙ্গ (gazel) জাতীয় অ্যান্টিলোপ বাস করতো। তার নাম দেওয়া হয়েছে Gazella lydekkeri।

জিরাফের মতো লম্বা গলা বিশিষ্ট আদিম উদ্ভিদভোজী যে আমাদের দেশে এককালে ছিল, তার প্রমাণ শিবথেরিয়াম, বিষ্ণুথেরিয়াম প্রভৃতি প্রাণী। তবে, তাদের গলা লম্বা হলেও পায়ের গঠন প্রভৃতি কতকগুলি বৈশিষ্ট্য জিরাফের মতো নয়।

প্লিস্টোসিন অধিযুগে নর্মদা উপত্যকায় ও শিবালিক অঞ্চলে জলহস্তীও বাস করতো। ঐ দুই অঞ্চলের জলহস্তীর বৈজ্ঞানিক নাম ছিল Hippopotamus namadicus এবং Hippopotamus sivalensis।

স্তন্যপায়ীদের মধ্যে ঘোড়ার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস সবচেয়ে বিশদভাবে জানা গেছে। ঘোড়ার পূর্বপুরুষদের ফসিল উত্তর আমেরিকা থেকে বেশি পাওয়া গেছে।

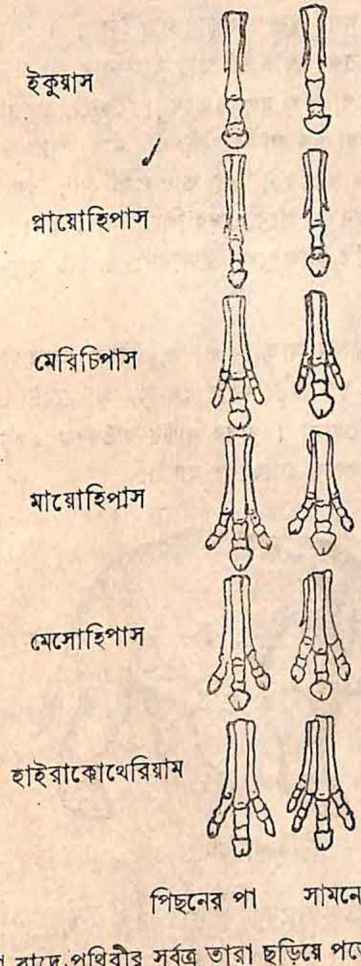
ঘোড়ার আদিমতম পূর্বপুরুষ বলে এখন পর্যন্ত যাকে সনাক্ত করা হয়ে থাকে, তার নাম হাইরাকোথেরিয়াম। কেউ কেউ এর নাম দিয়েছেন ইওহিপাস (অর্থাৎ 'dawn horse')। তবে, দ্বিতীয় নামটি যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ সে সম্ভবত গণ্ডার এবং তাপিরেরও পূর্বপুরুষ ছিল। হাইরাকোথেরিয়াম আকারে খেঁকশিয়ালের চেয়ে বড় নয়। সামনের পায়ে ৪টি করে আঙ্গুল, পিছনের পায়ে ৩টি ; প্রত্যেক আঙ্গুলের প্রান্তে ছোট খুর। ফসিলে বুড়ো আঙ্গুলের একটু অবশিষ্টাংশ দেখে বোঝা যায় যে, এদের পূর্বপুরুষের পায়ে প্রথমে ৫ আঙ্গুল ছিল। অনেকে মনে করেন হাইরাকোথেরিয়াম নরম ও জলা জমিতে চলাফেরা করতো। তার দাঁত দেখে জানা যায় এরা গাছের পাতা খেত।

ইওসিন থেকে অলিগোসিন অধিযুগের মধ্যে ঘোড়ার পূর্বপুরুষের আকার একটু বড় হলো। ঐ যুগের প্রাণীর পা আরো লম্বা এবং প্রতি পায়ে ৩টি আঙ্গুল। মেসোহিপাসের তিন আঙ্গুলের মধ্যে মাঝের আঙ্গুল বড় (পরবর্তীকালে এই মাঝের আঙ্গুল ক্রমে বড় খুরের আকার নেয়)। পায়ের তিনটি আঙ্গুল কিন্তু তখন মাটি স্পর্শ করতো। এর ঘাড় ও মুখ হাইরাকোথেরিয়ামের চেয়ে লম্বা ; দাঁতগুলি গাছের পাতা ছিঁড়ে খাওয়ার উপযোগী।

মায়োসিন অধিযুগে তৃণভূমির বিস্তারের ফলে ঘোড়ার শরীরে আরো পরিবর্তন হয়। তার দাঁতগুলি ঘাস খাওয়ার এবং পা-গুলি দ্রুত দৌড়াবার উপযোগী হয়ে ওঠে, কারণ উন্মুক্ত তৃণভূমিতে লুকোবার জায়গা নেই। মেরিচিপাস দৌড়াত শুধু মাঝের আঙ্গুল বা খুরের ওপরে ভর দিয়ে, পাশের দুটি আঙ্গুল খুব ছোট বলে ঝুলে থাকতো। আকারে সে টাট্টু ঘোড়ার মতো।

মেরিচিপাস থেকে নানা জাতীয় ঘোড়ার উদ্ভব হয় প্লায়োসিন অধিযুগে। তাদের মধ্যে হিপারিয়ন আকারে ছোট ও হালকা; দক্ষিণ আমেরিকা এবং

ঘোড়ার পায়ের ক্রমবিবর্তন



অস্ট্রেলিয়া বাদে পৃথিবীর সর্বত্র তারা ছড়িয়ে পড়ে। অন্য জাতির নাম প্লায়োহিপাস। প্লায়োহিপাসের প্রতি পায়ে মাত্র একটি খুর; দাঁতগুলি ঘাস খাওয়ার

আরো বেশি উপযোগী, এবং মুখের গড়ন ঘোড়ার মতো। এই প্লায়োহিপাস থেকে শেষে ঘোড়া (Equas), জেব্রা ও বুনো গাধার জন্ম হয় । এদের সকলের পায়ে চামড়ার নিচে হাড়ের ছোট ছোট টুকরো আজও দেখা যায়, এবং তা থেকে প্রমাণিত হয় যে এদের পূর্বপুরুষের পায়ে একাধিক আঙ্গুল ছিল ।

উটের আদিপুরুষ প্রোটিলোপাস । ইওসিন অধিযুগের এই প্রাণী আকারে বিড়ালের মতো, কিন্তু পিঠে কোনো কুঁজ ছিল না । পা-গুলি ছোট এবং প্রতি পায়ে ৪টি আঙ্গুল । অলিগোসিন অধিযুগের উট তার চেয়ে বড় হলেও চেহারা অনেকটা এক রকম । মায়োসিন অধিযুগে উত্তর আমেরিকার সমভূমিতে বাস করতো লম্বা পা ও লম্বা গলা যুক্ত অক্সিড্যাক্টিলাস । আবার, সেযুগে স্টেনোড্যাক্টিলাস নামে এক রকম ছোট উট তার সঙ্গে বাস করতো ; এই ছোট উট আরো দ্রুতগামী এবং সে থাকতো দলবদ্ধ হয়ে । কোলোরাডোর সমভূমিতে প্লায়োসিন অধিযুগে বাস করতো এক জাতীয় উট, যার নাম অ্যাল্‌টিক্যামেলাস । ১৮ ফুট উঁচু এই প্রাণীর প্রায় অর্ধেকটা ছিল তার লম্বা গলা, এজন্যে কেউ কেউ একে 'জিরাফ-উট' বলে থাকেন । তবে এদের পিঠে কুঁজ নেই । আজও দক্ষিণ আমেরিকায় উটের নিকট জ্ঞাতি আলপাকা ও লামা দেখা যায়, যাদের কুঁজ থাকে না ।

হাতির আদিপুরুষ মিরিথেরিয়াম আকারে ও আকৃতিতে অনেকটা তাপিরের মতো —কাঁধের কাছে প্রায় ৩ ফুট উঁচু, শরীর মোটা, পা ছোট এবং ওপরের ঠোঁট তাপিরের মতো লম্বা ও ঝোলা । ওপর পাটির কর্তকদন্ত একটু বেশি লম্বা। পরবর্তীকালে এই কর্তকদন্ত গজদন্তে রূপান্তরিত হয় ।

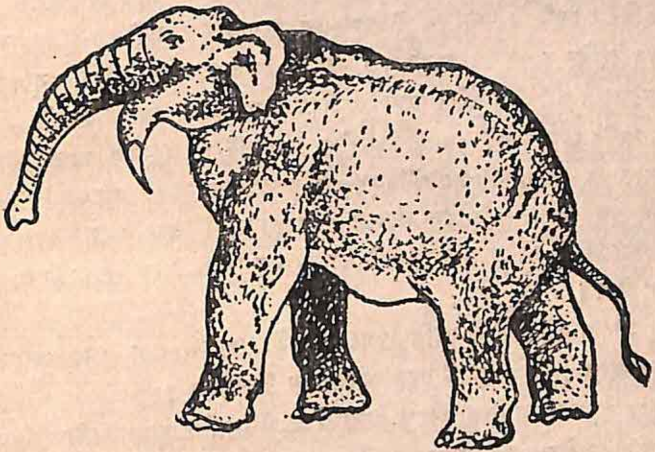


মিরিথেরিয়াম

ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে মিরিথেরিয়ামের আকার বৃদ্ধি পায়, চোয়াল ও কর্তকদন্ত আরো বড় হয় । নাক এবং ওপরের ঠোঁট আরো লম্বা হয় এবং শুঁড়ের আকার গড়ে উঠতে থাকে ।

পরবর্তী প্রাণীদের আকার আরো বড় হয়। তাদের মাথা বড়, ঘাড় ছোট। চোয়াল ও গজদন্ত লম্বা হতে থাকে, শুঁড়ও বড় হয়ে ওঠে। মায়োসিন অধিযুগের ট্রাইলোফোডন তাদের মধ্যে অন্যতম। ট্রাইলোফোডন ১০ ফুট উচু। তার ওপর পাটির গজদন্ত নিম্নমুখী এবং নিচের পাটির গজদন্তও বেরিয়ে থাকতো।

এশিয়া ও আফ্রিকায় মায়োসিন অধিযুগে হাতির মতো আর এক প্রাণী ছিল, যার নাম ডাইনোথেরিয়াম। তার কাঁধের কাছে ১২ ফুট উঁচু। কিন্তু তার শুঁড় ছোট এবং গজদন্ত নিচের দিকে বাঁকানো।



ডাইনোথেরিয়াম

তারপর এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে। হাতিদের নিচের চোয়াল প্রথমে যেমন বড় হয়ে উঠেছিল, তেমন পরে আবার ছোট হতে থাকে। অবশেষে নিচের চোয়াল এত ছোট হয়ে গেল যে, থুতনি (chin) ছাড়া আর কিছু বাকি রইল না এবং ওপর পাটির গজদন্ত বেঁকে উঠলো ওপর দিকে। নিচের চোয়ালের অভাবে শুঁড় ঝুলতে থাকে, কারণ শুঁড়ের ভর দেওয়ার কোনো জায়গা আর রইলো না। এইভাবে তৈরি হলো হাতির আসল শুঁড়, যেমন আমরা এখন দেখি।

ভারতবর্ষে প্লায়োসিন ও প্লিস্টোসিন অধিযুগে হস্তী জাতীয় আর এক প্রাণী বাস করতো; তার নাম দেওয়া হয়েছে স্টিগোডন-গণেশ। স্টিগোডনের গজদন্ত ১০ ফুট ও তার পরিধি ২ ফুট।

মিরিথেরিয়ামের বংশধর শুধু হাতি নয়, ম্যাস্টোডন ছিল আর এক উত্তরসূরী। প্লিস্টোসিন অধিযুগে আমেরিকার বনে থাকত ম্যাস্টোডন। তার গজদন্ত বিরাট। হিমবাহ সরে যাওয়ার পরে যে বনের বিস্তার হয়েছিল, সেখানে এই প্রাণী গাছের ডালপালা ও পাতা খেত।

প্রাচীনকালে ট্রাইলোফোডন ও ডাইনোথেরিয়ামের উদ্ভব যে বিবর্তন ধারায়

হয়েছিল, সেই ধারার অবসান ঘটে প্লায়োসিন কালে। পরে প্লিস্টোসিন অধিযুগে আর এক ধারা থেকে জন্ম নিল বিশাল ম্যামথ। ম্যামথের গজদন্ত হাতির দাঁতের চেয়ে লম্বা ও বাঁকানো। এশিয়া, আফ্রিকা, ইয়োরোপ ও উত্তর আমেরিকার অনেক ম্যামথের গায়ে লোম নেই। আবার, সাইবেরিয়া ও ইয়োরোপের অনেক ম্যামথ খুব লোমশ এবং তাদের লোম পশমের মতো ঝুলে থাকতো; তুষার-যুগের ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে তার শরীর লোমে ঢাকা।

তুষার-যুগ দিয়ে স্তন্যপায়ীর ইতিহাসকে সমাপ্ত করার আগে আদিম পাখি সম্পর্কে কিছু না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পাখিদের ফসিল খুব বেশি আবিষ্কৃত হয়নি। আর্কিওপ্টেরিক্স-এর পরে হলেও সরীসৃপ-যুগের মধ্যে নানারকম পাখির আবির্ভাব হয়েছিল। তাদের ভেতরে জলের পাখি হেস্পেরোরনিস অন্যতম। পাখিটির শরীর জলে ডুব দিয়ে মৎস্য শিকারের উপযোগী। সে লম্বায় ৪ ফুটের চেয়ে একটু বেশি, চঞ্চু তীক্ষ্ণ এবং দুটি পা হাঁসের মতো চামড়া দিয়ে জোড়া। তবে, আর্কিওপ্টেরিক্স-এর মতো তার মুখেও অনেক দাঁত। ডানাগুলি খুব ছোট বলে সে উড়তে পারতো না। এমনকি সে সহজভাবে চলতে পারতো না, কারণ তার পা শরীরের অনেক পিছন দিকে প্রায় সমকোণে ঘোরানো ছিল।

এখন আমরা যত রকমের পাখি দেখতে পাই, তাদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকের আবির্ভাব আজ থেকে ৬ কোটি বছর আগে হয়ে গিয়েছিল।

সবচেয়ে বড় পাখিরা কিন্তু উড়তে পারতো না, উটপাখির মতো মাটিতে বিচরণশীল ছিল। সরীসৃপ-যুগ অবসানের অল্পকালের মধ্যে ডায়াট্রিমা নামে ৭ ফুট উঁচু পাখির আবির্ভাব হয়। সেই মাংসাশী পাখি ইওসিন অধিযুগে ইয়োরোপে এবং উত্তর আমেরিকায় বাস করতো। তার পা লম্বা ও মজবুত এবং চঞ্চু খুব বড়।

দক্ষিণ আমেরিকার প্যাটাগোনিয়ায় ২ কোটি বছর আগে ফোরোহ্রাকোস্ পাখি বাস করতো। তার মাথা প্রায় ঘোড়ার মতো বড়; উচ্চতায় সে ৭-৮ ফুট। বিরাট চঞ্চু সামনের দিকে হুকের মতো বাঁকানো, যাতে মাংস ছিঁড়ে খাওয়া যায়।

আজ হতে কিছুকাল আগে মোয়া এবং Aepyornis (বা Elephant Bird) জীবিত ছিল। এরা উড়তে পারতো না। নিউজিল্যাণ্ডের মোয়া উটপাখির চেয়েও বড়; তার উচ্চতা ১০ থেকে ১১ ফুট। মাদাগাস্কার দ্বীপের এলিফ্যাণ্ট-বার্ড এত বড় যে, তার ডিমের মধ্যে দুই গ্যালন জিনিস ধরে যেত। এই পাখি থেকে সিন্দবাদের রূপকথার রকপাখির কল্পনা করা হয়েছিল বলে মনে হয়।

আজ থেকে প্রায় ১২ হাজার বছর আগে তুষার-যুগের অবসান হয়। পৃথিবীতে হিমবাহের ব্যাপক বিস্তার আরো পূর্বেই হয়েছিল। প্রাক-ক্যাম্ব্রিয়ান মহাকল্পের

শেষে তুষার-যুগ এসেছিল। উত্তর আফ্রিকার বিরাট অংশ তুষারাবৃত হয়েছিল এবং অর্ডোভিশিয়ান কল্পে সম্ভবত তা আরো ব্যাপক রূপ নিয়েছিল। পুরাজীবীয় অধিকল্পে আফ্রিকা মেরু অঞ্চলের দিকে সরে যাচ্ছিল এবং শেষে কার্বনিফেরাস কল্পে দক্ষিণ আফ্রিকায় কিছুটা মেরুর বরফ জমে উঠলো। গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের অনেকটা স্থান কার্বনিফেরাস কল্পের শেষে তুষারাবৃত হয়েছিল।

কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন যে, সূর্যরশ্মির বিকিরণে অথবা পৃথিবীর কক্ষপথে কোনো পরিবর্তনের ফলে তুষার-যুগের সূচনা হয়েছিল। তবে শুধু এটা যে একমাত্র কারণ, তার সুনিশ্চিত প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। পৃথিবীর বুকে কোনো পরিবর্তনও তুষার-যুগের কারণ হতে পারে।

বর্তমান পৃথিবীর মেরু অঞ্চলকে দেখে তুষার জমে ওঠার ভৌগোলিক কারণ বিশ্লেষণ করলে বিষয়টা আরো পরিষ্কার হবে। দক্ষিণ মেরু (অ্যাণ্টার্টিকা) এবং আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে আছে সাগরের বিরাট ব্যবধান, যার মধ্যে কোনো বড় ভূখণ্ড নেই। দক্ষিণ মহাসাগরের ওপর দিয়ে পশ্চিমবায়ু (westerly wind) প্রবহমান বলে সেখানে ঝড় ও ঢেউ বিরামহীন। বায়ু ও সাগরজলের কোনো প্রবাহ উষ্ণ জলস্রোতকে দক্ষিণ মেরুর কাছে নিয়ে আসতে পারে না। ফলে, দক্ষিণ মেরুতে ধীরে ধীরে জমেছে তুষার-স্তূপ (পৃথিবীর প্রায় ৯০ শতাংশ বরফ এখন শুধু দক্ষিণ মেরুতে আছে)। ক্রিটেশাস কল্পে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড টুকরো টুকরো হয়ে গেলেও অলিগোসিন অধিযুগের আগে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড থেকে অ্যাণ্টার্টিকা ভেঙ্গে আলাদা হয়নি। যখন অ্যাণ্টার্টিকা সম্পূর্ণ পৃথক হলো, তারপর হতে উষ্ণ জলপ্রবাহের অভাবে সেখানে অলিগোসিন অধিযুগের শেষ থেকে লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে বরফ জমে ওঠে।

অন্যদিকে, উত্তর মেরু প্রায় চার পাশে ভূমিবেষ্টিত। অ্যালাস্কা ও সাইবেরিয়ার মধ্যবর্তী বেরিং প্রণালী (Berring Straits) অগভীর ও সংকীর্ণ। ক্যানাডা ও গ্রীনল্যাণ্ডের মাঝে ডেভিস প্রণালীর জলও অনেক জায়গায় বদ্ধ, কারণ সেখানে দ্বীপের সংখ্যা বেশি। শুধু নরওয়ে ও গ্রীনল্যাণ্ডের মধ্যে যতটা সমুদ্র আছে, সেখান দিয়ে উষ্ণ জলপ্রবাহ মেরু অঞ্চলে প্রবেশাধিকার পেয়েছে। তাই, উষ্ণতার অভাবে সুমেরু মহাসাগরের মাঝখানে জমে উঠেছে চিরস্থায়ী তুষার-স্তূপ। এছাড়া, সূর্যরশ্মির বিকিরণের পরিবর্তনও তুষার সৃষ্টির কারণ হতে পারে। তবে, উত্তর মেরুতে বরফ জমেছে দক্ষিণ মেরুর পরে।

অনেক প্রাণী তুষার-যুগে উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে স্থান পরিবর্তন করে। জলবায়ুর পরিবর্তনের সঙ্গে অনেকে নিজেদের মানিয়ে নেয়; লোমশ গণ্ডার ও লোমশ ম্যামথ এর অন্যতম দৃষ্টান্ত। ইয়োরোপের লোমশ গণ্ডার ছিল ১৪ থেকে ১৬ ফুট লম্বা এবং দুই খড়্গবিশিষ্ট। উত্তর আমেরিকায় এবং ইয়োরোপে

মেগাসেরাস বলে বিরাট এল্ক্ হরিণও বাস করতো—তার ডালপালাওয়ালা শিং এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ১২ ফুট ছড়ানো। এই হরিণ সাধারণভাবে আইরিশ এল্ক্ নামে পরিচিত। অ্যালাস্কার তুন্দ্রা অঞ্চলে তুষার-যুগে ছিল ম্যামথ, ম্যাস্টোডন, বিরাটাকার ভূচর শ্লথ, বাইসন, কস্তুরী বৃষ, উট ও ঘোড়া। এদের মধ্যে ম্যামথ, ম্যাস্টোডন ও ভূচর শ্লথ লোপ পেয়েছে। প্লিস্টোসিন অধিযুগে বাইসনের শিং খুব বড় ছিল এবং মাথা থেকে ঐ শিং দু'পাশে প্রায় ৩ ফুট বেরিয়ে থাকত। মাংসাশী পশুদের মধ্যে খড়্গদন্তী বাঘ ও বিশালাকৃতি গুহা-ভালুক লুপ্ত হয়ে গেছে, যদিও নেকড়ে বাঘ, শিয়াল, উলভারাইন ও লিঙ্ক্স আজও বর্তমান।

এইসব জীব কিন্তু এক সময়ে লোপ পায়নি; তবে, এক মহাদেশের ভেতরে প্রাণীদের অবলুপ্তি ঘটেছিল প্রায় এক সময়ের মধ্যে। আজ থেকে প্রায় ১১ হাজার বছর আগে যখন তুষার সরে গিয়েছিল, সেই সময়ে ইয়োরোপ ও উত্তর আমেরিকার বহু জীবের অবলুপ্তি ঘটে। দক্ষিণ আমেরিকার প্রাণীরা বিদায় নেয় প্রায় ১০ হাজার বছর আগে। অস্ট্রেলিয়ায় আদিম প্রাণীদের অবলুপ্তি প্রায় ১৩ হাজার বছর আগে হয়েছিল। আর আফ্রিকার প্রাণীরা ৪০ থেকে ৫০ হাজার বছর আগে লোপ পেয়েছিল। অন্যদিকে, মাদাগাস্কারের এলিফ্যান্ট্-বার্ড্ এবং নিউজিল্যাণ্ডের মোয়া পাখির অস্তিত্ব আজ থেকে মাত্র হাজার বছরের মধ্যে পৃথিবী থেকে মুছে গেছে।

তাই, জীবের অবলুপ্তির জন্যে শুধু জলবায়ুকে দায়ী করা যায় না। এর জন্যে মানুষও দায়ী। আফ্রিকায় আদিমানবের তৈরি পাথরের হাতিয়ারের আঘাতে অনেক প্রাণী লোপ পায়। আজ থেকে প্রায় ১১,৫০০ বছর আগে বেরিং প্রণালী দিয়ে উত্তর আমেরিকায় আসে প্রস্তর-যুগের মানুষ এবং তারা হাজার বছরের মধ্যে সমস্ত আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে—তাদের হাতে প্রাণ দেয় অনেক জীব। অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডেও প্রস্তরযুগে মানুষের অনুপ্রবেশের জন্যে বহু প্রাণীর অবলুপ্তি ঘটে। মাদাগাস্কারেও মানুষের আগমনের ফলে বিশাল পাখিগুলির মৃত্যু হয়।

একটা জিনিস লক্ষ্য করার এই যে, তখন প্রধানত বৃহদাকার প্রাণীরা পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছিল। ক্ষুদ্র প্রাণীদের চেয়ে তার সংখ্যা ও বংশবৃদ্ধির হার কম এবং সেটা এই অবলুপ্তির একটি কারণ হতে পারে। কেবল তাই নয়, পরিবেশের পরিবর্তন থেকে আত্মরক্ষা করা বৃহৎ প্রাণীদের পক্ষে আরো কঠিন। তাছাড়া, বৃহদাকার মাংসাশী পশুদের সঙ্গে শেষে মানুষের খাদ্যসংগ্রহ ও শিকারের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছিল। এই তীব্র প্রতিযোগিতা যে তাদের অবলুপ্তির অন্যতম কারণ ছিল, সেকথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

১৩

মানুষ এলো কোথা থেকে

মানুষ এলো কোথা থেকে, এই বিরাট প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় বানর ও বনমানুষের মতো মানুষও প্রাইমেট বর্গের অন্তর্গত। বলা হয়, কোনো সাধারণ আদিপুরুষ থেকেই বানর, বনমানুষ এবং মানুষের উৎপত্তি হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, বনমানুষ ও মানবের ইতিহাস ধরে পিছিয়ে গেলে এক সাধারণ আদিপুরুষের সন্ধান পাওয়া যাবে, যা থেকে দুটি ধারা আলাদা হয়েছিল। সেই সাধারণ আদিপুরুষের সঙ্গে কিন্তু বনমানুষ বা মানবের সাদৃশ্য বেশি ছিল না; তার আকৃতিতে বনমানুষ বা মানবের কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য তেমন প্রকাশ পায়নি। যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখে মানব ও বনমানুষকে সঠিক-ভাবে সনাক্ত করা যায়, সেই বৈশিষ্ট্যগুলির বিকাশ (specialization) হয়েছে পরের দিকে। ঐ সাধারণ পূর্বপুরুষের শরীর তুলনায় unspecialized ছিল বলা যেতে পারে।

কে সেই সাধারণ পূর্বপুরুষ এবং মানবের বিবর্তন ধারা বনমানুষের থেকে কত কোটি বছর আগে আলাদা হয়েছিল, সে বিষয়ে নানা মুনির নানা মত—প্রত্যেক মতের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহু যুক্তি। এই প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে এত মত ও যুক্তির আলোচনা করা সম্ভব হবে না। দ্বিতীয়ত—নতুন নতুন ফসিল আবিষ্কারের ফলে কোনো মতবাদ ধ্রুব সত্য হয়ে থাকতে পারে না। তাই, এরকম বিষয় আলোচনায় একটা কথা আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে, বিজ্ঞান হলো এক 'never-ending search for an ever-receding goal'।

মানুষের কথা আলোচনার সময় প্রথমেই বলা প্রয়োজন, তার বিশেষত্ব কোথায়। মানুষের একটা বড় বিশেষত্ব এই যে, তার দৈহিক স্পেশালাইজেশন অন্য জীবজন্তুর চেয়ে কম। ঈগল পাখি যত বেশি দূরের জিনিস দেখতে পায়, মানুষ তা পারে না। কুকুরের মতো তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তি মানুষের নেই। সে ঘোড়া ও হরিণের মতো দ্রুতগামী নয়। বাঘ-সিংহের মতো দৈহিক শক্তিও তার নেই। তবে তা হলেও এই সব গুণাগুণ মানুষের মধ্যে যথেষ্ট আছে, যদিও কোনো বিশেষ গুণে সে কোনো বিশেষ প্রাণীর সমান নাও হতে পারে। যদি হাতি বা জিরাফ প্রভৃতি প্রাণীর মতো কোনো বিশেষ স্পেশালাইজেশন মানুষের বেশি হতো তবে তার পক্ষে বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে এমনভাবে মানিয়ে নেওয়া সম্ভব হতো না। মানুষের দৈহিক স্পেশালাইজেশনের মধ্যে প্রধান হলো মস্তিষ্কের জটিলতা, সিধা হয়ে থাকা এবং দুই পায়ে চলা।

শুধু দৈহিক স্পেশালাইজেশন নয়, মানুষের আচার-আচরণেও স্পেশালাইজেশন কম। তাই, সে সবরকম পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পেরেছে।

কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হবে যে, মানুষের আচার-আচরণ অন্যান্য প্রাণীদের থেকে অনেক তফাত। মস্তিষ্কের জটিলতা এর মূল কারণ। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আসা বিভিন্ন 'ঘাত'কে (impulse) এই মস্তিষ্ক যেভাবে বিশ্লেষণ করে স্মৃতির ভাণ্ডারে রেখে দেয় এবং পরে তাদের সমন্বিত করে আরো নতুন নতুন আচার-আচরণের সৃষ্টি করে, তা অন্য কোনো প্রাণীর মস্তিষ্ক পারে না।

আচার-আচরণের কোন কোন বৈশিষ্ট্য মানুষকে আলাদা করেছে, সেগুলিকে বোঝার জন্যে বিজ্ঞানীরা বহু দিন থেকে চেষ্টা করছেন। প্রথমে কেউ কেউ বলেছিলেন যে, একমাত্র মানুষ হাতিয়ার ব্যবহার করে। কিন্তু দেখা গেল, আরো কোনো কোনো জীব হাতিয়ারের ব্যবহার জানে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলের সমুদ্রে একরকম ভোঁদড় আছে, যারা শামুকের মাংস খাওয়ার সময় নুড়িপাথর দিয়ে তার খোলা ভেঙে নেয়। তাই, হাতিয়ার-ব্যবহার মানুষের একমাত্র আচরণগত বৈশিষ্ট্য নয়।

তখন কোনো কোনো পণ্ডিত বললেন যে, একমাত্র মানুষ হাতিয়ার বানাতে পারে। এ কথাটাও কিন্তু পরে ভুল বলে প্রমাণিত হলো। শিম্পাঞ্জিও কিছু হাতিয়ার বানায়। তারা উইঢিবির গর্তে কাঠি ঢুকিয়ে দেয়; সেই কাঠির গায়ে উইপোকা তার দাঁড়া দিয়ে আটকে ধরলে তাকে সাবধানে গর্ত থেকে বের করে আনে এবং পোকাগুলিকে খেয়ে ফেলে। এই কাজের জন্যে শিম্পাঞ্জি বন থেকে ছোট ছোট ডাল বা শক্ত পাতা প্রথমে বেছে আনে এবং তাকে একটু ভেঙে বা ছিঁড়ে নিজের ব্যবহারের উপযোগী করে নেয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শিম্পাঞ্জিও হাতিয়ার তৈরি করতে পারে।

আবার কোনো কোনো বিজ্ঞানী বলেছেন, একমাত্র মানুষই ভাষার ব্যবহার জানে। কিন্তু আমেরিকার পণ্ডিতেরা সাম্প্রতিক কালে পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, শিম্পাঞ্জিকে এক বিশেষ প্রণালীতে শিক্ষা দিলে তারা সংকেতের সাহায্যে নানা ভাবের প্রকাশ করতে পারে।

জীবজন্তুদের থেকে মানুষের তফাতকে প্রথমে যেরকম বলে মনে করা হয়েছিল, পার্থক্যটা কিন্তু আসলে সেরকম নয়। মানুষের আচরণগত অনেক বৈশিষ্ট্য বহু জীবের মধ্যে দেখা যায়। কোনো কোনো প্রাণী হাতিয়ারের ব্যবহার জানে, কেউ কেউ হাতিয়ার বানাতেও পারে। অনেকে নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের জন্যে নানারকম শব্দসংকেত ব্যবহার করে। অনেকে সংঘবদ্ধ হয়ে বাস করে এবং সেই সংঘের গঠন বেশ জটিল এবং সংঘে বাস করার জন্যে শিশুদের শিক্ষাও দেয়। কিন্তু এইসব আচার-আচরণের জটিলতায় কেউ মানুষের সমান হয়নি। মানুষ যেসব হাতিয়ার তৈরি ও ব্যবহার করে, তা অন্য কোনো প্রাণীর পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষের ভাষা অনেক জটিল এবং এত রকম ভাব প্রকাশ করতে পারে তা বলে শেষ করা যাবে না। মানুষ সারাজীবন ধরে

জানতে ও শিখতে চায় বলে, তার সমাজ ও সংস্কৃতি যেমন করে গড়ে উঠেছে তা অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে দেখা যায়নি। তাছাড়া, মানুষের আচার-আচরণে আরো অনেক বৈচিত্র্য আছে যা অন্য জীবজন্তুর নেই।

এখন দেখা দরকার, প্রাইমেট বর্গের মধ্যে মানুষের স্থান কোথায়। আগে বলা হয়েছে যে, এই বর্গের মধ্যে আছে প্রোসিমিয়ান বা প্রাক্-বানর (যেমন লেমুর, গ্যালাগো, লোরিস, টারসিয়ার প্রভৃতি), বানর, বনমানুষ এবং মানব। এর মধ্যে একটি উপবর্গের (sub-order) নাম অ্যান্থ্রোপয়ডিয়া (Anthropus শব্দের অর্থ মানুষ)। অ্যান্থ্রোপয়ডিয়া বলতে সেই সব প্রাইমেটদের বোঝায়, যাদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য কতকটা মানুষের মতো—এই উপবর্গের মধ্যে পড়ে বানর, বনমানুষ ও মানব। এদের আমরা 'নরসদৃশ প্রাইমেট' বলতে পারি। আবার, এই উপবর্গের মধ্যে হোমিনয়ডিয়া নামে একটি জাতি (super family) আছে—বনমানুষ ও মানব এই জাতির অন্তর্গত। হোমো এবং অ্যান্থ্রোপাস—দুটি শব্দের একই মানে (অর্থাৎ মানুষ) বলে আমরা সুবিধার জন্যে হোমিনয়ডিয়াকে নরাকৃতি প্রাইমেট বলবো। এদের লেজ নেই। এরা বানরের মতো চার হাত-পায়ে চলা ছাড়া আরো দু'রকম উপায়ে চলতে পারে এবং তা হলো হাত দিয়ে গাছের ডাল ইত্যাদি ধরে ঝুলে ঝুলে যাওয়া (যাকে brachiation বলে) এবং দুই পায়ে হাঁটাচলা। হোমিনয়ডিয়ার মধ্যে অন্যতম গোত্র Hominidae; এরা বনমানুষের থেকে আলাদা। হোমিনিডির মধ্যে শুধু যে মানুষ আছে তা নয়, অনেকটা মানুষের মতো আরো প্রাইমেট ছিল যারা লুপ্ত হয়ে গেছে। তাই, হোমিনিডদের বলা হয় প্রায়-মানব। এদের মধ্যে কোনো বিশেষ শাখা থেকে হয়েছে প্রকৃত-মানব বা হোমোদের উৎপত্তি। তাই, হোমোকে হোমিনিড গোত্রের অন্তর্গত এক বিশেষ গণ (genus) বলা হয়ে থাকে। আর, হোমোদের মধ্যে কোনো একটি শাখা থেকে হয়েছে বর্তমান মানবের উদ্ভব। হোমোদের মধ্যে যে বিশেষ প্রজাতি (species) থেকে বর্তমান মানবের জন্ম, তার নাম দেওয়া হয়েছে Homo sapiens অর্থাৎ 'man the wise' বা জ্ঞানী মানব।

আগেই বলা হয়েছে, ক্রিটেশাস কল্পের স্তন্যপায়ীরা ছিল ক্ষুদ্রাকৃতি। পরবর্তী-কালে ঐ প্রাণী থেকে বহু ধারায় স্পেশালাইজেশন হওয়ার ফলে বিভিন্ন জাতীয় স্তন্যপায়ীর উদ্ভব হয়। প্রাইমেট বর্গের উদ্ভব হয়েছে আজ থেকে প্রায় সাড়ে-সাত কোটি বছর আগে, কোনো বৃক্ষচর কীটভুক ক্ষুদ্র জীব থেকে। তার মুখ সামনের দিকে লম্বাটে ও পায়ে নখর (claw)। তবে, প্রাইমেটের আকারে তার পূর্বপুরুষের সাধারণ (unspecialized) কাঠামো কিছুটা রয়ে গেছে, যেমন গর্তে লাগানো 'বল'-যুক্ত দণ্ডের মতো কাঁধ ও শ্রোণীচক্রের অস্থিসন্ধি

এবং হাত-পায়ের পাঁচটি আঙুল। আদিমতম প্রাইমেট থেকে তার পূর্বপুরুষের পার্থক্য ফসিলের সাহায্যে বোঝা সহজ নয়। তার বিবর্তনধারা অনেকটা সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করে হয়েছিল, যেমন মস্তিষ্কের আয়তনবৃদ্ধি, মুখের অগ্রভাগের (snout) দৈর্ঘ্য হ্রাস, দাঁতের পরিবর্তন ইত্যাদি। কীটভুক পূর্বপুরুষ থেকে আদিম প্রাইমেটদের সনাক্ত করা হয় প্রধানত দাঁত ও করোটির বৈশিষ্ট্য দেখে।

প্রাইমেটের মধ্যে স্পেশালাইজেশনের সৃষ্টি হয়েছিল পরে। উদাহরণস্বরূপ, দন্ত-বৈশিষ্ট্যকে নেওয়া যেতে পারে। বানর ও বনমানুষের নিচের পাটির পেষকদন্তের উপরিপৃষ্ঠে কয়েকটি ছোট চূড়া (cusp) থাকে। বানরের পেষকদন্তে সাধারণত জোড়ায় জোড়ায় চারটি চূড়া আছে। বনমানুষ ও প্রায়-মানবের নিচের পাটির কয়েকটি পেষকদন্তে থাকে পাঁচটি চূড়া। এই চূড়াগুলি এমনভাবে সাজানো যে, এদের ফাঁকে কতকটা y বা x অক্ষর, অথবা + চিহ্নের মতো খাঁজের সৃষ্টি হয়েছে। পেষকদন্তের পঞ্চচূড়া এবং y-এর মতো খাঁজ অনেক আগে তৈরি হয়েছিল এবং বনমানুষ ও বানরের সাধারণ পূর্বপুরুষের দাঁতেও ছিল এরকম বৈশিষ্ট্য। আদিম বনমানুষ (ড্রায়োপিথেকাস) এবং প্রায়-মানবের কয়েকটি দাঁতে সেই সাধারণ পূর্বপুরুষের বৈশিষ্ট্য থেকে যায়। পেষকদন্তে চারটি করে চূড়ার সৃষ্টি পরে হয়েছে। মানুষের বিবর্তনধারায় দেখা যায় যে, তার কোনো কোনো পেষকদন্তে চূড়ার সংখ্যা হ্রাস পেয়ে চার বা তিনে এসে দাঁড়িয়েছে, যদিও কোনো কোনোটিতে পঞ্চ চূড়া আজও বর্তমান। আবার, প্রায়-মানব ও বনমানুষের সাধারণ পূর্বপুরুষের ওপর পাটির পেষকদন্তে চারটি চূড়া ছিল ; ক্রমবিবর্তনের ফলে বর্তমান মানবের কোনো কোনো পেষকদন্তে চূড়ার সংখ্যা তিনে এসে দাঁড়িয়েছে।

এ থেকে বোঝা যায় যে, সুপ্রাচীনকালে সেই সাধারণ আদিপুরুষের মধ্যে বানর ও বনমানুষের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। তাদের পরিবেশ ও খাদ্যাভ্যাস কিন্তু সব জায়গায় একরকম নয়। পরিবেশে অথবা খাদ্যাভাসের পার্থক্যের জন্যে তাদের মধ্যে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেতে থাকে। কিন্তু এই নতুন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ এত ধীরে ধীরে একটু একটু করে হয়েছিল যে, তাদের বহু ফসিল দেখেও বোধ হয় প্রথম বানর বা প্রথম বনমানুষকে কোনোদিন নির্ভুলভাবে সনাক্ত করা যাবে না।

ভৌগোলিক কারণে এবং আচার-আচরণের পার্থক্যের ফলেও কোনো বিশেষ জাতীয় প্রাণীর মধ্যে ছোট-ছোট ভাগের সৃষ্টি হয়। তাই, তাদের মধ্যে পারস্পরিক মিলন-মিশ্রণ কমে যেতে থাকে। যদি পর্বতমালা থাকায় অথবা সমুদ্র বা মরুভূমির প্রসারে কোনো জাতি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে তার সঙ্গে অন্যদের মিলন-মিশ্রণের সম্ভাবনা থাকে না। এইভাবে বিভিন্ন গোত্র, গণ ও প্রজাতি

সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলে । সেজন্যে অনেক পণ্ডিত বলেন যে, প্রাণীকূলের বৈচিত্র্যময় ধারা-উপধারা সৃষ্টির মূলে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা তথা দৈহিক মিলনের বাধাই দায়ী ।

প্রাইমেটের উৎপত্তির কথা আলোচনার সময়, প্রথমে একরকম আদিম কীট-ভূক জীবের বিষয়ে উল্লেখ করা দরকার । প্রায় সাড়ে-সাত কোটি বছরের চেয়েও আগে ইঁদুরের মতো আকার ও আকৃতির কিছু স্তন্যপায়ী প্রাণী কীটপতঙ্গের সন্ধানে বনের মাটিতে ঘুরে বেড়াত । কিন্তু মাটিতে থাকলে সেখানে অন্য প্রাণী-দের সঙ্গে জীবনসংগ্রামের প্রতিযোগিতা তীব্র । সম্ভবত ঐজন্যে কীটভূক প্রাণী-দের মধ্যে কিছু জীব গাছের ডালে উঠতে আরম্ভ করে ; বৃক্ষবাসের আর একটা কারণ বোধ হয় খাদ্যের প্রাচুর্য । আজও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বনে একরকম বৃক্ষচর প্রাণী দেখা যায়, যার নাম গেছো-শ্রু (Tree Shrew) । এর চেহারা অনেকটা ছুঁচোর মতো—মুখ সরু ও লম্বা এবং চার পায়ে নখর । প্রথম থেকে আজ অবধি গেছো-শ্রু'দের আকৃতি প্রায় অপরিবর্তিত রয়ে গেছে, কারণ এদের দৈহিক পরিবর্তনের আবশ্যকতা বেশি ছিল না ; যে পরিবেশে এরা বাস করে তা প্রায় একই রকম রয়ে গেছে এবং তার সঙ্গে এরা প্রথম থেকে নিজেদের মানিয়ে নিতে পেরেছে ।

গেছো-শ্রু'দের মতো কোনো কোনো আদিম কীটভূকের মধ্যে বহুকাল ধরে ক্রমপরিবর্তন হতে থাকে । দীর্ঘকালব্যাপী বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এমন প্রাণীর সৃষ্টি হলো, যারা একটু বেশি বুদ্ধিমান বা শক্তিশালী অথবা কীটপতঙ্গ শিকারে আরো দক্ষ । বিবর্তনের পথে যারা এইভাবে এগিয়ে যায়, তারা জীবনসংগ্রামে আরো সফল এবং তাদের বংশবিস্তার দ্রুত হয় । বৃক্ষচর প্রাণীদের মধ্যে এইভাবে জন্ম নিল আরো উন্নত জীব । বৃক্ষবাসের জন্যে যেসব গুণাগুণ থাকা প্রয়োজন, তার তাগিদে এদের বিবর্তন দ্রুততর হলো । এখানে লাফানো এবং ডাল আঁকড়ে ধরে থাকাটা বেশি জরুরি । তাই, কোনো কোনো প্রাণীর পিছনের পা আরো লম্বা হয়ে উঠলো । সামনের পায়ে বাঁকানো ও ধারালো নখরের জায়গায় ধীরে ধীরে তৈরি হলো চ্যাপ্টা নখ (nail) । চারটি থাবা ক্রমে হাতের মতো হলো । আঙুল হলো আরো লম্বা ও কার্যক্ষম এবং আঙুলের প্রান্তে চ্যাপ্টা নখের পিছনে তৈরি হলো মাংসল অংশ, যাতে ভালো করে ডালপালা আঁকড়ে থাকা যায় ।

ডালে লাফালাফি করা, আঁকড়ে থাকা এবং পোকামাকড় বা গিরগিটি ধরার জন্যে শ্রবণশক্তির চেয়ে দৃষ্টিশক্তির গুরুত্ব বেশি । বৃক্ষচরের দৃষ্টিশক্তি এমন হওয়া উচিত, যাতে সব জিনিসের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের সঙ্গে আয়তন বা দূরত্বকে সে সঠিক বুঝতে পারে—যাতে ডালপালা ও পাতার ফাঁকে কত ভেতর দিকে শিকার আছে বা এক ডাল থেকে অন্য ডালে লাফাতে গেলে কতদূর যেতে হবে, তা নির্ভুলভাবে দেখতে পায় । তার চোখ সব জিনিসকে তিন মাত্রায় (three dimension)

দেখার উপযোগী হওয়া উচিত। এজন্যে উন্নত বৃক্ষচর জীবের মধ্যে অনেকের মুখে সামনের দিকে এগানো আকার (snout) ছোট হয়ে গেল এবং করোটি আরো গোলাকার হলো। চোখগুলি আরো বড় হলো এবং ক্রমশ মুখের সামনে সরে এলো, যাতে সব জিনিসকে ত্রৈমাত্রিক রূপে দেখতে পায় ; এরই নাম stereoscopic vision।

অপরপক্ষে, তৃণভোজী বা উদ্ভিদভোজী ভূচর প্রাণীদের চোখ কিন্তু এরকম তিন মাত্রায় দেখার উপযোগী হওয়ার দরকার নেই। বরং মাটিতে থাকতে গেলে চোখ এমন হওয়া উচিত, যাতে বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে দু'পাশে এবং একটু পিছনেও দেখতে পায়। সেজন্যে গোরু, ঘোড়া, ছাগল, হরিণ, জিরাফ, খরগোশ প্রভৃতির চোখ থাকে মাথার দুই পাশে এবং মাথা সামনের দিকে লম্বাটে। কিন্তু গাছের ডালে ডালে ক্ষুদ্র পতঙ্গ বা ক্ষিপ্রগতি গিরগিটি খেতে গেলে মস্তিষ্ক আরো উন্নত মানের হতে হয়। তাই, যে বৃক্ষচরের করোটি গোল আকৃতি নিয়েছিল, তার মধ্যে মস্তিষ্কের আয়তন ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

নতুন বৈশিষ্ট্যগুলি ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে এত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তখন এক নতুন বর্গকে সুনিশ্চিত ভাবে সনাক্ত করা সম্ভব হলো, যার নাম প্রাইমেট।

প্রাইমেট বর্গের মধ্যে প্রোসিমিয়ান সবচেয়ে প্রাচীন জীব। প্যালিওসিন অধিযুগের প্রোসিমিয়ানদের মধ্যে প্লিসিয়াডাপিস অন্যতম। তাকে দেখতে অনেকটা কাঠবিড়ালের মতো, পা-গুলি নখরযুক্ত বলে তারা কাঠবিড়ালের মতো গাছের গা আঁচড়ে ওঠানামা বা চলাফেরা করতো। তবে, পা-গুলি ডালপালা ধরার তেমন বেশি উপযোগী নয়, যতটা পরবর্তী কালের প্রাইমেটের ছিল। সামনের দাঁত কাঠবিড়ালের মতো বড়। কষের দাঁত থেকে প্লিসিয়াডাপিস এবং তার সমকালীন অনুরূপ প্রাণীদের প্রাইমেট বলে সনাক্ত করা হয়েছে। এদের কষের দাঁতের চ্যাপ্টা ধরনের উপরিপৃষ্ঠে ছোট-ছোট গোলালো চূড়া দেখা গেছে, যা প্রাইমেটের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ইউসিন অধিযুগের প্রোসিমিয়ানদের মধ্যে প্রাইমেটের বৈশিষ্ট্যগুলি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাদের মুখের সামনের দিক খুব বেশি এগোনো নয় ; চোখগুলি একটু সামনের দিকে, মস্তিষ্কের আয়তন বড়। পায়ে নখরের বদলে নখ থাকায় আরো সুবিধা হতো, কারণ নখ থাকলে ডালপালা ভালো করে আঁকড়ে ওঠানামা বা চলাফেরা করা যায়। পা-গুলি ডালপালা ধরে বা জড়িয়ে থাকার আরো উপযোগী। তবে, এর দাঁতের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল, যা বর্তমান যুগের প্রোসিমিয়ানদের মধ্যে দেখা যায় না ; উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, লেমুর ও লেরিসের সামনের দাঁত যেমন চিরুনির মতো, এদের সেইরকম নয়।

বর্তমান যুগের প্রোসিমিয়ানরা প্রধানত নিশাচর এবং এরা আফ্রিকা, মাদাগাস্কার ও দক্ষিণ এশিয়ার ঘন বনে বাস করে। এদের মধ্যে অনেকের মুখ

সামনের দিকে একটু এগোনো, দু'পাশে গোঁফ আছে (যেমন ইঁদুর, বিড়াল প্রভৃতির থাকে), ওপরের ঠোঁট ও নাকের মাঝে ভিজে চামড়া থাকে (যেমন অনেক স্তন্যপায়ীর মধ্যে দেখা যায়), এবং চোখগুলি সম্পূর্ণভাবে ত্রৈমাত্রিক রূপ দেখতে পায় না—দেখে আংশিকভাবে । অর্থাৎ অনেক প্রোসিমিয়ানের মধ্যে স্পর্শ ও ঘ্রাণ শক্তির গুরুত্ব বেশ কিছুটা রয়ে গেছে, যেমন ইঁদুর, বিড়াল, কুকুর ও ভালুক প্রভৃতির হয় ।

আদিম যুগে প্রোসিমিয়ানদের মধ্যে অনেকে আকারে আরো বড় হলো । তাদের আকার কেন বৃদ্ধি পেয়েছিল, তার সঠিক কারণ অজানা হলেও এটুকু বলা যায় জীব-বিবর্তনে আকার বৃদ্ধির একটা প্রবণতা থাকে, যদি-না ছোট থাকায় কোনো অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়া যায় । প্রথমত—বৃহত্তর ও শক্তিশালী পুরুষের পক্ষে স্ত্রীদের জয় করে লাভ করার প্রতিযোগিতায় অন্যদের পরাস্ত করা সহজ । দ্বিতীয়ত—আকার বড় হলে বাজপাখি বা গাছের সাপ প্রভৃতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি । তাই আমরা বলতে পারি যে, বাজপাখি ও সাপের মতো শিকারী প্রাণী থাকায় তারা ক্ষুদ্র জীবকে ধ্বংস করে বৃহদাকার জীব সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিল ।

তবে আকারবৃদ্ধির সমস্যাও আছে । প্রাণীর শরীর বড় হলে লুকিয়ে থাকা আরো কঠিন । দ্বিতীয়ত—বৃহৎ শরীরের জন্যে অধিক খাদ্যের প্রয়োজন । যদি ফল বা পাতা খেতে হয়, তবে প্রাইমেটের আকার এমন বড় হওয়া উচিত নয় যে ডালের আগায় পৌঁছে তা ছিঁড়ে আনা না যায় । বড় হওয়ার আবশ্যকতা যদি খুব বেশি থাকে, তবে প্রাণীর জীবনধারায় পরিবর্তন হয় । লাফানো জন্তুর হাত এত লম্বা হয়ে ওঠে, যাতে সে সহজে কচি ডালের নাগাল পায় । তাছাড়া, প্রাইমেটের হাত লম্বা হলে সে তার হাত-পা দিয়ে তিন-চারটি ডাল ধরতে পারে, যাতে দেহের ভার ভাগ হয়ে যায়, অর্থাৎ কোনো একটি ডালের ওপরে সমস্ত ভার না পড়ে।

জীবনধারণে এইসব সমস্যার সম্মুখীন হতে গিয়ে প্রাইমেটদের আকার আরো বড় হলো, হাত হলো বেশি লম্বা । প্রথমে এদের থেকে প্রোসিমিয়ানদের পার্থক্য বেশি ছিল না, ক্রমে ক্রমে পার্থক্য বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট হলো এক ভিন্ন জাতি। এদের খাদ্যাভ্যাসে পার্থক্য দেখা দিতে আরম্ভ করলো । ফলে, এরা বাস করতে শুরু করলো বনের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, অথবা ভিন্ন ভিন্ন গাছে বা একই গাছের ভিন্ন ভিন্ন অংশে। সম্ভবত ইওসিন অধিযুগের শেষ ভাগে এই বৃহত্তর প্রাইমেটগুলি দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল—পূর্ব গোলার্ধের (এশিয়া, ইয়োরোপ, ও আফ্রিকা) প্রাইমেট এবং পশ্চিম গোলার্ধের (উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা) প্রাইমেট ; কালক্রমে এদের আপন আপন বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠলো । স্পেশালাইজেশনের ধারা এগোলে বড় প্রাইমেটদের মধ্যে কিছু প্রাণী এমনভাবে গড়ে উঠলো, যাতে গাছের ওপরে

চার হাত-পায়ে চলাফেরা করতে পারে—এরাই হলো বানর। বৃহত্তর প্রাইমেট-গুলির মধ্যে আর এক জাতির উদ্ভব হলো, যাদের হাত বানরের চেয়েও লম্বা এবং সেই হাত দিয়ে তারা দূরের ডাল ধরতে পারে, আর ডালে-ডালে ঝুলতে বা দোল খেতে পারে। এই দ্বিতীয় জাতি হলো বনমানুষ।

বানর আবির্ভাবের ফলে প্রোসিমিয়ানরা জীবনসংগ্রামে পরাজিত হলো। যে বনে বানর থাকে, সেখানে প্রোসিমিয়ানদের প্রাধান্য হ্রাস পেয়েছে (যেমন, দক্ষিণ ভারতের বনে বানরের তুলনায় লোরিসের সংখ্যা অনেক কম)। শুধু মাদাগাস্কারে বানর কখনো ছিল না, এবং আজও নেই বলে সেখানে লেমুরের আধিপত্য বর্তমান।

হাতের ব্যবহারে বানর ও বনমানুষ প্রোসিমিয়ানদের চেয়ে দক্ষ। বানর ও বনমানুষের চোখ সম্পূর্ণভাবে ত্রৈমাত্রিক রূপ দেখতে পায়। শুধু তাই নয়, এরা মানুষের মতো রঙও দেখতে পায়, যা প্রোসিমিয়ান বা অধিকাংশ স্তন্যপায়ী জীব পায় না। গাছে বাস করতে গেলে রং দেখার ক্ষমতা থাকা খুবই জরুরি কারণ তা না হলে দূর থেকে ফল চেনা যায় না এবং ডালপালার অবস্থা (পচা বা মজবুত) বোঝা যায় না। আর একটা পার্থক্য এই যে, বানর ও বনমানুষের মুখের সামনে কোনো ভিজে চামড়া নেই, যেমন অনেক স্তন্যপায়ীর থাকে। বৃহত্তর প্রাইমেটগুলির মধ্যে ঘ্রাণশক্তির চেয়ে দৃষ্টিশক্তির গুরুত্ব বেশি। প্রোসি-মিয়ান থেকে প্রাইমেটের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঘ্রাণশক্তির গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। যেখানে লেমুর ও টারসিয়ারের মস্তিষ্কের ০·০১৯০ ও ০·০০৫৩ শতাংশ ঘ্রাণশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেখানে সেটা কমে গিয়ে পূর্ব গোলার্ধের বানর, বৃহদাকার বনমানুষ (গরিলা, ওরাং-উটান, শিম্পাঞ্জি) ও মানবের ক্ষেত্রে হয়েছে মাত্র ০·০০১১, ০·০০০৭ এবং ০·০০০১ শতাংশ।

প্রোসিমিয়ানের চেয়ে বানরের মস্তিষ্ক বড় ও জটিল। উদাহরণস্বরূপ, আফ্রিকার গ্যালাগোর ('বুশ বেবি') সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার ক্ষুদ্র মারমোসেট বানরের তুলনা করা যায়। এরা আকারে প্রায় সমান হলেও মারমোসেটের মস্তিষ্ক ওজনে গ্যালাগোর মস্তিষ্কের প্রায় তিন গুণ।

আদিম বানরের ফসিল এখনো বেশি আবিষ্কৃত হয়নি। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন যে, বানরের আবির্ভাব অলিগোসিন অধিযুগে হয়ে থাকতে পারে। প্রথমে বানরের চেয়ে বনমানুষের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বেশি ছিল। কিন্তু বনমানুষের আধিপত্য পরে হ্রাস পায় এবং বানরের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে বানরের বৈচিত্র্য ও সংখ্যা বনমানুষের চেয়ে অনেক বেশি।

বানরের ফসিলের মধ্যে পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়া থেকে আবিষ্কৃত ভিক্টোরিয়া-পিথেকাসের নিদর্শনটি অন্যতম। ভিক্টোরিয়া-পিথেকাস বানর আজ থেকে প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ বছর আগে জীবিত ছিল।

পূর্ব গোলার্ধের বানরদের ভেতরে দুটি ভাগ হয়ে গিয়েছিল—কলোবাইন ও সেরকোপিথেকাইন। হনুমান এবং আফ্রিকার কলোবাস বানর প্রথম জাতির অন্তর্গত; আর দ্বিতীয় জাতির মধ্যে আছে মর্কট, বেবুন প্রভৃতি নানারকম বানর। বর্তমান যুগে কলোবাইনের চেয়ে সেরকোপিথেকাইনের বৈচিত্র্য ও সংখ্যা বেশি।

ফসিলে সিমোপিথেকাস নামে একরকম সেরকোপিথেকাইন বানরের বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এখন এর একমাত্র উত্তরসূরী হলো ইথিওপিয়ার গিলেডা বেবুন। গিলেডাদের সঙ্গে কোনো কোনো বিষয়ে মানুষের তুলনা করা যেতে পারে। মানুষের যেমন পেষকদন্ত বড় এবং কর্তক ও ছেদকদন্ত ছোট হয়, গিলেডাদের দাঁতও কতকটা সেরকম। দ্বিতীয়ত—গিলেডারা খাওয়ার সময় হাতের ব্যবহার করে খুব বেশি। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যে, এরা হাতের ব্যবহার বেশি করে বলে কর্তক ও ছেদকদন্তের আকার হ্রাস পেয়েছে, কারণ খাবারকে কাটা-ছেঁড়ার কাজে হাত লাগানোর জন্যে এই দাঁতগুলির ব্যবহার বেশি দরকার পড়ে না। আর সম্ভবত গাছের বীজ ইত্যাদি ছোট ও শক্ত জিনিস খাওয়ার জন্যে পেষকদন্তের আকার বৃদ্ধি পেয়েছিল, কারণ বীজকে ভেঙ্গে পিষে খেতে হয়।

আদিম বনমানুষদের মধ্যে ছিল ভিন্ন ভিন্ন শাখা। কিন্তু পরে এদের বৈচিত্র্য ও সংখ্যা হ্রাস পায়। এখন পৃথিবীতে মাত্র চার রকমের বনমানুষ আছে—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ওরাং-উটান ও গিবন এবং আফ্রিকার গরিলা ও শিম্পাঞ্জি। কেন যে বনমানুষের বৈচিত্র্য সংখ্যা এত হ্রাস পেয়েছে, তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। সম্ভবত এরা জীবনসংগ্রামে প্রায়-মানবদের কাছে পরাজিত হওয়ার ফলে এরকম হয়েছে।

চলাফেরার ধরনে বানর ও বনমানুষের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বানর মাঝে মাঝে দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালেও সে চলাফেরার সময় চার হাত-পায়ের ব্যবহার করে। বানর চলে হাতের তালু ও পায়ের চেটোর ওপরে ভর দিয়ে। যদিও বানর হাত-পায়ের আঙুল দিয়ে নানা কাজ করতে পারে, কিন্তু দৌড়াবার সময় হাতে-ধরা জিনিস ফেলে দিতে হয়, কারণ তখন এরা চার হাত-পায়ের সাহায্য নেয়।

বনমানুষরা ব্র্যাকিয়েশন (অর্থাৎ হাত দিয়ে গাছের ডালপালা নানাভাবে ধরে বা ডালে ঝুলে দোল খেতে খেতে যাওয়া) করে বলে, বানরের চেয়ে আরো সিধা হয়ে দুই পায়ে দাঁড়াতে বা চলতে পারে। বনমানুষের হাত নাড়া বা ঘোরানো-ফেরানো আরো স্বচ্ছন্দ। চার হাত-পায়ে চলার সময় অনেকে আঙুলের গাঁট ও পায়ের চেটোর ধারের ওপরে দেহের ভর দিয়ে রাখে।

বানরের চেয়ে বেশি সিধা হয়ে থাকতে পারে এবং হাত ঘোরানো-ফেরানো আরো স্বচ্ছন্দ বলে বনমানুষের হাত বেশি ব্যবহারোপযোগী। শিম্পাঞ্জি উইটিবির

ছোট গর্তে যেমন দক্ষতার সঙ্গে সরু ডাল বা কাঠি ঢুকিয়ে তা দিয়ে পোকা বের করে খায়, সেটা কোনো বানরের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্যে শুধু যে হাতের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা বেশি থাকা দরকার তা নয়, বুদ্ধিও বেশি থাকতে হবে। তাই অনেকে মনে করেন যে, প্রাইমেটের হাতের ওপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের সম্বন্ধ আছে, কারণ এর প্রমাণ বানরের চেয়ে বনমানুষের বুদ্ধি বেশি।

সাধারণত বানরদের লেজ থাকে। চার হাত-পায়ে চলে বলে দেহের ভার-সাম্য বজায় রাখার জন্যে লেজের দরকার হয়; তাছাড়া, লাফালাফির সময় লেজ এয়ারব্রেকের (air brake) কাজ করে। কিন্তু বনমানুষ ব্র্যাকিয়েশন করে বলে, তার লেজ থাকার দরকার হয়নি। তাই বনমানুষ লাঙ্গুলবিহীন।

ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গিবন আর ওরাং-উটানের শরীরে লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে বহু পরিবর্তনের ফলে, তাদের বিবর্তনধারা গরিলা ও শিম্পাঞ্জির থেকে দূরে সরে গেছে। পণ্ডিতরা বলেন যে, মানুষ, শিম্পাঞ্জি ও গরিলার বিবর্তনধারা পৃথক হওয়ার অনেক আগেই গিবন আর ওরাং-উটানের বিবর্তন আলাদা পথ ধরেছিল।

গিবন আর ওরাং-উটান প্রধানত বৃক্ষবাসী। লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে বৃক্ষবাসের ফলে তাদের শরীরে ঐ পরিবেশের উপযোগী স্পেশালাইজেশন খুব বেশি হয়েছে। গাছের ডালপালায় এরা যত সহজে ঘোরাফেরা করে, মাটিতে নেমে তেমন সহজে চলতে পারে না। ব্র্যাকিয়েশনে গিবন সবচেয়ে দক্ষ এবং এই কাজে তার অস্বাভাবিক লম্বা হাত প্রধান সম্বল। আঙুল অতিরিক্ত লম্বা বলে ডালপালাকে সে জোরে আটকে ধরতে পারে। আঙুলের স্পেশালাইজেশন বেশি হওয়ায় গিবন হস্তকৌশলে বনমানুষদের মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে রইলো এবং তার মস্তিষ্ক বনমানুষদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট থেকে গেল।

ওরাং-উটানের দেহ গিবনের চেয়ে অনেক বড় ও ভারি বলে, তারা ডালে-ডালে অত তাড়াতাড়ি লাফাতে পারে না। কিন্তু তার সব আঙুল ডাল ধরার এত উপযোগী হয়ে উঠেছে যে, তাকে 'চার-হাতওয়ালা' বলা যায়। 'চার হাত' দিয়ে তারা একসঙ্গে কয়েকটা ডাল শক্ত করে ধরে এগিয়ে চলে এবং গাছের প্রায় সব জায়গার নাগাল পায়।

অন্যান্য বনমানুষের চেয়ে গিবন আর ওরাং-উটানের দেহে বৃক্ষবাসের উপযোগী বৈশিষ্ট্যগুলি এত বেশি প্রকাশ পেয়েছে যে, এদের বিবর্তন শাখা থেকে মানুষের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না। এরা দীর্ঘ সময় মাটিতে থাকার অনুপযুক্ত।

গরিলা ও শিম্পাঞ্জি কিন্তু শুধু বৃক্ষবাসের উপযোগী হয়ে গড়ে ওঠেনি। গরিলার ক্ষেত্রে তার আকার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং খাদ্যাভ্যাসে কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে—এই দুটি হলো তার স্পেশালাইজেশন। খাবারের মধ্যে শুধু ফল-পাতা নয়, গাছের কচি ছাল, শিকড়, বাঁশের কোঁড় ইত্যাদিও সে খায়। তার এই দুটি

স্পেশালাইজেশানের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে। যেসব জিনিস গরিলার খাদ্য,তা পাওয়ার জন্যে একে মাটিতে নামতে হয়েছে। বনের মাটিতে বিপদ-আপদ বেশি বলে আত্মরক্ষার জন্যে এর আকার ও শক্তি এত বৃদ্ধি পেয়েছে, যাতে অন্য জন্তু একে আক্রমণ করতে সাহস না পায়। আবার, শরীর বড় হলে খাদ্যের প্রয়োজন বেশি হয় এবং গরিলাকে গাছের ছাল ও বাঁশের কোঁড় থেকে শুরু করে শিকড় পর্যন্ত খেতে হয়। লম্বা হাত আর আঙুল দেখে বোঝা যায় যে, প্রাচীনকালে এর পূর্বপুরুষ বৃক্ষবাসী ছিল।

বনমানুষের মধ্যে শিম্পাঞ্জির দেহে স্পেশালাইজেশান সবচেয়ে কম। তার আকার অতিরিক্ত বড় হয়নি যাতে সে গাছে উঠে কোনো সুবিধা করতে না পারে, অথচ তেমন ছোট নয় যে মাটিতে শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা সম্ভব না হয়। দলবদ্ধ হয়ে থাকার জন্যে অনেক মাংসাশী পশু এদের আক্রমণ করতে ভয় পায়। খাবারের মধ্যে শুধু গাছের জিনিস নয়, পাখির ডিম ও ছানা, পোকামাকড়, ছোট-ছোট সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী প্রাণীও এরা খায়। বিপদে পড়লে কখনো কখনো গাছের ছোট ডাল বা পাথর নিক্ষেপ করে, যেমন ভয়-পাওয়া গরিলা মাঝে-মাঝে গাছের ডাল ছুঁড়ে দেয়। কিন্তু এরা যেমন জল ধরে রাখার জন্যে ঘাসপাতাকে স্পঞ্জের মতো ব্যবহার করে, অথবা উইটিবিতে কাঠি ঢুকিয়ে পোকা বের করে খায়, গরিলা তা পারে না।

সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি যে, নানা পরিবেশের সঙ্গে মানাতে গিয়ে আদিম বনমানুষ জাতি থেকে বিভিন্ন শাখার সৃষ্টি হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, ঘন বনে বসবাস ও খাদ্যের জন্যে ফলপাতার ওপরে নির্ভর করতে গিয়ে কোনো কোনো শাখার বনমানুষের দেহে সেই মতো বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছিল এবং তাদের হাত ক্রমে ব্র্যাকিয়েশনে দক্ষ হয়ে ওঠে। আর যেখানে ফলপাতার চেয়ে মাটি থেকে বীজ, শিকড় ও মূল, পোকামাকড় ও ছোট-ছোট সরীসৃপ প্রভৃতি সহজলভ্য সেখানে প্রাইমেটের আকৃতিতে ও আচার-আচরণে পরিবর্তন স্বাভাবিক। বৃক্ষবাসী বনমানুষকে প্রধানত হাতের দক্ষতার ওপরে নির্ভর করতে হয়। কিন্তু যে বনমানুষকে মাটিতে থাকতে হবে, তার পা-গুলি হাঁটাচলার জন্যে আরো মজবুত হতে হয়, কারণ ঘাসের জমিতে শত্রুর ওপরে নজর রাখতে গেলে সিধা হয়ে থাকাটা বেশি জরুরি। ফলে, ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাদের পা আরো মজবুত হয়ে উঠলো, যাতে সিধা হয়ে বেশি সময় ধরে চলতে পারে।

সেই ভূচর বনমানুষদের হাত জিনিসপত্র ধরার কাজে আগে থেকে বেশি দক্ষ হয়ে উঠেছিল বলে দু'পায়ে চললে তাদের আরো সুবিধা হওয়ার কথা। যদি তাদের মধ্যে কোনো কোনো জাতীয় বনমানুষ বা বনমানুষ-সদৃশ প্রাইমেট (হোমিনয়েড) শিম্পাঞ্জির মতো ছোট ডাল বা পাথর ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারে, তবে সেগুলির ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে সিধা হয়ে চলার প্রবণতা

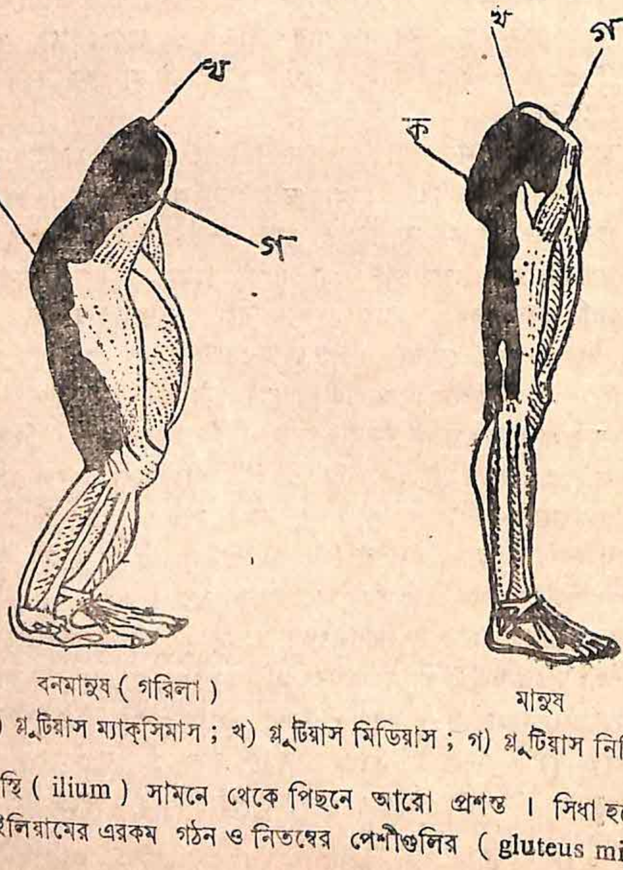
আরো বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে, হাতের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পায়ের আকৃতি সিধা হওয়া ও পায়ে ভর দিয়ে বেশি সময় চলা—এই দুটি দৈহিক বিবর্তন পরস্পর নির্ভরশীল এবং এর সঙ্গে মস্তিষ্কের ক্রমোন্নতিও অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। এইভাবে সম্ভবত কোনো ভূচর বনমানুষ বা তৎসদৃশ কোনো প্রাইমেট থেকে একটা ধারার সৃষ্টি হয়েছিল, যা থেকে জন্ম নিল মানবের আদিপুরুষ।

মানবের কথা আলোচনার সময় বানর ও বনমানুষের থেকে তার শারীরিক প্রভেদ কোথায়, সে বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন।

আমরা দ্বিপদী বলে আমাদের দেহকাণ্ড (trunk) বানর ও বনমানুষের চেয়ে ঋজু। যদিও অন্যান্য প্রাইমেট দেহকাণ্ডকে সিধা রাখতে পারে, কিন্তু তাদের পক্ষে ঐভাবে বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব নয়, কারণ তারা চতুষ্পদী বা বৃক্ষবাসী।

শ্রোণীর (pelvis) গঠনে মানব এবং বনমানুষের মধ্যে পার্থক্য আছে। মানুষের শ্রোণী ওপর থেকে নিচের দিকে অনেকটা ছোট হয়ে গেছে এবং তার

নিতম্বের পেশী



বনমানুষ (গরিলা) মানুষ

ক) গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস ; খ) গ্লুটিয়াস মিডিয়াস ; গ) গ্লুটিয়াস মিনিমাস

নিতম্বাস্থি (ilium) সামনে থেকে পিছনে আরো প্রশস্ত। সিধা হয়ে চলার জন্যে ইলিয়ামের এরকম গঠন ও নিতম্বের পেশীগুলির (gluteus minimus,

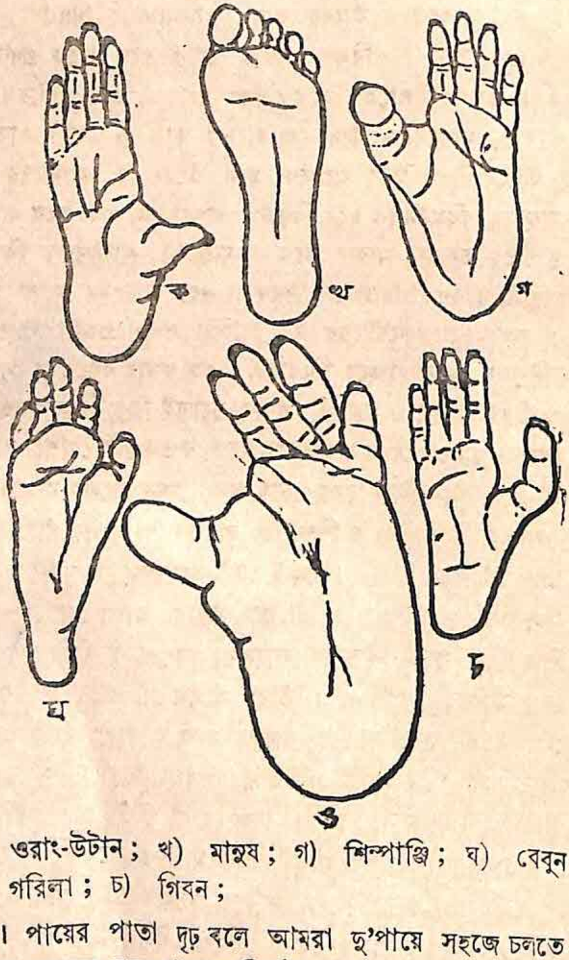
gluteus medius ও gluteus maximus) ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইলিয়াম প্রশস্ত হয়ে মিনিমাস ও মিডিয়াস পেশীকে এমন জায়গায় নিয়ে এসেছে, যাতে এরা থাকে উরুর হাড়ের (femur) প্রান্তে এদের সংযোগস্থলের ঠিক ওপরে। চলার সময় আমরা যখন মাটি থেকে এক-পা তুলি, তখন অন্য পায়ের ওপরে মিনিমাস ও মিডিয়াস পেশী সংকুচিত হয় ও দেহকে সিধা রাখতে সাহায্য করে,— এই বৈশিষ্ট্য কোনো বনমানুষের নেই। বনমানুষের ম্যাক্সিমাস পেশী ইলিয়ামের যতটা স্থান নিয়ে যুক্ত, সেই তুলনায় আমাদের ম্যাক্সিমাস আরো বড়। সিঁড়িতে বা পাহাড়ে ওঠার সময় এই ম্যাক্সিমাস পেশী আমাদের শরীরকে সিধা রাখে।

ব্র্যাকিয়েশনের জন্যে হাতের ওপরে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বেশি থাকা আবশ্যক বলে বনমানুষের কবজি, কনুই ও কাঁধের হাড় (shoulder blade) সেই মতো বিশেষ আকারে তৈরি। গরিলার শরীর ভারি বলে তাকে প্রধানত মাটিতে থাকতে হয়। তবে গরিলাকে দেখে বোঝা যায় যে, তার পূর্বপুরুষ ব্র্যাকিয়েটর ছিল। আবার, মানুষেরও কাঁধ এবং হাতের হাড় ও পেশী হাত ঘোরানো ফেরানোর উপযোগী। তাই অনেকে মনে করেন যে, আমাদের আদিপুরুষ প্রথমে বনমানুষের বিবর্তনপথ ধরে কিছুটা এগিয়েছিল এবং পরে মাটিতে নেমে সিধা হয়ে দু'পায়ে চলতে আরম্ভ করে। মানুষের আদিপুরুষ কিন্তু দীর্ঘকাল বৃক্ষবাস করেনি, কারণ তাহলে সে গিবন বা ওরাং-উটানের মতো ব্র্যাকিয়েটর হয়ে যেত। অর্থাৎ ব্র্যাকিয়েটরের সব বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ প্রকাশ পাওয়ার আগে মানুষের আদিপুরুষ আলাদা হয়ে গিয়েছিল। এক কথায় বলতে গেলে, আমাদের সঙ্গে ব্র্যাকিয়েটর বনমানুষ ও চতুষ্পদী বানর, দুয়েরই কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। আমাদের কাঁধে ও বাহুতে যেমন বনমানুষের মতো কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, তেমন অন্যদিকে আমাদের পা-গুলি হাতের চেয়ে লম্বা, যেমন অনেক বানরের হয়।

মাটিতে চলার সময় গরিলা ও শিম্পাঞ্জি হাতের আঙুলের গাঁটে ভর দেয়,— এরই নাম knuckle walking। কেউ কেউ বলেছেন যে, মাটিতে নেমে চার হাত-পায়ে চলা থেকে দু'পায়ে হাঁটা শুরু করার আগে মানুষের আদিপুরুষ গরিলা ও শিম্পাঞ্জির মতো ঐভাবে চলাফেরা করতো। কিন্তু কোনো কোনো নৃতাত্ত্বিক একথা স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন যে, আমাদের কাঁধের হাড় ওরাং-উটানের মতো যারা মাটিতে চলার সময় আঙুলের গাঁটে ভর দেয় না (মাটিতে চলার সময় হাত একটু মুঠি করে, ওরাং-উটান সেই মুঠির ওপরে ভর দেয়, যাকে fist walking বলা হয়)। সেজন্যে এই দ্বিতীয় মতাবলম্বী পণ্ডিতরা মনে করেন, মানুষের আদিপুরুষ গাছ থেকে মাটিতে নেমে একেবারে দু'পায়ে হাঁটতে শুরু করেছিল (যেমন গিবন মাটিতে নেমে হাঁটে), অর্থাৎ সে কখনো আঙুলের গাঁটে ভর দিয়ে চলেনি। তবে আজও এই বিষয়ে পণ্ডিতদের মতভেদ আছে।

পায়ের পাতার গড়নে ও আঙ্গুলে বনমানুষ ও বানরের থেকে মানুষের অনেক তফাত। বনমানুষ ও বানরের পায়ের পাতা অনেকটা হাতের মতো জিনিস ধরতে বা কাজ করতে পারে, কারণ আঙ্গুলগুলি লম্বা ও বুড়ো আঙ্গুল অন্য আঙ্গুল থেকে দূরে আছে। হাতের কাজ করতে পারলেও এরকম পায়ের পাতার দৃঢ়তা কম, তাই বনমানুষ ও বানর দু'পায়ে বেশিক্ষণ সহজভাবে চলতে পারে না। অন্যদিকে, মানুষের পায়ের আঙ্গুল ছোট এবং সব আঙ্গুল কাছাকাছি, সেজন্যে আমাদের পায়ের পাতা হাতের মতো কর্মক্ষম না হলেও অন্য প্রাইমেটের চেয়ে

পায়ের পাতা

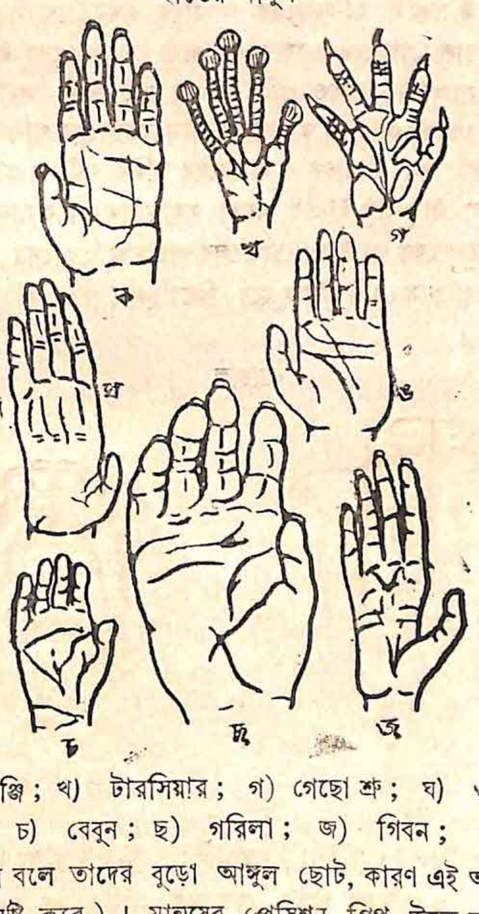


ক) ওরাং-উটান ; খ) মানুষ ; গ) শিম্পাঞ্জি ; ঘ) বেবুন ;
ঙ) গরিলা ; চ) গিবন ;

অনেক দৃঢ়। পায়ের পাতা দৃঢ় বলে আমরা দু'পায়ে সহজে চলতে পারি। এইদিক থেকে বেবুনের সঙ্গে মানুষের কিছুটা তুলনা করা চলে, কারণ মাটিতে থাকে বলে বেবুনের পায়ের আঙ্গুল বড় নয় এবং বুড়ো আঙ্গুল অন্য আঙ্গুলের একটু কাছাকাছি।

সব প্রাইমেটের চেয়ে মানুষের হাতের দক্ষতা বেশি। বানর ও বনমানুষের বুড়ো আঙ্গুল অন্য আঙ্গুল থেকে একটু দূরে হলেও তা ছোট বলে এরা বুড়ো আঙ্গুলের ডগা দিয়ে অন্য আঙ্গুলের ডগাকে সহজে ছুঁতে পারে না। তাই কোনো কিছু ধরার সময় এরা সমস্ত হাতের তালু দিয়ে তাকে মুড়ে নেয়; এই রকম স্থূলভাবে জিনিস ধরাকে বলে power grip। অপরপক্ষে বুড়ো আঙ্গুল এবং অন্য আঙ্গুলের ডগার মধ্যে সহজে জিনিস ধরতে পারলে আরো সূক্ষ্ম কাজ করা সম্ভব বলে তার নাম দেওয়া হয়েছে precision grip। বনমানুষের বুড়ো আঙ্গুল ছোট বলে হাতের কৌশলে সে মানুষের মতো দক্ষ হতে পারেনি (গাছে

হাতের আঙ্গুল



ক) শিম্পাঞ্জি; খ) টারসিয়ার; গ) গেছো শ্রু; ঘ) ওরাং-উটান
ঙ) মানুষ; চ) বেবুন; ছ) গরিলা; জ) গিবন;

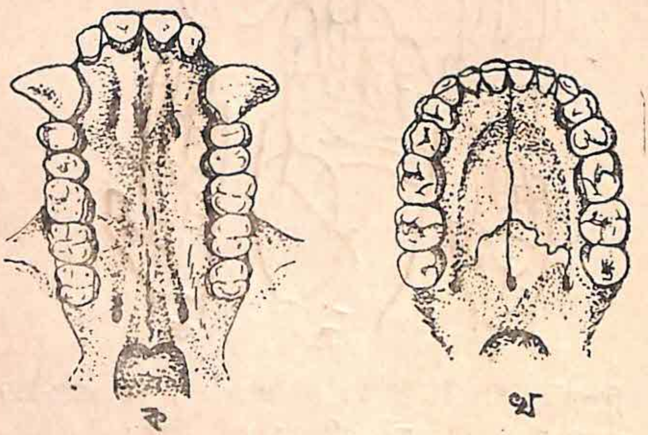
ব্র্যাকিয়েশন করে বলে তাদের বুড়ো আঙ্গুল ছোট, কারণ এই আঙ্গুল বড় হলে তা অসুবিধার সৃষ্টি করে)। মানুষের প্রেসিশন গ্রিপ উন্নত বলে তার পক্ষে হাতের সূক্ষ্ম কাজ বা কারিগরি সম্ভব হয়েছে। আমাদের আদিপুরুষের মস্তিষ্কের উন্নতির সঙ্গে প্রেসিশন-গ্রিপের উন্নতি অঙ্গাঙ্গী জড়িত।

প্রাইমেটের মধ্যে মানুষের লোম সবচেয়ে কম। বানর ও বনমানুষের লোম যেমন পুরু হয়, মানুষের লোম সেই তুলনায় অনেক পাতলা। কেউ কেউ বলেছেন, নরাকৃতি প্রাইমেটদের মধ্যে যারা আমাদের পূর্বপুরুষ ছিল, তারা তৃণভূমি বা উন্মুক্ত স্থানে শিকার করে খেত এবং তাতে কায়িক শ্রম বেশি বলে ঘাম-ঝরা দরকার। তাই অন্যান্য বনমানুষের থেকে তাদের শরীরে লোম কমে গিয়েছিল।

বনমানুষের মতো আমাদেরও দন্ত সংখ্যা ৩২টি (প্রত্যেক পাটিতে ৪টি কর্তকদন্ত, ২টি ছেদকদন্ত, ৪টি পুরঃপেষকদন্ত ও ৬টি পেষকদন্ত) এবং পেষকদন্তের চূড়াগুলি বনমানুষের মতো, যা আগে আলোচিত হয়েছে।

কিন্তু দন্তপাটিতে একটা পার্থক্য সুস্পষ্ট। বর্তমান যুগের বনমানুষের চোয়াল বেশি লম্বা এবং দাঁতগুলি U-অক্ষরের আকারে এমনভাবে সাজানো যে, তার দুই পাশ সমান্তরাল। মানুষের চোয়াল অত লম্বা নয়। মানুষের দাঁতগুলি কতকটা U-এর মতো সাজানো হলেও সেই U-এর দুই পাশ সমান্তরাল নয়, তা অধিবৃত্তাকার (parabolic)। আবার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পণ্ডিত সাইমন্স (E. L. Simons) আদিম বনমানুষ ও বানরদের ফসিল পরীক্ষা করে বলেছেন যে, তাদের চোয়ালে দাঁতগুলি U-এর মতো সমান্তরাল ভাবে সাজানো ছিল না। আদিম অ্যানথ্রোপয়েড প্রাণীদের চোয়ালের অগ্রভাগ কোণের মতো বলে, দুই পাশ পিছন দিকে ক্রমে বেশি ফাঁক হয়ে গিয়েছিল (posteriorly diverging mandibles)।

চোয়াল



ক) বনমানুষের (গরিলা) দন্তপাটি ; খ) মানুষের দন্তপাটি

বনমানুষের ওপর ও নিচের পাটির ছেদকদন্ত অনেক বড়। মুখ বন্ধ করার সময় যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, সেজন্যে তার কর্তকদন্ত ও ছেদকদন্তের মাঝে

কিছুটা ফাঁক থাকে, যার মধ্যে ছেদকদন্তগুলি স্থান করে নেয়। ওপর পাটির কর্তকদন্ত বড় ও সামনের দিকে একটু এগিয়ে থাকে। নিচের পাটিতে সামনের দিকের প্রথম পুরঃপেষকদন্ত কামড়াবার উপযোগী বলে, তা ওপর পাটির ছেদকদন্তের সঙ্গে মিলে এক জোড়া কাঁচির মতো কাজ করে। অপরপক্ষে আমাদের ছেদকদন্ত অতিরিক্ত বড় নয় বলে, কর্তকদন্তের পাশে বনমানুষের মতো ফাঁক থাকার দরকার হয়নি; কর্তকদন্তের আকারও বেশি বড় নয়। মানুষের প্রত্যেক পাটিতে পুরঃপেষকদন্তগুলি একরকম এবং প্রত্যেক পুরঃপেষকদন্তে দুটি করে চূড়া। তাছাড়া, পেষকদন্তগুলি কর্তকদন্তের তুলনায় বড় যা বনমানুষের মধ্যে দেখা যায় না।

মুখের তালুর গড়নেও বনমানুষ এবং মানুষের প্রভেদ লক্ষণীয়। বনমানুষের তালু যেমন সমতল ধরনের, মানুষের সেরকম নয়। মানুষের তালু অনেকটা খিলানের মতো বাঁকানো।

মানুষের স্বরযন্ত্র সবচেয়ে উন্নত। অন্য কোনো প্রাণী মানুষের মতো নানারকম শব্দ করতে পারে না। তাই, আমরা কথা বলতে পারি এবং আমাদের ভাষা এত জটিল।

অলিগোসিন ও মায়োসিন অধিযুগের উন্নত প্রাইমেট ॥ প্রোসিমিয়ান অপেক্ষা উন্নততর প্রাইমেটগুলির সবচেয়ে পুরনো ফসিল পাওয়া গেছে মিশরের ফায়ুম অঞ্চল থেকে। ফসিলগুলি পরীক্ষা করে এদের সঙ্গে পূর্ব গোলার্ধের প্রাইমেটদের সম্পর্ক বোঝা যায়। ফায়ুমে আবিষ্কৃত নিদর্শনগুলির মধ্যে আছে অলিগোপিথেকাস, প্রোপ্লায়োপিথেকাস এবং ইজিপ্টোপিথেকাস। পূর্ব গোলার্ধের বানর এবং বনমানুষ ও মানবের আদিপুরুষের উৎপত্তি এদের থেকে হয়েছিল বলে, কোনো কোনো পণ্ডিতের বিশ্বাস।

আজ থেকে প্রায় ৩ কোটি ২০ লক্ষ বছর আগে অলিগোপিথেকাস জীবিত ছিল। দন্তসংখ্যায় ও দন্তসজ্জায় তার সঙ্গে পরবর্তী কালের উন্নততর প্রাইমেটদের সম্বন্ধ থাকলেও পেষকদন্তগুলির সঙ্গে ইওসিন অধিযুগের কোনো কোনো প্রোসিমিয়ানের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেছে।

অলিগোপিথেকাসের পরবর্তী প্রাইমেট প্রোপ্লায়োপিথেকাস ৩ কোটি বছরের কিছু পূর্বে ফায়ুম অঞ্চলে বাস করতো। প্রোপ্লায়োপিথেকাসের আকৃতিতে স্পেশালাইজেশন বেশি নয় বলে এদের থেকে বানর, গিবন ও বৃহদাকার বনমানুষের মধ্যে কোনো কোনো প্রাণীর, অথবা সব শাখার উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে। ফিনল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী বিয়র্ন কার্টেন (Bjorn Kurten) এর চোয়াল ও দাঁত পরীক্ষা করে বলেছেন যে, মানুষের বিবর্তনধারার উৎপত্তি এই প্রাইমেট থেকে হয়েছিল, কারণ ছোট চোয়াল ও দাঁত আদিম প্রাইমেটের একটা বৈশিষ্ট্য।

এর কর্তকদন্ত বনমানুষের মতো সামনের দিকে এগোনো নয়, আরো সিধা। ছেদকদন্ত ছোট ; কোনো কোনো ফসিলের পুরঃপেষকদন্তে হোমিনিডের মতো দুটি চূড়া। পেষকদন্তগুলি বনমানুষের মতো হলেও শেষের দাঁতটি বেশি লম্বা নয়। থুতনি বনমানুষের মতো বেশি ঢালু ছিল না এবং এর মুখ সামনের দিকে বেশি এগোনো নয়। বানর ও বনমানুষের চোয়াল বড় এবং ছেদকদন্ত লম্বা হয়েছিল পরে (অর্থাৎ স্পেশালাইজেশন পরে হয়েছিল)। তিনি মনে করেন, এই ধরনের ছোট চোয়ালযুক্ত প্রাইমেট থেকে আমাদের আদিপুরুষের সৃষ্টি হয়েছিল, বনমানুষ থেকে আমাদের উদ্ভব হয়নি। তবে, যথেষ্ট নিদর্শনের অভাবে এই বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা কঠিন। অনেক পণ্ডিত একে আদিম বনমানুষ (Pongidae) ছাড়া আর কিছু বলতে চান না।

ইজিপ্টোপিথেকাস থেকে বৃহদাকার বনমানুষ ও মানবের সাধারণ আদিপুরুষের সৃষ্টি হয়েছিল বলে, কোনো কোনো বিজ্ঞানী মনে করেন। এই প্রাণীর ফসিলটি প্রায় ২ কোটি ৯০ লক্ষ বছরের পুরনো।

ইজিপ্টোপিথেকাসের দাঁতগুলি বনমানুষের মতো,—ছেদকদন্ত বড়, ওপর পাটির পেষকদন্তে ৪টি করে চূড়া ও নিচের পাটির পেষকদন্তে পঞ্চ চূড়া। গরিলার মতো এর ভেতর দিকের পেষকদন্তগুলি বেশি বড়। নিচের চোয়াল বনমানুষের মতো লম্বা ও পুরু। তবে, করোটির কোনো কোনো বৈশিষ্ট্যে (যেমন, কানের অংশ) ইওসিন কালের প্রোসিমিয়ানের সঙ্গে সাদৃশ্য ছিল। হাত-পায়ের কাঠামোতে পরবর্তী যুগের বনমানুষের থেকে তফাৎ চোখে পড়ে এবং মনে হয় এরা শুধু গাছে থাকতো।

মায়োসিন অধিযুগের বনমানুষগুলির আচার-আচরণ কতকটা বানরের মতো হতে পারে। দাঁত ও মাথার খুলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য থেকে তাদের বনমানুষ বলে সনাক্ত করা হয়েছে। হাত-পায়ের গড়নে কিছুটা বৃহদাকার বনমানুষ সদৃশ বৈশিষ্ট্য থাকলেও, বানরের সঙ্গে তার সাদৃশ্য বেশি। তাই, হাত-পায়ের স্পেশালাইজেশন কম দেখে মনে হয়, এরা নানাভাবে চলাফেরা করতে পারতো। এরা সম্ভবত গরিলা বা শিম্পাঞ্জির মতো পা ও হাতের আঙুলের গাঁটে ভর দিয়ে চলতে পারতো, ব্র্যাকিয়েশন করতে পারতো এবং এমনকি ডালে ডালে লাফালাফিও করতে পারতো,কারণ এদের শরীর বেশি ভারি নয় এবং পা মজবুত।

নরাকৃতি প্রাইমেট থেকে সম্ভবত মায়োসিন অধিযুগে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শাখার সৃষ্টি হয়েছিল এবং ঐ তিন শাখা থেকে হয় গিবন, বৃহদাকার বনমানুষ ও হোমিনিড বা প্রায়-মানব।

কিন্তু, মায়োসিন অধিযুগের নরাকৃতি প্রাইমেট বা বনমানুষদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ড্রায়োপিথেকাস (বা Oak Ape) ও তৎসদৃশ নানা জাতীয় প্রাণী, যাদের সাধারণভাবে ড্রায়োপিথেসাইন বলা হয়ে থাকে। ড্রায়োপিথেসাইন-

দের মধ্যে বিভিন্ন শাখা থেকে বনমানুষের উদ্ভব হয়েছে বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। এদের সর্বাধিক নিদর্শন পূর্ব-আফ্রিকা থেকে পাওয়া গেছে। মায়োসিন কালে আবির্ভূত এই প্রাণীগুলি ২ কোটি বছরের চেয়েও পুরনো। তবে, এশিয়া ও ইয়োরোপে যে ড্রায়োপিথেসাইন প্রাইমেটগুলির নিদর্শন পাওয়া গেছে, তাদের ফসিল ২ কোটি বছরের চেয়ে কম পুরনো।

প্রথমদিকে আবির্ভূত ড্রায়োপিথেসাইনদের মধ্যে প্রোকন্সাল অন্যতম। ভিকটোরিয়া হ্রদের রুসিঙ্গা দ্বীপ থেকে তার খুলি ও হাত-পায়ের হাড় পাওয়া গেছে। কোনো কোনো বিজ্ঞানী বলেছেন, সে হাতের আঙ্গুলের গাঁটে ভর দিয়ে চলাফেরা করতো না। তবে অন্যান্য দিক থেকে তার সঙ্গে আদিম গরিলা ও শিম্পাঞ্জির সাদৃশ্য বেশি। কেউ কেউ প্রোকন্সালকে গরিলা, শিম্পাঞ্জি ও মানুষের সাধারণ আদিপুরুষ বলে মনে করেন। এবিষয়ে আজও মতবিরোধ আছে।

তবে, মায়োসিন কালে আবির্ভূত বৃহদাকার প্রাইমেটগুলির মধ্যে এত বৈচিত্র্য ছিল যে, তাদের ভেতরে কোনো বিশেষ প্রাণীকে পূর্বপুরুষ বলে নিশ্চিতভাবে সনাক্ত করা সম্ভব নয়।

মায়োসিন কালের শেষভাগের (১ কোটি ৪০ লক্ষ থেকে ১ কোটি বছর আগে) ড্রায়োপিথেকাসের মধ্যে কমপক্ষে ৫টি প্রজাতির নিদর্শন পাওয়া গেছে। তার মধ্যে প্রথম ফসিল ফ্রান্সে ১৮৫৬ সনে আবিষ্কৃত হয়েছিল—এটি Dryopithecus fontani নামে পরিচিত। পরে চীন, ইয়োরোপ ও পূর্ব-আফ্রিকা থেকেও ড্রায়োপিথেকাসের ফসিল পাওয়া গেছে।

ড্রায়োপিথেকাসের মধ্যে কোনো কোনো প্রজাতির বনমানুষ আকারে গরিলা ও শিম্পাঞ্জির মাঝামাঝি ; আবার কোনো কোনোটি মাত্র ৩০-৪০ পাউণ্ড। হাতের কবজি দেখে মনে হয়, এরা গাছের ডালে ঝুলে ঝুলে যেতে পারতো। দাঁত পরীক্ষা করে কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন যে, ড্রায়োপিথেকাস ছিল ফলাহারী। এদের দাঁতে এনামেল কম ছিল।

একরকম ড্রায়োপিথেকাস থেকে গিবনের উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে। মায়োসিন অধিযুগে আফ্রিকার কোনো কোনো ড্রায়োপিথেকাস উচ্চভূমিতে বাস করতো এবং ক্রমে এদের ওজন ও আকার বৃদ্ধি পেয়েছিল। শিম্পাঞ্জির আবির্ভাব হয়েছিল সম্ভবত নিম্নভূমিতে বসবাসকারী কোনো ছোট হোমিনয়েড থেকে। ওজনে হালকা বলে সে গাছে সহজে ওঠানামা করতে পারত ; আবার, বনের ধারে খোলা জমিতেও থাকতো।

কেউ কেউ মনে করেন যে, পশ্চিম হিমালয়ের আদিম বনমানুষ শিবপিথেকাস (Sivapithecus) থেকে ওরাং-উটানের উদ্ভব হয়েছিল। আর এক বনমানুষের সৃষ্টি হয়েছিল এই ধরণের হোমিনয়েড থেকে। তার নাম জাইগ্যান্টো-

পিথেকাস । জাইগ্যাণ্টোপিথেকাসের নিচের চোয়াল খুব বেশি চওড়া ও পুরু ; পেষকদন্তের পরিধি গরিলার প্রায় দ্বিগুণ । ভারতবর্ষ, পাকিস্তান ও চীনে প্লায়োসিন এবং প্লিস্টোসিন কালে সে বাস করতো । তবে, সে কোনো উত্তরসূরী রেখে গিয়েছিল বলে মনে হয় না ।

শিবপিথেকাস ও তৎসদৃশ যে প্রাণীদের ফসিল হিমালয়ের শিবালিক অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের সাধারণ নাম রামপিথেসাইন (Ramapithecinae) । প্রথম নিদর্শনটি আমাদের দেশে পাওয়া গিয়েছিল বলে, রামের নাম থেকে এদের নামকরণ হয়েছে । আমাদের দেশের নিদর্শনটি প্রায় ৯০ লক্ষ বছরের পুরনো । পরে লুই লিকি (Louis Leakey) কেনিয়া থেকে রামপিথেসাইনের ফসিল আবিষ্কার করেন । কেনিয়ার এই ফসিল ১ কোটি ৪০ লক্ষ থেকে ১ কোটি ২০ লক্ষ বছরের পুরনো হতে পারে । হাঙ্গেরি, গ্রীস, তুরস্ক, রাশিয়া ও চীন থেকেও এর নিদর্শন পাওয়া গেছে ।

ফসিলে রামপিথেসাইনের করোটি, মুখ ও চোয়ালের কিছু কিছু অংশ আবিষ্কৃত হয়েছে । কিন্তু এই আবিষ্কার থেকে যেটুকু জানা যায় তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । ড্রায়োপিথেকাস থেকে এর কয়েকটি বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে। প্রথমত— ওপরের চোয়ালের যতটা অংশ পাওয়া গেছে, তা পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, রামপিথেসাইনের মুখ অন্যান্য বনমানুষের মতো সামনে বেশি এগোনো ছিল না,—তা আরো সমতল । দ্বিতীয়ত—দন্ত বৈশিষ্ট্যে বনমানুষ থেকে কিছুটা পার্থক্য চোখে পড়ে । একদিকে এর তীক্ষ্ণ ছেদকদন্ত ও নিচের পাটির সামনের পুরঃপেষকদন্ত কতকটা বনমানুষের মতো, কিন্তু অন্যদিকে পেষকদন্ত মানুষের মতো বড় এবং ছেদক ও কর্তকদন্ত বনমানুষের তুলনায় ছোট । পেষকদন্তে এনামেল বেশি । একমাত্র রামপিথেসাইনের মুখে এইসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে । সেজন্যে অনেকে বলেন যে, এই ধরনের কোনো প্রাণী থেকে হোমিনিডের উদ্ভব হয়ে থাকতে পারে ।

চোয়াল ও দাঁতের যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হলো, তা থেকে মনে হয় রামপিথেসাইনের খাদ্য ড্রায়োপিথেকাস প্রভৃতির থেকে কিছুটা ভিন্ন । বড় পেষকদন্ত (কর্তকদন্তের তুলনায়) এবং ছোট কর্তকদন্ত ও ছেদকদন্ত থেকে বোঝা যায় যে, এর খাদ্য ছিল এমন জিনিস যাকে খাওয়ার সময় কাটা-ছেঁড়ার চেয়ে পিষে ফেলা বেশি দরকার, অর্থাৎ সে ফল-পাতার চেয়ে বাদাম, বীজ, শিকড়, প্রভৃতি বেশি খেত মনে হয় । এই ধরনের খাবার ঘন বনের চেয়ে জঙ্গলের ধারে একটু খোলামেলা জায়গায় আরো সহজে পাওয়া যায় । তাই মনে হয়, অন্য বনমানুষেরা যত ঘন বনে বাস করে, রামপিথেসাইন তার চেয়ে খোলা জায়গায় বেশি সময় থাকতো । অনেকে বলেন যে, মায়োসিন অধিযুগে তৃণভূমির বিস্তারের

ফলে কোনো কোনো জাতীয় হোমিনয়েড গাছ থেকে নেমে মাটিতে বসবাস আরম্ভ করে ছিল এবং তাদের মধ্যে রামপিথেসাইন অন্যতম।

হাঙ্গেরি থেকে রামপিথেসাইনের হাত-পায়ের হাড় (limb bone) পাওয়া গেছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, এরা চার হাত-পায়ে চলাফেরা করতো। আবার কেউ কেউ মনে করেন, এরা দু' পায়েও কিছুটা চলতে পারতো।

মানবের বিবর্তন-ইতিহাস আলোচনার একটা বিরাট অসুবিধা—যথেষ্ট ফসিলের অভাব। রামপিথেসাইনের পরবর্তী ১ কোটি বছরের মতো দীর্ঘ সময় ধরে যে ক্রমবিবর্তন হয়েছিল, তার নিদর্শন খুব কম পাওয়া গেছে। অল্প সংখ্যক নিদর্শনগুলির মধ্যে কেনিয়ার গোরোরা থেকে আবিষ্কৃত পেষকদন্তটি অন্যতম। দাঁতটি ৯০ লক্ষ বছরের চেয়েও পুরনো। কোনো কোনো পণ্ডিত একে হোমিনিড বা প্রায়-মানবের দাঁত বলে মনে করেন।

প্লায়োসিন ও প্লিস্টোসিন অধিযুগ ॥ আফ্রিকার বিভিন্ন স্থান থেকে হোমিনিডের ফসিল আবিষ্কারের কাজ আজও অব্যাহত। কেনিয়ায় তুরকানা হ্রদের পশ্চিমে লোথাগাম্ থেকে সম্ভবত ৫০ থেকে ৫৫ লক্ষ বছরের পুরনো যে চোয়ালের ভগ্নাংশ আবিষ্কৃত হয়েছে, তার সঙ্গে মানুষের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেছে, যদিও তা আরো বেশি পুরু। ঐ হ্রদের দক্ষিণে ক্যানাপোই থেকে যে হোমিনিডের ওপর হাতের হাড় (humerus) পাওয়া গেছে, সেটি প্রায় ৪৪ লক্ষ বছরের পুরনো; এর গঠন পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ থেকে কোনো কোনো নৃতাত্ত্বিক মনে করেন যে, প্রাণীটি কতকটা মানুষের মতো দু' পায়ে ভর দিয়ে চলাফেরা করতে পারতো।

প্রায়-মানবের যে নিদর্শনগুলি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে পাওয়া গেছে, তাদের অস্ট্রালোপিথেকাস বলা হয়ে থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার টাউং, এবং প্রিটোরিয়ার নিকটবর্তী স্টার্কফন্‌টেইন, ক্রোমড্রাই ও সোয়ার্টক্র্যান্‌স থেকে আবিষ্কৃত হোমিনিডদের দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—অস্ট্রালোপিথেকাস আফ্রিকানাস এবং অস্ট্রালোপিথেকাস রোবাস্টাস্। এদের মধ্যে আফ্রিকানাস সবচেয়ে ছোট্—লম্বায় সাড়ে-চার ফুটের কাছাকাছি, ওজনে ৪০ থেকে ৫০ পাউণ্ড। এরা বেশ সিধা হয়ে চলতে পারতো। দাঁত ও চোয়াল অনেকটা নরসদৃশ হলেও, মুখের গড়ন বনমানুষের মতো। থুতনি বলতে বিশেষ কিছু নেই, নাক পুরু ও চ্যাপ্টা, কপাল নিচু ও ঢালু, ভ্রূর হাড় উঁচু। মুখ সামনের দিকে যতটা এগোনো, সেই তুলনায় মাথার ওপর ও পিছন দিক অনেক ছোট বলে মস্তিষ্কের আয়তন কম (উদাহরণস্বরূপ, স্টার্কফন্‌টেইনে আবিষ্কৃত স্ত্রীলোকের মস্তিষ্ক আয়তনে প্রায় ৪৮০ ঘন সেন্টিমিটার, অর্থাৎ গরিলার মতো ছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন)। দাঁত ও চোয়ালের গড়ন দেখে মনে হয়,

এরা মাংসও খেত। ফসিলের সঙ্গে পাথরের ছোট হাতিয়ার ও ছোট অ্যান্টিলোপের হাড় পাওয়া গেছে এবং তা দেখে কেউ কেউ বলেছেন যে, এরা সম্ভবত হাতিয়ারের ব্যবহার জানতো এবং খাওয়ার আগে পশুর হাড়, গাছের শক্ত বীজ ও বাদামকে ভেঙ্গে পিষে নিত।

অস্ট্রালোপিথেকাস রোবাস্টাস আরো বড়—দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫ ফুট, ওজনে প্রায় ১৫০ পাউণ্ড। তারাও কিছুটা সিধা হয়ে চলাফেরা করতো। চোয়াল বেশি পুরু, কষের দাঁত খুব বড় এবং ভ্রূর হাড় উঁচু। গরিলার করোটির ওপরে হাড়ের একটা অংশ যেমন চূড়ার মতো একটু উঁচু হয়ে মাঝখান বরাবর গেছে, তাদেরও খুলির মাঝখান বরাবর সেরকম চূড়া (skull crest) ছিল। গরিলার খুলিতে চূড়ার সঙ্গে দৃঢ় পেশী যুক্ত থাকে এবং এর সাহায্যে পুরু চোয়াল নেড়ে সে বাঁশের কোঁড় ও শক্ত পাতা চিবিয়ে খেতে পারে। এ থেকে বোঝা যায়, তারা গরিলার মতো নিরামিষাশী ছিল, কারণ গাছপালা খেতে গেলে চিবানোর দরকার বেশি। গাছের পাতা, বঁইচি জাতীয় বুনো ফল (berry), শিকড় ইত্যাদি তাদের খাদ্য। তবে অনেকে মনে করেন যে, তারা প্রায় সবরকম খাদ্য গ্রহণ করতে পারতো।

অস্ট্রালোপিথেকাসের করোটি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, পূর্ণবয়স্কদের মস্তিষ্কের আয়তন প্রায় ৪২৮ থেকে ৫৩০ ঘন সেন্টিমিটার ছিল।

পূর্ব আফ্রিকা থেকে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন পাওয়া গেছে। টানজানিয়ার সেরেঙ্গেটি তৃণভূমির পূর্বাংশে ওলডুভাই গিরিখাত থেকে লুই লিকি (Louis Leakey) ও তাঁর স্ত্রী মেরি লিকি (Mary Leakey) দুই প্রজাতির হোমিনিডের ফসিল এবং হাতিয়ার ও বাসস্থান আবিষ্কার করেছিলেন। লুই লিকি প্রথমটির নাম দিয়েছেন জিন্‌জ্-অ্যান্‌থ্রোপাস বয়জি। তার সঙ্গে অস্ট্রালোপিথেকাস রোবাস্টাসের সাদৃশ্য বেশি। তবে, সে আকারে রোবাস্টাসের চেয়েও বড়—দৈর্ঘ্যে প্রায় সাড়ে-পাচ ফুট, ওজনে প্রায় ২০০ পাউণ্ড। রোবাস্টাসের চেয়ে তার চোয়াল ও কষের দাঁত বড় এবং খুলির চূড়া বেশি উঁচু। তাই সেও সম্ভবত নিরামিষাশী ছিল। দুই পা বেশি ফাঁক বলে মনে হয়, সে বেশি সিধা হয়ে চলতে পারতো না, যতটা আফ্রিকানাস বা রোবাস্টাস পারতো। এখন বিজ্ঞানীরা তাকে অস্ট্রালোপিথেকাসের অন্তর্ভুক্ত করে নতুন নাম দিয়েছেন অস্ট্রালোপিথেকাস বয়জি। অনেকে আবার অস্ট্রালোপিথেকাস রোবাস্টাস নাম ব্যবহারের পক্ষপাতী।

ওলডুভাই গিরিখাত থেকে আবিষ্কৃত দ্বিতীয় প্রাণীটির আকৃতি কিন্তু অনেকটা নরসদৃশ এবং সে আফ্রিকানাসের চেয়েও উন্নত। আকারে প্রথমটির চেয়ে ছোট এবং মাথার হাড় পাতলা হলেও এর মস্তিষ্কের আয়তন আরো বেশি—প্রায় ৭০০ ঘন সেন্টিমিটার। চারপাশে পাথরের হাতিয়ার ও জীবজন্তুর হাড় দেখে লিকি

মনে করলেন হাতিয়ারগুলি এরই তৈরি। এত উন্নত বৈশিষ্ট্য দেখে তিনি স্থির করলেন যে, এই প্রাণী 'হোমো' (মানব) নামের যোগ্য এবং সেজন্যে এর নাম দিলেন হোমো হ্যাবিলিস (অর্থাৎ Handy Man)। হ্যাবিলিস এবং জিন্‌জ-অ্যান্‌থ্রোপাসের এই ফসিল প্রায় সমসাময়িক। এরা প্রায় ১৮-১৯ লক্ষ বছর আগে বাস করতো। জিন্‌জ ও হ্যাবিলিস ওল্‌ডুভাই গিরিখাতে প্রায় ৫ লক্ষাধিক বছর ধরে বর্তমান ছিল।

হ্যাবিলিসের নামকরণে নানা বিজ্ঞানীর নানা মত। লুই ও তাঁর পুত্র রিচার্ড লিকি বলেছেন, একে হোমো-গণের মধ্যে রাখা যুক্তিসংগত। আবার কেউ কেউ বলেছেন, একে অস্ট্রালোপিথেকাসের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত এবং এই প্রাণী হলো আফ্রিকানাসের উন্নততর নিদর্শন। তাই, একে কোন জাতির মধ্যে নিতে হবে, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। তার ওপরে নিত্য নতুন ফসিলের আবিষ্কার এই প্রশ্নকে জটিলতর করে তুলেছে।

ওল্‌ডুভাই গিরিখাতের হ্যাবিলিসের চেয়েও প্রাচীন হোমিনিডের ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে ইথিওপিয়া ও কেনিয়া থেকে। ইথিওপিয়ার ওমো নদী উচ্চ-ভূমি থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে কেনিয়ার তুরকানা হ্রদে এসে মিশেছে। ঐ নদীর নিকটবর্তী স্থানে হোমিনিডের অনেক পুরনো নিদর্শন পাওয়া গেছে; তাদের ব্যবহৃত হাতিয়ারগুলি ১৯ থেকে ২২ লক্ষ বছরের পুরনো।

তুরকানা হ্রদের নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে রিচার্ড লিকি এবং আরো কয়েকজন বিজ্ঞানী প্রাচীন হোমিনিডের নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন। ১৯৭২ সনে ঐ হ্রদের কাছ থেকে প্রায় ২০ লক্ষ বছরের পুরনো একটি মাথার খুলি পাওয়া গেছে—খুলিটির সাংকেতিক নাম ER-1470। প্রাচীন হলেও এর মস্তিষ্কের আয়তন ৭৭০ থেকে ৭৭৫ ঘন সেন্টিমিটার। ঊরুর যে কয়েকটি হাড় পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে মানুষের সাদৃশ্য বেশি। তাছাড়া সেখান থেকে পাথরের হাতিয়ারও আবিষ্কৃত হয়েছে। এত প্রাচীন অথচ উন্নত প্রাণীকে 'মানব' আখ্যা দেওয়া যায় কিনা, সেই প্রশ্ন এখন জটিল হয়ে দেখা দিয়েছে।

টানজানিয়ার লায়টোলিল এবং দক্ষিণ ইথিওপিয়ার অ্যাফার অঞ্চল থেকে আরো প্রাচীন হোমিনিডের ফসিল পাওয়া গেছে। এই নিদর্শনগুলি ৩৫ লক্ষাধিক বছরের পুরনো হতে পারে। বিভিন্ন ফসিল পরীক্ষা করে নৃতাত্ত্বিকরা এখন অস্ট্রালোপিথেকাসের আবির্ভাবের কাল আরো পিছিয়ে দিয়েছেন। কেনিয়ার লোথাগাম থেকে পাওয়া চোয়ালকে অনেকে অস্ট্রালোপিথেকাসের বলে বিশ্বাস করেন। যদি এটা সত্য হয় তবে আমরা বলতে পারবো যে, অস্ট্রালোপিথেকাস আজ থেকে প্রায় পঞ্চান্ন লক্ষ বছর পূর্বেও বর্তমান ছিল।

পূর্ব-আফ্রিকার ওল্‌ডুভাই গিরিখাতে যেমন জিন্‌জ-অ্যান্‌থ্রোপাস (অস্ট্রা-লোপিথেকাস বয়জি) ও হ্যাবিলিস একই সময় বাস করতো কিংবা

তুরকানা হ্রদের কাছে জিন্‌জ-অ্যানথ্রোপাস ও সেই নরসদৃশ প্রাণী (ER-1470) সমসাময়িক ছিল, তেমন দক্ষিণ আফ্রিকার অস্ট্রালোপিথেকাস রোবাস্টাস ও আফ্রিকানাস একই সময় ছিল জীবিত। জিন্‌জ ও রোবাস্টাস বিবর্তনস্রোতে বেশি দূর এগোতে পারেনি এবং তারা লুপ্ত হয়ে যায় প্রায় ১০ লক্ষ বছর আগে। কিন্তু অন্যদের মস্তিষ্ক আয়তনে বড় হয়। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন যে, অস্ট্রালোপিথেকাস-সদৃশ (Australopithecine) প্রাণী থেকে অস্ট্রালে পি-থেকাস ও হোমো শাখার উদ্ভব হয়েছিল ; অস্ট্রালোপিথেকাস অ্যাফারেন-সিসকে (অ্যাফার থেকে আবিষ্কৃত ফসিল) তাঁরা সেই সাধারণ পূর্বপুরুষ বলে থাকেন। আবার, হ্যাবিলিসকে হোমোদের অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা, সে বিষয়েও মতপার্থক্য আছে। রিচার্ড লিকি একে হোমো বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

মানবের উদ্ভব অস্ট্রালোপিথেকাস থেকে হোক বা তারও অনেক আগে রামপিথেসাইনের অন্য কোনো বংশধর থেকে হোক না কেন, সেই বিবর্তন হয়েছিল ধীরে ধীরে। আমাদের দীর্ঘ বিবর্তনপথে এমন এক সময় ছিল, যখন অস্ট্রালোপিথেকাস ও হোমোদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় খুব কঠিন এবং বিবর্তনের ঐ স্তর নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যত তর্কাতর্কি।

তর্কের আর একটা বিষয় হলো, হাতিয়ার ব্যবহার এবং দুই পায়ে চলার মধ্যে কোনটা আগে হয়েছিল। কিছু পণ্ডিত বলেন, হোমিনিডরা হাতিয়ার ব্যবহার আগে শুরু করে এবং তার ফলে দু'পায়ে চলায় ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে (কারণ হাতিয়ারের জন্যে হাত ব্যবহার করলে দু'পায়ে চলা ছাড়া উপায় নেই)। হোমিনিডের আদিপুরুষ যখন গাছ ছেড়ে খোলা জমিতে বসবাস শুরু করে, তখন সেখানে শত্রুকে ভীতিপ্রদর্শন এবং আত্মরক্ষার জন্য তাকে পাথর বা ছোট ডাল ব্যবহার করতে হতো কারণ গরিলা, শিম্পাঞ্জি ও বেবুনের মতো বিরাট ও সুতীক্ষ্ণ ছেদকদন্ত তার নেই। তাছাড়া, খোলা জায়গায় থাকার জন্যে তার খাদ্য তালিকারও পরিবর্তন হয়েছিল এবং তার ফলে হাতিয়ারের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়,কারণ মাংস খেতে গেলে শিকার করতে হয়।

কিন্তু অনেক নৃতাত্ত্বিক এর ঠিক উল্টো কথা বলেন। তাঁরা মনে করেন যে, দু'পায়ে চলা থেকে হাতিয়ারের ব্যবহার আরম্ভ হয়েছিল। অস্ট্রালোপিথেকাস জাতীয় হোমিনিডের সঙ্গে গরিলা ও শিম্পাঞ্জির মেরুদণ্ডের অস্থির তুলনা করে কেউ কেউ বলেছেন, হোমিনিড কখনো হাঁটা-চলার সময় বনমানুষের মতো হাতের আঙুলের গাঁটে ভর দিত না, অর্থাৎ সে প্রথম থেকেই দু'পায়ে চলাফেরা করতে পারতো। দ্বিপদী ছিল বলেই তার পক্ষে হাত ও হাতিয়ার ব্যবহার সম্ভব হয়েছে।

এখন বিষয়টাকে একটু খতিয়ে দেখা যেতে পারে। হাতিয়ার ব্যবহারের কারণ দেখাতে গিয়ে যাঁরা বলেন হোমিনিডের ছেদকদন্ত ছোট বলে আত্মরক্ষার জন্যে

এর দরকার পড়েছিল, তাঁদের প্রশ্ন করা যায় কেন ছেদকদন্ত ছোট ছিল। এই কথার জবাব দিতে গেলে প্রশ্নটা ঘুরে যাবে, কারণ হাতিয়ার ব্যবহারের জন্যে ছেদকদন্ত বড় থাকার দরকার পড়েনি। কার্যকারণ সম্পর্কটা এইভাবে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে।

নৃবিজ্ঞানী জলির (Clifford Jolly) মত এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন যে, হোমিনিড ও মানুষের বিশেষ দন্তবৈশিষ্ট্যের (ছোট ছেদকদন্ত ও সে তুলনায় বড় পেষকদন্ত) কারণ তার খাদ্য। খোলা জমিতে বাস করতে গিয়ে তাকে ফলপাতা ছেড়ে তৃণজাতীয় উদ্ভিদের বীজের ওপরে বেশি নির্ভর করতে হলো যেমন বর্তমান মানবের একটি প্রধান খাদ্য শস্যদানা। বীজ ও দানাকে ভালো করে চিবিয়ে খেতে গেলে পেষকদন্ত বড় ও তার গায়ে বেশি এনামেল থাকা দরকার। তাছাড়া, দানা চিবানোর সময় চোয়াল ঘুরিয়ে নাড়তে হয় বলে, ছেদকদন্ত বড় থাকলে সহজভাবে মুখ নাড়তে অসুবিধা হতে পারে, কারণ দু'পাটির বড় বড় ছেদকদন্ত মাঝে মাঝে পরস্পর আটকে যাবে। তাই, তিনি মনে করেন বীজ ও শস্যদানা খাওয়া থেকে হোমিনিডের বিশেষ দন্তবৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু এখানে একটা পাল্টা প্রশ্ন করা যায়। তৃণভূমিবাসী বেবুনও বীজ ও শস্যদানা খায়, তবু তার ছেদকদন্ত ছোট হলো না কেন? এর জবাব দিতে গেলে বলতে হয় যে, বেবুন সিধা হয়ে চলতে ও হাতিয়ার ব্যবহার করতে পারে না বলে আত্মরক্ষার জন্যে তার ছেদকদন্ত বড়। সেজন্যে কেউ কেউ হাতিয়ার ব্যবহারকে হোমিনিডের বিশেষ দন্তবৈশিষ্ট্যের কারণ বলে থাকেন।

বিভিন্ন পণ্ডিতদের যুক্তি ও মত থেকে মনে হয়, প্রায়-মানবের বিশেষ দন্তবৈশিষ্ট্যের জন্যে দুটি কারণই দায়ী ছিল—বীজ ও শস্যদানা খাওয়া এবং হাতিয়ার ব্যবহার। প্রথমে হয়তো খাদ্য ছিল প্রধান কারণ এবং শেষে হাতিয়ার ব্যবহার প্রধান কারণ হয়ে ওঠে।

মানুষের আবির্ভাবকাল নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে আজও তর্ক চলছে। আদিম বনমানুষ (হোমিনয়েড) থেকে যে প্রায়-মানব বা হোমিনিডের উদ্ভব হয়েছিল সে বিষয়ে অনেকে একমত। পূর্ব গোলার্ধের অ্যানথ্রোপয়েড থেকে হোমিনয়েড শাখা অলিগোসিন অধিযুগে পৃথক হয়েছিল বলে কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন। হোমিনয়েড থেকে মায়োসিন অধিযুগে গিবন-সদৃশ ও বৃহদাকার বনমানুষ এবং প্রায়-মানবের সৃষ্টি হয়েছিল বলে অনেকের বিশ্বাস। নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকে বলেছেন যে, মায়োসিন কালে রামপিথেসাইন বনমানুষ থেকে প্রায়-মানবের আদিপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল। কিন্তু অণু-জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ এটা মানতে চান না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিনসেণ্ট সারিক (Vincent Sarich) প্রমুখ কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন যে, গিবন-সদৃশবন মানুষ থেকে অন্যান্য হোমিনয়েডের শাখা মাত্র ৭০ লক্ষ বছর

(৭০±১০ অর্থাৎ ৭০ থেকে ১০ লক্ষ বছর কমবেশিও হতে পারে) আগে আলাদা হয়েছিল এবং শিম্পাঞ্জি-গরিলার আদিপুরুষ থেকে মানুষের (হোমো) আদিপুরুষ মাত্র ৩৫ লক্ষ বছর (৩৫±১৫ অর্থাৎ ৩৫ থেকে ১৫ লক্ষ বছর কমবেশিও হতে পারে) আগে পৃথক হয়েছিল । অণু-জীববিজ্ঞানীদের মতবাদ নিয়ে এখানে একটু আলোচনা করা যেতে পারে।

বৃহদাকার বনমানুষের সঙ্গে আমাদের নিকট সম্বন্ধ । মানব ও বৃহদাকার বনমানুষের ক্রোমোজোম পরীক্ষা করে কোনো কোনো বিজ্ঞানী বলেছেন যে, এদিক থেকে বিচার করলে গরিলা ও মানবের বিবর্তনধারা শিম্পাঞ্জির চেয়েও পরস্পরের কাছাকাছি হতে পারে । আবার সাম্প্রতিক কালে পণ্ডিতরা গবেষণা করে দেখেছেন যে, মানুষের পলিপেপ্‌টাইডের (অর্থাৎ-অ্যামিনো অ্যাসিডের যে অণুগুলি শিকলের মতো যুক্ত হয়ে প্রোটিন তৈরি করে) সঙ্গে শিম্পাঞ্জির সাদৃশ্য ৯৯ শতাংশেরও বেশি । এক কথায় বলতে গেলে, মানুষের সঙ্গে গরিলা ও শিম্পাঞ্জির নিকট সম্পর্ক । অণু-জীববিজ্ঞানীরা রক্তের একরকম প্রোটিন নিয়ে এই বিষয়ে কাজ করেছেন, সেই প্রোটিনের নাম সিরাম্-অ্যাল্‌বুমিন । বিভিন্ন প্রাণীর সিরাম্-অ্যাল্‌বুমিনের মধ্যে পার্থক্য থাকাটা স্বাভাবিক । মানুষের সিরাম-অ্যাল্‌বুমিন নিয়ে খরগোশের মধ্যে দিলে খরগোশের শরীরে একে রোধ করার জন্যে প্রতিক্রিয়া শুরু হয় । খরগোশের শরীর তখন প্রতিপক্ষের সৈন্য রূপে অ্যান্টিবডি (antibody) উৎপন্ন করে—একে অ্যান্টিসিরাম (antiserum) বলা হয় । মানুষের সিরাম্-অ্যাল্‌বুমিনের সঙ্গে এটি মেশালে যেমন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তেমন বানর ও শিম্পাঞ্জি প্রভৃতির সঙ্গে মেশালেও প্রতিক্রিয়া হয়, তবে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার মাত্রায় পার্থক্য থাকে । এই প্রতিক্রিয়া থেকে বিভিন্ন প্রাইমেটের মধ্যে পার্থক্যের মাত্রা নির্ধারিত হয়েছে ; ভিনসেণ্ট সারিক এই মাত্রাকে **Immunological Distance** বা **I-D** বলেন । নানা জাতীয় প্রাইমেটের **I-D**-কে নিরীক্ষা করে তিনি তাদের বিবর্তনের গতি বা হার (degree of evolution বা rate of change) নির্ধারণ করেছেন । যেসব প্রাইমেটের অ্যাল্‌বুমিন নিয়ে তিনি পরীক্ষা করেছিলেন, তাতে সব ক্ষেত্রে বিবর্তনের হার প্রায় একরকম দেখা গেছে । এ থেকে সারিক সিদ্ধান্ত নিলেন যে, সমগ্র টারসিয়ারি কল্পে প্রাইমেটদের অ্যাল্‌বুমিন-বিবর্তনের 'তাগিদ' বা selection pressure সমান এবং পরিবর্তনের পরিমাণ ও সময়ের দৈর্ঘ্য সমানুপাত । কোনো কোনো প্রত্নতাত্ত্বিকের মতে, পূর্ব গোলার্ধ ও পশ্চিম গোলার্ধের বানর প্রায় ৩ কোটি ৬০ লক্ষ বছর আগে আলাদা হয়ে গিয়েছিল । তাঁদের মত ও আপন সিদ্ধান্তের ওপরে ভিত্তি করে সারিক বলেছেন যে, গিবন-জাতীয় বনমানুষ (Hylobatid) থেকে অন্যান্য হোমিনয়েডের শাখা মাত্র ৭০ লক্ষ (৭০±১০) এবং সাধারণ আদিপুরুষ থেকে হোমো, শিম্পাঞ্জি ও গরিলা মাত্র ৩৫ লক্ষ (৩৫±১৫) বছর আগে পৃথক হয়েছিল ।

এখন সারিকের সিদ্ধান্ত ও কালপঞ্জিকে অনেক নৃতাত্ত্বিক স্বীকার করেন না। সাইমন্স বলেছেন, সব প্রাইমেটের বিবর্তন-হার এইরকম সমান ও সরল হওয়া অসম্ভব। তিনি আরো বলেছেন যে, ৩০ থেকে ৭০ লক্ষ বছর আগে অস্ট্রালোপিথেকাসের অস্তিত্ব ছিল এবং তাদের আদিমতম নিদর্শনগুলির চোয়ালের গঠনে ও দাঁতে আফ্রিকার বনমানুষের থেকে পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে।

মানুষের উৎপত্তি নিয়ে বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধান আজও অব্যাহত। সাধারণ আদিপুরুষ থেকে বনমানুষ ও মানব কত আগে পৃথক হয়ে গিয়েছিল এবং কে সেই 'পরম পিতা' তার সঠিক জবাব কবে পাওয়া যাবে কে জানে! কিন্তু এই গবেগণা থেকে একটা সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে, আমরা ক্রমবিবর্তনের ফল ছাড়া আর কিছু নয়। তাই মানবের বর্ণনা দিতে গিয়ে গ্রীক শিল্পীর কল্পিত সেন্ট্যরের মূর্তির কথা আমাদের মনে পড়ে। সেন্ট্যরের দেহের নিম্নাংশ অশ্বের মতো বলে জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু তার উর্ধ্বাঙ্গ মানবাকৃতি বলে মনে হয় তা আমাদের দৈহিক এবং আচরণগত পার্থক্যের ইঙ্গিত বহন করছে। এই পার্থক্য হলো জীববিবর্তনের ফলশ্রুতি। জার্মান দার্শনিক হার্টম্যান মানুষকে আধ্যাত্মিক জগৎ ও পার্থিব জগতের মধ্যে 'হাইফেন' বলে বর্ণনা করেছেন। আমরা তাঁর ব্যবহৃত শব্দটিকে নিয়ে বলতে পারি যে, জীব-বিজ্ঞানের ভাষায় এই হাইফেন হলো কোটি-কোটি বছরের বিবর্তনস্রোত।

গ্রন্থপঞ্জি

The Descent of Man, 2nd edn. by Charles Darwin, 1874.

The Vertebrate Story, by Alfred Sherwood Romer, 1962.

The Age of Reptiles, by Edwin Harris Colbert, 1965.

History of the Earth, by Bernhard Kummel, 1968.

Perspectives on Human Evolution, ed. by Sherwood Washburn & Phyllis Jay, 1968

Human Evolution, by Bernard Grant Campbell, 1971.

Evolution, by Ruth Moore & the editors of Time-Life Books, 1971.

Not From The Apes, by Bjoern Kurten, 1972.

The How and Why Wonder Book of Prehistoric Mammals, ed. under the supervision of Paul E. Blackwood, 1972.

The How and Why Wonder Book of Dinosaurs, ed. under the supervision of Paul E. Blackwood, 1973.

Life Before Man, by the editors of Time-Life Books, 1973.

The Missing Link, by the editors of Time-Life Books, 1973.

The Encyclopedia of Wild Life, ed. by Eve Harlow & Iain Parsons, 1974.

The Atlas of World Wild Life, ed. by Martyn Bramwell, 1974.

History of Life, by Richard Cowen, 1976.

Early Hominids of Africa, ed. by Clifford James Jolly, 1978.

The Unreal World of Dinosaurs (The Question and Answer Encyclopedia Series) ed. by Anthony Harvey, 1978.

Dinosaurs (Quiz-Me Books), by Brenda Biram, 1978.

Dinosaurs (Insight Books), by Richard Moody, 1979.

Physical Anthropology, by G. W. Lasker & R. N. Tyzzer, 1982.

[illegible]

The Descent of Man, 2nd ed., by Charles Darwin, [illegible]
The Vertebrate Story, by Alfred Sherwood Romer, [illegible]
The Age of Reptiles, by Edwin Harris Colbert, 196[illegible]
History of the Earth, by Bernhard Kummel, 1961.
Perspectives on Human Evolution, ed. by Sherwood Washburn & Phyllis Jay, 1968.
Human Evolution, by Bernard Grant Campbell, 1971.
Evolution, by Ruth Moore & the editors of Time-Life Books, 1970.
[illegible] The Apes, by [illegible] 1972.
The How and Why Wonder Book of Prehistoric Mammals, ed. under the supervision of Paul E. Blackwood, 1973.
The How and Why Wonder Book of Dinosaurs, ed. under the supervision of Paul E. Blackwood, 197[illegible]
[illegible] Man, by the editors of Time-Life Books, 1973.
[illegible] by the editors of Time-Life Books, 197[illegible]
The Encyclopedia of Wild Life, ed. by [illegible] & [illegible], 197[illegible]
The [illegible] of [illegible] Wild Life, ed. by [illegible] 1964.
[illegible] and [illegible], by Richard Carrington, 19[illegible]
[illegible] of Africa, ed. by [illegible] Jolly, 19[illegible]
The [illegible] World [illegible] 1968 [illegible], ed. by [illegible] 1973.
[illegible] 1978.
[illegible] by Richard [illegible] 1973.
[illegible] by [illegible] W. [illegible] & [illegible] M. [illegible]
[illegible]

শব্দসূচি

——

সংশোধনী

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ		শুদ্ধ
১৫	২৮-২৯	ইথাইল, অ্যালকোহল	...	ইথাইল অ্যালকোহল
১৯	২৬	কল্পে জুরাসিক	...	জুরাসিক কল্পে
২১	২৫	পুয়াজীবীয়	...	পুরাজীবীয়
২২	২৯	about the earlier	...	about which the earlier
২২	৩০	uuiverse	...	universe
২২	৩০	destoryed	...	destroyed
২৩	২২	সিলেনটেরিটা	...	সিলেনটেরেটা
২৪	২৮	ইনসেন্টা	...	ইনসেক্টা
৪১	১	জীষ	...	জীব
৫৭	১৭	হাওয়ায়	...	হওয়ায়
৫৮	১৭	মেতে	...	যেতে
৬৩	১০	নেভোস্কোশিয়া	...	নোভাস্কোশিয়া
৭৭	১৭-১৮	এরা এরা	...	এরা
৯৫	১০	নানাভাবে—থাকে	...	নানাভাবে থাকে—
৯৬	৩১	বিবরণ	...	বিচরণ
১০২	৫	আপোসাম	...	অপোসাম
১০৭	১৮	রোমস্থন্‌	...	রোমন্থন
১১৪	৬	সমাভবাপন্ন	...	সমভাবাপন্ন
১১৫	৪	মিরিথিয়ামের	...	মিরিথেরিয়ামের
১১৮	৪	শিংক্তযু	...	শিংযুক্ত
১২২	২৪	ফোরোহাকোস্‌	...	ফোরোরহাকোস্‌
১৩০	৩১	লেরিসের	...	লোরিসের
১৩৩	২	সেরকোপিথেকাইন	...	সেরকোপিথেসাইন
১৩৩	৪	সেরকোপিথেকাইনের	...	সেরকোপিথেসাইনের
১৩৩	৫	সেরকোপিথেকাইন	...	সেরকোপিথেসাইন
১৪৯	৩৪	গিবন-সদৃশবন মানুষ	...	গিবন-সদৃশ বনমানুষ

সুবর্ণরেখার বই

India : History & Thought : Essays
in Honour of A. L. Basham
ed. by : S. N. Mukherjee 180·00

Santal Rebellion : Collection of Documents 40·00

In the Wake of Naxalbari : Sumanta Banerjee
(Pap) 75·00
(H.B) 140·00

Calcutta : Myths and History :
S. N. Mukherjee 40·00

India as Known to Ancient and
Mediæval Europe : P. C. Ghosh 25·00

Hitopadesa : Rev. B. Hale-Wortham 50·00

Black Money : The Case For India
Murari Ghosh 30·00

Economics of Soviet Aid and Trade :
A Critique : R. Mukherjee [Pap] 30·00

An Introduction to Santali [Parts I & II] :
R M. Macphail 25·00

Glimpses of the History of Manbhum :
Subhas Ch. Mukhopadhyay 12·00

Akshaya Kumar Maitreya Museum :
Catalogue 12·00

Iconography of Sculptures :
P. K. Bhattacharya 50·00

সুবর্ণরেখা

৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

SUBARNAREKHA

73 Mahatma Gandhi Road, Calcutta 700 009